শাশ্বত ভারত

তৃতীয় খণ্ড

শ্রীপশুপতি চট্টোপাধ্যায়



দি ঢাকা স্টুডেন্টস্‌ লাইব্রেরী
(স্থাপিত ১৮৭৯খৃঃ)
পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা
৫ নং শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ :
শুভ রথ দ্বিতীয়া
২ জুলাই, ১৯৫৫

প্রকাশক :
শ্রীরামদাস দত্ত
দি ঢাকা স্টুডেন্টস্ লাইব্রেরী
৫, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট,
কলিকাতা—১২।

প্রচ্ছদপট :
শ্রীঅরুণ চট্টোপাধ্যায়

মুদ্রাকর :
শ্রীরঞ্জিৎ কুমার দত্ত, বি-এস্-সি
ভোলাগিরি প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১১১, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট,
কলিকাতা—৯।

নিবেদন

শাশ্বত ভারত—তৃতীয় খণ্ড—প্রকাশিত হোলো।

দ্বিতীয় খণ্ডে আমরা নিবেদন করেছিলাম,—

ভারত পুণ্যভূমি। এই পুণ্যভূমিতে মানুষ আর দেবতা মিলে যুগ যুগ ধ'রে নানা ধরণের লীলাবিলাস ক'রে চলেছেন। মধুর এই সব কাহিনী ভারতের সর্বত্রই ছড়িয়ে রয়েছে। ছড়িয়ে রয়েছে হাটে মাঠে, গ্রামে গঞ্জে, শহরে বন্দরে, নদীতে সরোবরে, পাহাড়ে পর্বতে। শুধু আহরণ ক'রে আনলেই হোলো।

মানুষে আর মানুষের আরাধ্য দেবতায় মিলে এই-সব লীলারঙ্গ যেমন সুন্দর, তেমনি হৃদয়গ্রাহী। পাঠক হৃদয়কে এগুলি সহজেই স্পর্শ করে।

এ সব কাহিনীগুলি গল্প হিসাবেও সরস সুন্দর। দেখা গিয়েছে, সাধারণ ছেলেমেয়েরাও এ-সব কাহিনী মন দিয়ে শোনে, পড়ে। তারা আনন্দ পায়। এই সব কাহিনী গল্প হিসাবে শুনে শুনে তাদের চিত্ত ক্রমশ প্রকৃত পথেই চলবে, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

এই সব কাহিনীকে অবলম্বন ক'রে কোথাও মঠ মন্দির গ'ড়ে উঠেছে। কোথাও বা মেলা অনুষ্ঠিত হয়। কোন কোনও ক্ষেত্রে অপূর্ব গ্রন্থ রচিত হয়েছে। এইসব মঠ মন্দির দেখে, এই সব মেলায় যোগ দিয়ে, এই সব গ্রন্থ প'ড়ে অনেকের মন 'আকর' খুঁজে পেতে আগ্রহী হবে। এই 'আকর'গুলিই তো অধিকাংশ ক্ষেত্রে মানুষে আর দেবতায় মিলে নানা জাতীয় লীলারঙ্গ। মন্দির দেখতে গিয়ে মুগ্ধ হ'য়ে মন্দিরের পিছন দিককার কাহিনী জানবার আগ্রহ তো স্বাভাবিক। দেখা গিয়েছে, মন্দির দেখবার আগ্রহ নিয়ে কেউ গিয়েছেন হয়ত মন্দিরে। কিন্তু সেই মন্দিরের পিছন দিককার কাহিনী শুনে তিনি মাধুর্য উপলব্ধি করেছেন, ভাবে বিভোর হ'য়ে পড়েছেন।

এই সব বিচার ক'রেই লেখক এই কাহিনীকুসুম চয়ন ক'রে মালা গেঁথে চলেছেন।

আমরাও আনন্দের সঙ্গে তা প্রকাশ করে চলেছি।

সুখের কথা, বহু গুণগ্রাহী পাঠক স্বতপ্রবৃত্ত হ'য়ে লেখককে এই জাতীয় নূতন কাহিনী শোনাচ্ছেন, বা, কোথায় গেলে, বা কোন্ বই পড়লে, তা সংগ্রহ করা সম্ভব, আনন্দের সঙ্গে তা জানিয়ে দিচ্ছেন।

গ্রন্থখানি পাঠক সমাজে সমাদৃত হয়েছে, এ জাতীয় গ্রন্থের সার্থকতা আছে, এটা তারই প্রমাণ। এটা বিশেষভাবে উপলব্ধি ক'রে তৃতীয় খণ্ড দ্রুত প্রকাশ করলাম। পরবর্তী খণ্ডগুলিও যথাসম্ভব দ্রুত প্রকাশ করবার ইচ্ছা রয়েছে।

গ্রন্থখানি সম্বন্ধে আমাদের আরও কিছু বক্তব্য রয়েছে। গ্রন্থের বিষয়বস্তু ঠিক মহাপুরুষদের জীবনী নয়। এঁদের জীবনীর অভাব নেই। বহু গ্রন্থই অপূর্ব। তাই জীবনী না লিখে মানুষ আর মানুষের আরাধ্য দেবতা একত্রে মিলে যে মধুর লীলাবিলাস ক'রে চলেছেন, কেবলমাত্র সেই লীলাবিলাস কাহিনীই লেখক এই গ্রন্থগুলিতে তুলে ধরতে আগ্রহী। এইটিই গ্রন্থের মূল বিষয়বস্তু। প্রথম খণ্ডে অবিকল তাই-ই করা হয়েছিল।

প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হবার পর বহু গুণগ্রাহী পাঠক অযাচিতভাবে কেউ পত্রযোগে, কেউ লেখকের সঙ্গে দেখা ক'রে, অনুরোধ জানালেন, এই সব লীলা কাহিনীর সঙ্গে মহাপুরুষদের জীবনী অতি সংক্ষেপে, গৌণভাবে, একটু সংযোজন করলে ভালো হয়। গ্রন্থের এই সব কাহিনী প'ড়ে যে আগ্রহের, যে ক্ষুধার সৃষ্টি হয়, তা ভবিষ্যতে আরও বই প'ড়ে জানতে পারেন কেউ কেউ। কিন্তু যাঁদের পক্ষে তা সম্ভব হয় না, মোটামুটিভাবে তাঁরা তো মহাপুরুষ সম্বন্ধে অতিরিক্ত কিছু জানতে পারবেন।—

আর একটা কথা। আমাদের দেশে একই নামের বহু মহাপুরুষ রয়েছেন। বৈষ্ণব জগতে একাধিক কৃষ্ণদাসেব সাক্ষাৎ মেলে। কিন্তু কাহিনীতে যে কৃষ্ণদাসের কথা উল্লেখ করা হোলো, সে কোন্ কৃষ্ণদাস? তাঁর সম্বন্ধে কিছু আগ্রহ, কিছু কৌতূহলের সৃষ্টি হওয়া নিতান্ত স্বাভাবিক।

এই সব কথা বিচার ক'রে দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডে এই সব লীলা-বিলাসের সঙ্গে মহাপুরুষদের জীবনীও কিছুটা সংযোজিত হয়েছে। কয়েকজন মহাপুরুষ আছেন, তাঁদের সমগ্র জীবনই, আবির্ভাব থেকে তিরোধান পর্যন্ত, তাঁদের আরাধ্য, প্রিয়তম দেবতার সঙ্গে লীলারসে ভরপুর। সারা জীবনটাই তাঁদের দেবতার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। যেমন বামাক্ষ্যাপা, যেমন মীরাবাঈ। তাই তাঁদের গোটা জীবনই না লিখলে চলে না। তবুও দৃষ্টিভঙ্গী তো ভিন্নতর। জীবনী লিখতে হয়েছে সত্য, কিন্তু সেটা গৌণভাবে। লীলা কাহিনীকেই মুখ্য ক'রে জীবনী লেখা হয়েছে। এই সব ক্ষেত্রে সন তারিখ ইত্যাদি প্রাধান্য পায় না।

আরও একটা কথা। লেখক চেষ্টা করেছেন বিষয়বস্তু সরল, সহজ ভাষায় প্রকাশ করতে। কিন্তু সব ক্ষেত্রে তা সম্ভব হ'য়ে ওঠে না। যাঁরা অত্যন্ত উঁচুতে উঠেছেন, তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ নিজেদের প্রত্যক্ষ দর্শন, নিজেদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথা নিজেরাই লিখে গিয়েছেন। অনেক ক্ষেত্রে তা আপাতদৃষ্টিতে দুরূহ ব'লেই মনে হবে। অথচ তাঁদের বর্ণনা, অতি মধুর, অপূর্ব। তাই, একটু দুরূহ মনে হলেও, এই সব মহাপুরুষদের নিজেদের লেখা কথাগুলি অবিকল উদ্ধৃত করা হয়েছে।

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস বাঙলার সাধারণ লোক, আপাতদৃষ্টিতে যা অতি দুরূহ ব'লে মনে হ'তে পারে, তা হৃদয়ঙ্গম করতে সমর্থ। দুরূহ ভাব বোঝা সাধারণ লোকের পক্ষে কঠিন কথা নয়। ভাষা কঠিন, সে অবশ্য স্বতন্ত্র কথা।

যে কৃষক দিনের শেষে লাঙল কাঁধে গাইতে গাইতে ঘরে ফিরে আসেন,

মনরে, কৃষি-কাজ জান না।
এমন মানব জমিন রইলো পতিত,
আবাদ করলে ফলতো সোনা।

অথবা, যে মুদি সন্ধ্যাবেলায় দোকানে ব'সে গান করেন,

হরি, দিন তো গেলো, সন্ধ্যা হোলো. পার করো আমারে।

—এ সবের তত্ত্ব যত কঠিনই হোক, কৈ, তাঁদের পক্ষে তো এসব গানের মর্ম বোঝা আদৌ কষ্টকর হয় না! আমাদের নিশ্চিত বিশ্বাস, তাঁরা এসব কথা বুঝেই গান করেন; আপাতদৃষ্টিতে তাঁরা যত মূর্খ ই হোন না কেন। তা ছাড়া দুরূহ কথাও বারবার পড়লে একদিন না একদিন হৃদয়ঙ্গম হ'য়ে পড়ে। শাস্ত্র বললেন, আবৃত্তি সর্ব শাস্ত্রাণাং বোধাদপি গরীয়সী।

এ-সব কথা যে সত্যি, সাধারণ লোকদের সঙ্গে একটু অন্তরঙ্গভাবে, অবাধে মিশলেই বোঝা যাবে।

ভারত মূলত ধর্মপ্রাণ দেশ। ধর্মই এদেশের মূলভিত্তি। এ-সব কথা ভাবে দুরূহ হ'লেও ভারতের জনসাধারণের কাছে, আদৌ দুর্বোধ্য নয়. দুরূহ নয়। নানা দেশের নানা কথায়, হজম-না-হওয়া তত্ত্বে যাদের চিত্ত অস্বচ্ছ, তাদের কাছে বহু সহজ কথাও দুর্বোধ্য হ'য়ে ওঠে।

চিত্ত যাঁদের স্বচ্ছ, হোন না আপাতদৃষ্টিতে তাঁরা অশিক্ষিত, তাঁদের কাছে দুরূহ ভাবও সুন্দর ভাবে, স্পষ্ট আকারে প্রকাশ পায়।

প্রকাশক

স্নেহাস্পদ

শ্রীমান সাধন চট্টোপাধ্যায়

কল্যাণীয়েষু—

সূচীপত্র

শাশ্বত ভারত (৩য় খণ্ড) লিখতে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলির সাহায্য নিয়েছি। এই সব অমূল্য গ্রন্থের লেখকদের সশ্রদ্ধ প্রণতি জানাই।

শ্রীমদ্ভাগবত

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত

শ্রীভক্তমাল গ্রন্থ

অখণ্ড অমিয় শ্রীগৌরাঙ্গ—শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

নরসিং মেহতা—গীতা প্রেস, গোরক্ষপুর

ভারতের সাধক—শঙ্করনাথ রায়

শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধনা—শ্রীজাহ্নবীকুমার চক্রবর্ত্তী

সদ্ভাব তরঙ্গিনী—ভুলুয়া বাবা

সাধক শ্রীশশিভূষণ—শ্রীসুশীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

মীরাবাঈ—স্বামী বামদেবানন্দ

Bhakta Mira—Banko Behari Lall—Vidya Bhaban

তন্ত্রতত্ত্ব—শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব

গণেশ—শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব

তন্ত্রাচার্য শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব—শ্রীবসন্তকুমার পাল

শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব—শ্রীহারাধন দত্ত

রণছোড়জী ও নরসিং মেহতা এবং মীরাবাঈ ও গিরিধারীলাল-এর গানগুলি আদর্শ-চরিত্র কবি-বন্ধু শ্রীমাখন গুপ্ত অনুবাদ ক'রে দিয়েছেন।

মা, এ জগতে সকলেই কিছু না কিছু করিবার পূর্বে যা হয় একটা মঙ্গলাচরণ করিয়া থাকে। আমি তাহার কি করিব? সর্বমঙ্গলার চরণ ভিন্ন আর তো মঙ্গলাচরণ জানি না। তন্ত্রতত্ত্বে আমার যত যাহা করিবার আছে তাহা তো তুমি জানো। অন্তর্যামিণি, যন্ত্র মন্ত্র তন্ত্র তোমা হইতে স্বতন্ত্র নহে। কিন্তু আমি স্বতন্ত্র না হইলেও স্বতন্ত্র থাকিতে চাই। তুমি যেমন ব্রহ্মময়ী বিশ্বময়ী তেমনি আবার লীলাময়ী নৃত্যময়ী। যেমন আনন্দময়ী তেমনি ইচ্ছাময়ী চিন্ময়ী এবং মৃন্ময়ী। তাই বলি মা, তোমায় মনোময়ী নয়নময়ী প্রাণময়ী প্রেমময়ী দেখিতে চাই। যে শক্তিবলে তোমার নাম করিব সে শক্তি-স্বরূপিণীও তুমি। তুমি আপন গান আপনি শুনিবে। আপন প্রেমে আপনি নাচিবে। আমার তাহাতে কিসের মঙ্গলাচরণ মা! তোমার অন্ন তোমায় ভোজন করাইব। আমি কেবল প্রসাদ পাইব। তুমি আপন আনন্দে আপনি মাতিয়া আপনি তাহাতে বিভোর হইবে। আমি তোমার সেই স্তিমিতগম্ভীর অদ্বৈত-সাগরে মা মা রবের দ্বৈত তরঙ্গ তুলিয়া সাঁতার দিব। বিরক্তি বোধ হয়, পদাঘাতে ডুবাইয়া দিও। তবুতো মহাকালের বক্ষঃস্থল হইতে শ্রীচরণ উত্তোলন করিতে হইবে। তুমি হয়তো কোপকুঞ্চিত লোচনে চাহিয়া মহাকালকে বলিবে, 'একে মার'। আমি অমনি হাসিয়া করতালি দিয়া বলিব, 'এ যে মা'র। চিদ্‌ঘন-শ্যামসুন্দরি, ঐ ভুবনমোহন রূপের ছটায় সে কোপের ঘটা একবার দেখাও, মা। তোমার ঐ স্মিতশোভনবদন-মণ্ডলে সে রোষারুণ করুণ-কটাক্ষ-ভঙ্গী দেখিতে বড়ই সাধ, মা। সে সাধ না পূর্ণ হইলে সাধনা কেবল বেদনাময়ী। ভক্ত-ভয়-ভঞ্জিনি, ভব-হৃদয়-রঞ্জিনি, তোমার খেলা তুমি জানো। ভয় দেখাও আর হাসাও কাঁদাও, 'মা' বলিতে শিখাইয়া দাও। মঙ্গলাচরণে হউক, অমঙ্গলাচরণে হউক, নাচিয়া নাচিয়া 'জয় মা' বলিয়া মঙ্গলাচরণে শরণ লই।

শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব।

মা! স্বরূপতঃ তোমার কোনও অংশই কখনও একেবারে দুইভাগে ঢাকা পড়িতে পারে না; কারণ একভাগে তুমি চিরকালই আবৃতা আচ্ছাদিতা—লুক্কায়িতা অন্তর্হিতা.; অন্যভাগে তুমি চিরকালই নিরাবরণসুন্দরী—স্বপ্রকাশ—জ্যোতির্ময়ী, নিখিল আবরণের আবরণ-রূপিণী ব্যোমব্যাপিনী দিগম্বরী। যে ভাগ তোমার পশ্চাৎবর্ত্তী, তাহাই মা! মায়া রাজ্য; আর যাহা মায়ার অতীত তত্ত্ব, তাহাই তোমার সম্মুখবর্ত্তী। মহাবিদ্যার দৃষ্টিপাতে অবিদ্যার আঁধার ঘুচিয়া যায়, তাই তোমার সম্মুখে মায়া দাঁড়াইতে পারে না। কিন্তু মা! এ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডের একমাত্র উপাদান মায়া তবে কাহার আশ্রয়ে দাঁড়াইবে? তাই মায়া তোমার চরণে শরণাগতা, অভয়পদের চিরাশ্রয়ে নিরাপদে রক্ষিতা। তাই মা! মায়ার অতীতা হইয়াও স্বয়ং তুমি মায়াময়ী মহামায়া।

শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব।

রণছোড়জী ও নরসিঁ মেহতা

বিখ্যাত লেখক কে. এম. মুন্সী বলেন,

শ্রীচৈতন্য চেয়েছিলেন, বৃন্দাবন ভারতীয় ভক্তি-আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র হ'য়ে উঠুক। এই দিকে লক্ষ্য রেখেই তিনি তাঁর কয়েকজন একনিষ্ঠ ভক্তকে বৃন্দাবনে পাঠালেন। এঁদেরই সুযোগ্য নেতৃত্বে ও অসীম প্রভাবে বৃন্দাবনী ভক্তিধারা ভারতকে পরিপ্লাবিত ক'রে ফেলে। ষোড়শ শতকে বৃন্দাবন থেকে গুজরাটে এলো এই প্লাবন। গুজরাটের শ্রেষ্ঠ ভক্ত কবি নরসিঁ মেহতা ও মীরাবাঈ বৃন্দাবনের শক্তিধর সাধক ও আচার্যদের দ্বারাই প্রভাবিত হয়েছিলেন।

নরসিঁ মেহতা মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের একজন উত্তর স্বরী।

গুজরাটের অন্তর্গত জুনাগড়।

এই জুনাগড়ের সন্নিকটে তলাজা গ্রামে নরসিঁ মেহতার জন্ম হয়। সে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগের ঘটনা। নরসিঁর বাবার নাম কৃষ্ণদাস মেহতা। এঁরা নাগর ব্রাহ্মণ।

নরসিঁর বাল্যকালেই মা ও বাবা মারা গেলেন। বৃদ্ধা ঠাকুর মা নরসিঁকে দেখাশোনা করেন। বড় ভাই বংশীধর প্রতিপালন করেন।

আট বছর বয়স পর্যন্ত নরসিঁ সম্পূর্ণ 'বোবা' ছিলেন। কথা কইতে পারতেন না। এই জন্যে ঠাকুর মা-র দুঃখের আর অন্ত ছিল না।

এই সময়ে জুনাগড়ে একজন বড় সাধু এলেন।

ঠাকুর মা নরসিঁকে নিয়ে তাঁর শরণাপন্ন হলেন।

'সাধু' নরসিঁর দুই কানে উচ্চৈঃস্বরে বললেন 'রাধেশ্যাম'।

সঙ্গে সঙ্গেই বালক নরসিঁ বাক্‌শক্তি ফিরে পেলেন। ব'লে উঠলেন 'রাধেশ্যাম'।

বালকের কানে 'রাধেশ্যাম' মন্ত্রই প্রথম প্রবেশ করলো। মা নয়, বাবা নয়—রাধেশ্যাম। আর, নরসিঁ-ও দুটি কথা জীবনে প্রথম উচ্চারণ করলেন 'রাধেশ্যাম'।

অল্প বয়স থেকেই সকলে নরসিঁ-র জীবনে অধ্যাত্ম-প্রভাব লক্ষ্য করেন। গ্রামে সাধু-সন্তরা এলে নরসিঁ তাঁদের কাছে যান। তাঁদের সেবা পরিচর্যা করেন। অল্প বয়সেই তিনি মেতে ওঠেন কীর্তন গানে। খুবই মিষ্টি গলা ছিল তাঁর। তিনি ভালো গাইতে পারতেন।

নরসিঁ-র বৈরাগ্য দেখে বড় ভাই অল্প বয়সেই তাঁর বিবাহ দিলেন। বড় ভক্তিমতী ছিলেন পত্নী মানেকবাঈ। কয়েক বছরের মধ্যে এঁদের একটি মেয়ে আর একটি ছেলে হোলো। মেয়ের নাম কুনওয়ার বাঈ। ছেলের নাম শ্যামল।

নরসিঁ সব সময়েই কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর থাকেন। সংসারের ধার তিনি বড় ধারেন না। সে ভার বইতেন তাঁর দাদা। দাদা নরসিঁকে ভালোবাসতেন।

একদিন সাধুসেবা করতে করতে সারাদিন কেটে গেলো। রাত্রিও হ'য়ে গেলো বেশ। সারাদিন ও এত রাত্রি পর্যন্ত স্ত্রী মানেকবাঈ কিছুই খান নি। স্বামী অভুক্ত রয়েছেন, খাবেন কি ক'রে ?

দাদার ঘাড়ে সংসারের বোঝা চাপিয়ে নরসিঁ নিশ্চিন্ত থাকেন, এটা বৌদি আদৌ পছন্দ করেন না। চার চারটে লোকের আহার ও অন্যান্য খরচ জোগাতে হয় দাদার। বৌদি তাই খুবই অসন্তুষ্ট। কারণে অকারণে নরসিঁকে কটুকথা কইতেন। সেদিন তিনি রাগে ফেটে পড়লেন। খুবই তিরস্কার অপমান করলেন নরসিঁকে।

নরসিঁ তখনই ঠিক করলেন, না, আর এ সংসারে থাকা নয়। গৃহত্যাগ করবেন। প্রাণের ইচ্ছা, তিনি দ্বারকায় যাবেন। সেখানে

রয়েছেন তাঁর প্রাণপ্রিয় রণছোড়জী। হ্যাঁ, তিনি রণছোড়জীর কাছে, তাঁর কৃষ্ণের কাছেই যাবেন।

স্ত্রী কাঁদতে লাগলেন। নরসিঁ তাঁকে সান্ত্বনা দিলেন।

এতকাল ভুলই ক'রে এসেছি, মানেকবাঈ। কৃষ্ণ, কৃষ্ণ ব'লে ডেকেছি! কত কেঁদেছি! কিন্তু কৈ, একদিনের জন্যেও তো দু-হাত বাড়িয়ে কৃষ্ণকে আঁকড়ে ধরি নি! এক হাতে আঁকড়ে ধরেছি দাদাকে, দাদার আশ্রয়কে; অপর হাতখানি বাড়িয়েছি কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে। ওগো, এই জন্যে তো কাউকেই পেলাম না। না পেলাম দাদাকে, না পেলাম আমার কৃষ্ণকে। পেলাম দুঃখকষ্ট। পেলাম লাঞ্ছনা গঞ্জনা। গোপীদের বস্ত্রহরণের কথা জানো তো। জল থেকে যখন এক হাত ঊর্ধ্বে তুলে কৃষ্ণকে ডাকলেন, বস্ত্র চাইলেন; কৃষ্ণ সাড়া দিলেন না। দিলেন না বস্ত্র ফিরিয়ে। উপরে উঠে এসে দু-হাত বাড়িয়ে আকুল হ'য়ে যখন ডাকলেন কৃষ্ণকে, চাইলেন আপন আপন বস্ত্র; তখন কি আর কৃষ্ণ থাকতে পারেন নিশ্চুপ হ'য়ে? তখনই দিলেন প্রার্থিত বস্ত্র। আজ থেকে আমিও ঠিক করলাম, মানেক-বাঈ, দুই হাত বাড়িয়েই কৃষ্ণকে আঁকড়ে ধরবার সাধনা করবো। আজ থেকে সম্পূর্ণরূপে তাঁর চরণেই ঠাঁই নেবো। আমি জানি, আমাদের সব ভারই তিনি সানন্দে বহন করবেন। এখন আসি। তুমি ভেবো না।

নরসিঁ বেরিয়ে পড়লেন। বেরিয়ে তো পড়লেন; কিন্তু তখন বাইরে দারুণ ঝড়বৃষ্টি, দুর্যোগ। তা হোক।

নরসিঁর অন্তরে কিন্তু ঝড় বইছে না। দুর্যোগ নেই। অন্তরে তখন সুন্দর নীলাকাশের মধুর প্রশান্তি।

নরসিঁ চলেছেন। মুখে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ। কখনও বা তাঁর নাম-গান চলছে।

সারারাত কৃষ্ণ-গুণগান গাইতে গাইতেই কেটে গেলো।

ভোর হোলো।

নরসিঁ উপস্থিত হলেন এক প্রাচীন শিব মন্দিরে। ভালোই হোলো।

নরসিঁ সঙ্কল্প করলেন, দেবাদিদেবকে প্রসন্ন ক'রে কৃষ্ণকে যাতে লাভ করতে পারেন, সেই বর প্রার্থনা করবেন। তিনি আশুতোষ। অল্পেই তুষ্ট হন। প্রাণভ'রে ভক্তির সঙ্গে একটি বেলপাতা ও কিছু ফুল অঞ্জলি দাও। তাইতেই তিনি সন্তুষ্ট হবেন। তা ছাড়া, পুরাণে পড়েছেন, রাধা ও অন্যান্য গোপীদের নিয়ে কৃষ্ণ যেদিন রাসলীলায় মত্ত ছিলেন, শিব গোপনে আঁড়ি পেতে সেই মধুর দৃশ্য উপভোগ করেছিলেন। নরসিঁ স্থির করলেন, দেবাদিদেবকে প্রসন্ন ক'রে রাসলীলা দেখবার সৌভাগ্য যাতে হয়, সে বরও তাঁর কাছে চাইবেন।

নরসিঁ বন থেকে আনলেন বেলপাতা আর ফুল। পূজো করলেন দেবাদিদেবের। পূজো শেষ হ'লে নিমগ্ন হলেন গভীর ধ্যানে। সারাদিন কেটে গেলো। কেটে যায় রাত। এমন সময়ে দেবাদিদেব আবির্ভূত হলেন। সারা বন আলোয় আলোময় হ'য়ে গেলো। আলোয় উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠলো সারা মন্দির। দিব্যভাবে আর পরিপূর্ণতায় চারিদিক পরিপ্লাবিত হ'য়ে গেলো।

বৎস, আমি প্রসন্ন হয়েছি। জানতে পেরেছি তোমার প্রাণের একান্ত অভিলাষ। আশ্বস্ত হও। অচিরেই তোমার অভীষ্ট পূর্ণ হবে। তোমার ইষ্টদেবকে তুমি দেখতে পাবে। দেখতে পাবে স্বচক্ষে রাসলীলার মধুর দৃশ্য। আজ দুদিন তুমি অনাহারে রয়েছো। কিছু খাও। দেহ সুস্থ করো। তারপরে খুশীমনে চ'লে যাও দ্বারকায় তোমার প্রভু রণছোড়জীর মন্দিরে।

খুসীর আকুলতায় নরসিঁর দুই চোখে জল এলো। কেঁদে ফেললেন। কাঁদতে কাঁদতেই তিনি ভগবান আশুতোষকে প্রণাম করলেন।--প্রণমামি শিবং শিব কল্পতরুং।

নরসিঁ এলেন দ্বারকায়।

কালবিলম্ব না ক'রে চলে এলেন রণছোড়জীর মন্দিরে।

রণছোড়জী নরসিঁর আরাধ্য দেবতা। প্রাণের প্রাণ, হৃদয়ের হৃদয়। তাঁর সব-সুখদুখমন্থনধন।

দেরী সইলো না। এক মুহূর্তও না। নরসিঁ ছুটে গেলেন রণজোড়জীর কাছে। ভুঁয়ে লুটিয়ে পড়লেন।

প্রভু, এতদিনে এলাম তোমার কাছে। আমাকে ঠাঁই দাও, ঠাঁই দাও। প্রভু, প্রভু!······

রণছোড়জীকে ডাকেন আর সারা মন্দিরে গড়াগড়ি দেন।

সর্বাঙ্গ ভেসে গেলো চোখের জলে। এত জলও চোখে থাকে!

কেটে গেলো কিছুক্ষণ।

তারপর উন্মত্তের মতো নাচতে লাগলেন। নেচে নেচে গাইতে লাগলেন প্রভু রণছোড়জীর নাম-গান। মাঝে মাঝে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন রণছোড়জীর দিকে।

প্রভু, ওগো প্রভু,···! এলাম, এলাম তোমার কাছে। নিঃস্ব হয়েই এসেছি। তুমি ছাড়া আর আমার কেউ নেই, কিছু নেই আজ। প্রভু, ওগো অন্তরবিহারী!···

চোখের জল আবাধে ছুটে চলে।

প্রভু! প্রভু! প্রভু!···

রণছোড়জীর পূজা শেষ হোলো। শেষ হোলো ভোগ-আরতি। দেখলেন নরসিঁ প্রাণ ভ'রে।

তারপরে সামান্য কিছু প্রসাদ মুখে দিয়ে মন্দির প্রাঙ্গণের এক কোণে বিশ্রাম করতে বসলেন।

বিশ্রাম করবেন কি, সব সময়ে একই চিন্তা। একই প্রার্থনা।—

রণছোড়জী, দেখা দাও! দেখা দাও!

মন্দিরে লোক অগণিত। এর মধ্যে নিভৃতি কোথায়? ঠাকুরকে যে দেখতে হবে, একান্ত নিভৃতে। সেখানে থাকবে মাত্র দুজন;

আর কেউ নয়। তিনি আর তাঁর রণছোড়জী। তাঁর রণছোড়জী আর তিনি।

ক্রমাগত কয়েকদিনের পথশ্রমে নরসিঁ ক্লান্ত। শরীর অবসন্ন। কিছুক্ষণের মধ্যেই নরসিঁ ঘুমিয়ে পড়লেন।

নিশুতি রাত। মন্দির প্রাঙ্গণের আলো নিভে গেছে। চারিদিক অন্ধকার।

নরসিঁ, নরসিঁ !

নরসিঁকে কে যেন ডাকলেন। যেন পরিচিত স্বর। কিন্তু তা-ও বা কেমন ক'রে হবে ? এত দূরে, এই মন্দিরে, তাঁর তো কোনও পরিচিত লোক থাকবার কথা নয়। তবে ?

নরসিঁ, নরসিঁ !

আবার সেই কণ্ঠস্বর ! তাঁকে ডাকছেন কেউ।

নরসিঁ, ঘুমিয়ে থাকবার জন্যেই কি ক্লেশ স্বীকার ক'রে এত দূরে এসেছো ? ওঠো। মন্দির-অলিন্দে যাও। তার পরে যাও পাশের ফুলমালঞ্চে। সেখানেই তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হবে। বিলম্ব কোরো না। শুভলগ্ন হেলায় হারিও না।

নরসিঁ বুঝতে পারলেন, এ নির্দেশ দিলেন স্বয়ং আশুতোষ ; সর্বমঙ্গলাকর ভগবান শঙ্কর।

দেবাদিদেবের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়ে নরসিঁ ছুটে এলেন ফুল বাগিচায়। শুনতে পেলেন কে যেন বাঁশী বাজাচ্ছে।

বাঁশীর সুর এত মধুর হয় ! পৃথিবীর সমুদয় মধু এখানেই কেন্দ্রভূত হ'ল নাকি !

নরসিঁ ফুল বাগিচার দিকে যত এগিয়ে চলেছেন, বাঁশীর সুর তত মধুর, আরও মধুর হ'তে লাগলো। ধীরে ধীরে নরসিঁর শরীরে জাগলো আলোড়ন। দেহ রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠলো। দেখা দিতে লাগলো একের পর এক সাত্ত্বিক বিকার। অর্ধবাহ্য অবস্থায় নরসিঁ ভূমিতে লুটিয়ে পড়লেন।

বেজেই চলেছে। মধুর। মধুর। আরও মধুর। আরও… ।

প্রেমাবিষ্ট অবস্থায় নরসিঁ দেখলেন, তাঁর সম্মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছেন বংশীবদন শ্রীকৃষ্ণ। সর্বভূত-মনোহর 'রসানাং রসতমঃ'। নবীন নীরদ বর্ণ। মাথায় শিখিপুচ্ছ। গলে কুন্দফুলের মালা। মুখে মৃদু মধুর হাসি। মরি মরি! এরূপের কি তুলনা আছে?—

যে রূপের এক-কণ ডুবায় সব ত্রিভুবন,
সর্ব প্রাণী করে আকর্ষণ।

শ্রীকৃষ্ণ বাঁশী বাজিয়েই চলেছেন।

ওগো, তোমাকে দেখবো, না, তোমার বাঁশী শুনবো! আমি উদ্ভ্রান্ত হ'য়ে পড়ছি। রূপ-মাধুর্য, না, মুরলী-মাধুর্য—আমি কোন্ মাধুর্যামৃত-স্রোতে ভেসে যাই, বলো!

নরসিঁ শ্রীকৃষ্ণের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

কিন্তু দুই চোখে তাঁকে ধ'রে রাখতে পারছি কই? মাধুর্যামৃতের স্রোত দৃষ্টির কুল ছাপিয়ে উছলে উছলে পড়ছে যে!

ওগো সচ্চিদানন্দ, ওগো অমৃতসিন্ধু, ওগো ত্রিলোকমোহন, তুমি আমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে থাক। দাঁড়িয়েই থাক। তোমার সুধাদৃষ্টি পরিব্যাপ্ত ক'রে তুলুক আমার সকল সত্ত্বা।···

থেমে গেলো বংশীরব।

তখন 'নৃণাং কামপূরঃ', নিখিলজনের কামনাপূরক শ্রীকৃষ্ণ বললেন,

নরসিঁ, জীবনে অনেক দুঃখ সয়েছো। আজ তোমার সকল দুঃখের অবসান হোলো। আজ থেকে আমার আনন্দলোকে তোমার নিত্য অধিষ্ঠান। সেখানে থেকেই নিয়ত উপভোগ ক'রে চল আমার লীলামাধুর্য। গানে গানে সে মাধুর্যরসে ভরিয়ে তোলো সকল লোকের হৃদয়কুম্ভ! সবাইকে সুখী করো। সবাইকে আনন্দ দাও। সকলের কল্যাণ করো।

নরসিঁ ভূমিতে লুটিয়ে সে আশীর্বাদ শিরোধার্য ক'রে নিলেন।

নরসিঁ, আমার রাসলীলা দেখতে চেয়েছিলে। দেখ। প্রাণ ভ'রে দেখ। প্রত্যক্ষ করো মহারাস। আমার সর্বোত্তম প্রেমলীলা।

আবার বাঁশী বেজে উঠলো। শ্রীকৃষ্ণের বাঁশী।

সেই বাঁশীর সুরে সমীরণ শীতল ও সুখস্পর্শ হোলো। পূর্ণচন্দ্র আকাশে উদিত হোলো অখণ্ড মণ্ডলাকারে। দীর্ঘকাল পরে ফিরে এসে প্রিয় যেমন আপন প্রেয়সীর মুখ অরুণ বর্ণ কুঙ্কুমে বিলিপ্ত করেন, তেমনই পূর্ণচন্দ্র পূর্বদিকের মুখ সুখতম কিরণে অরুণিত করলো। সুরঞ্জিত হোলো সারা বনস্থলী কোমল কিরণে। প্রফুল্ল হোলো লতাগুল্ম বৃক্ষবল্লরী। নানা বর্ণের অজস্র ফুল উঠলো ফুটে। বিকাশ-উন্মুখ কুন্দমন্দারের মধুর গন্ধে আকৃষ্ট হ'য়ে ছুটে এলো অলিদল। ভৃঙ্গ পিক গাইতে লাগলো। নাচতে লাগলো ময়ূর ময়ূরী। ব'য়ে চললো মৃদু মন্দ তরঙ্গ তুলে কলস্বিনী কালিন্দী। স্থাবর জঙ্গম নিখিল চরাচর আনন্দে মেতে উঠলো।

এ-হেন পরিবেশে ত্রিলোকে যত শোভা আছে সব অঙ্গীভূত ক'রে মন্মথ-মন্মথ দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণ গোপীকুল-শোভিত হ'য়ে রাস-মঞ্চে আবির্ভূত হলেন।

শুরু হোলো রাসলীলা।

জিনি পঞ্চশর দর্প স্বয়ং নবকন্দর্প
রাস করে লঞা গোপীগণ।

তত্রারভত গোবিন্দো রাসক্রীড়ামনুব্রতৈঃ।
স্ত্রীরত্নৈরন্বিতঃ প্রীতৈরন্যোন্যাবদ্ধ বাহুভিঃ॥
রাসোৎসব সংপ্রবৃত্তো গোপীমণ্ডলমণ্ডিতঃ।
যোগেশ্বরেণ কৃষ্ণেন তাসাং মধ্যে দ্বয়োর্দ্বয়োঃ।
প্রবিষ্টেন গৃহীতানাং কণ্ঠে স্বনিকটং স্ত্রিয়ঃ॥

গোপিনীরা পরস্পর পরস্পরের হাত ধরাধরি ক'রে দাঁড়ালে

গোবিন্দ প্রীত ও অনুব্রত সেই সব গোপিনীদের সঙ্গে মিলিত হ'য়ে রাসলীলা আরম্ভ করলেন।

সমাগত ব্রজসুন্দরীরা মণ্ডলী হ'য়ে দাঁড়ালেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের দুই দুই জনের মাঝখানে এমনভাবে প্রবিষ্ট হলেন ও দুই পাশের দুই দুইজনার গলদেশ এমনভাবে আলিঙ্গন করলেন যে প্রত্যেক গোপী-ই ভাবলেন, শ্রীকৃষ্ণ শুধু তাঁর নিজের কাছেই রয়েছেন, আর, শুধু তাঁকেই আলিঙ্গন করছেন।

স্বর্ণময় মণিরাজির মধ্যে ইন্দ্রনীলমণি যেমন শোভা পায় ঠিক তেমনই, সেই সব কাঞ্চনবর্ণা গোপিনীদের মধ্যবর্তী হ'য়ে, আলিঙ্গিতা সেই সব ব্রজগোপী দ্বারা, নন্দ-নন্দন নীলমণি শোভা পেতে লাগলেন।

গোপীদের মধ্যে থেকে শ্রীকৃষ্ণের শোভা যেমন বাড়লো, শ্রীকৃষ্ণের পাশে থেকে গোপীদের শোভাও তেমনই বৃদ্ধি পেলো।

পাদন্যাস, করচালন, সহাস্য ভ্রূবিলাস, আভুগ্ন মধ্যভাগ, সকম্প স্তনমণ্ডল, চঞ্চল বসন, গণ্ডস্থলে দোলায়মান কুন্তল দ্বারা গোপীদের মুখে বিন্দু বিন্দু স্বেদ উদগীর্ণ হচ্ছে। কবরী ও কাঞ্চীর গ্রন্থি তাঁদের শিথিল হ'য়ে পড়ছে।

গোপীরা উচ্চগ্রামে গান গাইতে আরম্ভ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে নৃত্য! দেখে বোধ হচ্ছে মেঘচক্রে বিদ্যুৎমালা খেলা করছে বুঝি!

বলয়ানাং নূপুরাণাং কিঙ্কিনাঞ্চ যোষিতাং।
সপ্রিয়ানামভূচ্ছব্দ স্তুমুলো রাসমণ্ডলে॥

তখন রাসমণ্ডলে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে বিহারিণী সেই সব গোপিনীদের বলয়, নূপুর ও কিঙ্কিনীর ধ্বনি তুমুল ও সঙ্কীর্ণ হ'য়ে উঠলো।

কর্ণোৎপল, চূর্ণকুন্তল, অলকা-অলঙ্কৃত কপোল ও স্বেদবিন্দুর সংযোগে নৃত্যরতা গোপীদের মুখ দেখাতে লাগলো পরম মনোহর।

গোপীরা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে নানারকম বিভ্রম—যেমন আলিঙ্গন, করাভিমর্ষণ, স্নিগ্ধ অবলোকন, উদ্দাম হাসি, প্রমত্ত বিলাস, এই সব

দেখিয়ে ক্রীড়া করতে লাগলেন। শ্রীকৃষ্ণও গোপীদের সঙ্গে কেলি করতে লাগলেন ঠিক এই এই ভাবেই।

শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ-সঙ্গে গোপীদের পরম আনন্দ হোলো। তাঁদের ইন্দ্রিয়গুলি খুবই আকুল হ'য়ে পড়লো। গলার মালা আর অলঙ্কার তাঁদের পড়তে লাগলো বিস্রস্ত হ'য়ে। কুন্তল, দুকূল, স্তনাবরণ কঞ্চুলিকা, এইসব শ্লথ হ'য়ে পড়লেও তাঁরা ঠিক ঠিক আগের মতো ধারণ করতে আর সক্ষম হলেন না।

ব্রজাঙ্গনারা রতিক্রীড়ায় শ্রান্ত হ'য়ে পড়লে শ্রীকৃষ্ণ নিজের হাতে তাঁদের মুখ মুছিয়ে দিতে লাগলেন।

নৃত্যগীতের ফলে পরিশ্রান্তা হ'য়ে সেই সব গোপীর মধ্যে কেউ শ্রীকৃষ্ণের একেবারে পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন। ধরলেন নিজের হাতে শ্রীকৃষ্ণের কাঁধ।

কেউ বা নিজের কাঁধে ন্যস্ত শ্রীকৃষ্ণের চন্দনে চর্চিত বাহুর পদ্ম-গন্ধ আঘ্রাণ ক'রে রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠলেন। আনন্দে পুলকাকুল হ'য়ে চুম্বন করলেন সে বাহু।

আবার কোনও গোপী নৃত্যের ফলে চঞ্চল কুণ্ডল-যুগলের কিরণে দীপ্যমান প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের গণ্ড আপনার গণ্ডে ধারণ করলেন।

এদিকে কোনও গোপী নৃত্য করতে করতে শ্রীকৃষ্ণের পাশে গিয়ে তাঁর সুমঙ্গল করকমল আপনার স্তনদ্বয়ে স্থাপন করলেন।

কোনও গোপী আবার স্বীয় নেত্ররন্ধ্র দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে হৃদয়ে আত্মসাৎ ক'রে চোখ বুজে তাঁকে আলিঙ্গন ক'রে যোগীর মতো পুলকিতাঙ্গী ও আনন্দসংযুতা হলেন।

মোহন-মধুর এই লীলাবিলাস নরসিং দেখলেন মন্ত্রমুগ্ধের মতো।—এই জগৎ-চমৎকৃতিকরী রাসলীলা।

ধীরে ধীরে নরসিং সম্বিৎ হারিয়ে ফেললেন।

ভোর হোলো।

মন্দিরে শুরু হোলো মঙ্গল আরতি।

নরসিঁ ঠাকুরকে প্রণাম করলেন একান্তে।

প্রভু, তোমার দীনদয়াল নাম আজ সার্থক হোলো। এ কৃপার তুলনা নেই। কৃপাসুন্দর, আজ আমি কৃতার্থ। সার্থক আমার জীবন। এবার বলো, প্রভু, কি করবো আমি এর পর?

অন্তরীক্ষ হ'তে রণছোড়জী বললেন,

তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হয়েছে। নরসিঁ, এখন ঘরে ফিরে যাও। আজ তুমি যে আনন্দ পেলে, সেই আনন্দের ভাগী ক'রে নাও সবাইকে। অকৃপণভাবে বিলিয়ে দাও সেই আনন্দ-অমৃত সকল লোকের মধ্যে। মানুষে মানুষে ভেদ এনো না। যেখানে যেটুকু ভেদ দেখবে, তা দূর করবার সাধনা করবে। মনে রাখবে, তোমরা সবাই 'হরির জন'। আজ থেকে নাম গেয়ে বেড়াও। শুনাও সকল 'হরিজনকে'। সকলে মিলে গেয়ে চলো। সকলে মিলে শুনে চলো।

প্রভু, হৃদয়েশ্বর,তবে আমারও একটা প্রার্থনা রইলো তোমার কাছে। আজ যে আনন্দ লাভ করলাম তা থেকে আমি যেন কখনও বঞ্চিত না হই। সব সময়েই যেন সেই মধুর রস, দিব্য আনন্দ লাভ করতে পারি।

তাই হবে, নরসিঁ। তাই হবে। পূর্ণ হবে তোমার মনস্কাম।

কী আর বাকী রইলো? যা যা চেয়েছিলেন নরসিঁ সবই পেলেন।

আনন্দের সরোবরে ভাসতে লাগলো, আহা, সন্তোষের শ্বেতপদ্ম!

খুসীমনে, পরম তৃপ্তি নিয়ে নরসিঁ ফিরে এলেন নিজের গ্রামে, নিজের গৃহে। এসেই প্রণাম করলেন তাঁর বৌদিদিকে।

ভাবীজী, আপনার ঋণ এ জনমে কিছুতেই শোধ করতে পারবো না। শ্রীকৃষ্ণ দর্শনে, তাঁর কৃপালাভে, আপনি-ই আমাকে সব চেয়ে বেশী সাহায্য করেছেন। আপনার সেদিনকার তিরস্কার পুরস্কার

হয়েই আমাকে ভাগ্যবান ক'রে তুলেছে। পরম সুখী করেছে আমাকে।

দাদা এলেন। নরসিং তাঁকে প্রণাম করলেন।

দাদা, আপনিই এতকাল আমাকে, আমার স্ত্রীপুত্র-কন্যাকে দেখেছেন। আমাদের প্রতিপালন করেছেন। সংসার চালিয়েছেন। আপনারই উপর এতকাল নির্ভর ক'রে ছিলাম। পিতার অবর্তমানে আপনিই আমাকে পিতার মত লালন-পালন করেছেন। আপনি দাদা হলেও আমার কাছে পিতারই মত গুরুজন। দাদা, এখন থেকে নির্ভর করবো আমার প্রিয়তম রণছোড়জীর উপর। আপনি আমাকে আশীর্বাদ করুন যেন রণছোড়জীর উপর এই নির্ভরতা অনুমাত্র শিথিল না হয়। আর এক কথা। আজই আমি সবাইকে নিয়ে চ'লে যাচ্ছি। জুনাগড়ে গিয়ে থাকবো সঙ্কল্প করেছি।

কি ক'রে সংসার চালাবে তুমি?

আমরা কেউই কিছু করিনে, দাদা; সবই করেন রণছোড়জী। তিনি এতকাল আপনার সংসার চালিয়ে এসেছেন। আমি নিশ্চিত জানি, দাদা, আমার সংসার চালাবার ভারও তিনি নেবেন। সম্পূর্ণ ভার-ই নেবেন।

জুনাগড়ে এসে নরসিং বাসা বাঁধলেন।

সকলের ভার সম্পূর্ণভাবে ছেড়ে দিলেন রণছোড়জীর উপর। নরসিং দিবানিশি কৃষ্ণ-নামে বিভোর থাকেন।

চারদিকে প্রচারিত হোলো, সবাই জানলো, নরসিং দ্বারকায় গিয়ে রণছোড়জীর কৃপালাভ করেছেন। তিনি একজন যথার্থ ভক্ত, সন্ত। দলে দলে লোক নরসিংর কাছে ছুটে আসতে লাগলো।

জুনাগড়ে এসে নরসিং রূপান্তরিত হলেন সাধক-কবি রূপে; তিনি এখন থেকে প্রভুর লীলা-কথা প্রচার করেন নোতুন ভঙ্গিমায়। সহজ সরল ভাষায় লীলাগান রচনা করেন। মধুর কণ্ঠে ভাবে বিভোর হ'য়ে সেই সব গান গেয়ে চলেন। অসংখ্য গান লিখলেন তিনি।

ঠিক যেন শ্রীচৈতন্য-ভক্ত একজন গৌড়ীয় বৈষ্ণব। কথায় অবিকল একই ভাব, একই সুর। সারা গুজরাটে নরসিঁর নাম প্রচারিত হোলো।

নরসিঁ গান গেয়ে গেয়ে প্রচার ক'রে চলেন—

কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান। নরবপু ধারণ ক'রে গোপ-গোপিনীদের সঙ্গে মিলিত হ'য়ে অপার মাধুর্যলীলা প্রকটিত ক'রে গিয়েছেন। এই মাধুর্যময়, প্রেমময় কৃষ্ণই সকলের উপাস্য। কৃষ্ণপ্রেম, কৃষ্ণভক্তি ছাড়া আর গতি নেই।

কৃষ্ণে একৈক নিষ্ঠা রেখে চল। তাঁকে নিত্য স্মরণ করো। ভজন ও নামকীর্তন করো তাঁর। কৃষ্ণে করো আত্মসমর্পণ। তবেই কৃষ্ণ তোমার সকল ভার বহন করবেন।

নরসিঁ ভালোবাসেন হরিকে। তাই ভালোবাসেন হরির জন—হরিজনকে। জাতিভেদ নেই। বর্ণ-বৈষম্য নেই। উচ্চ নীচ পণ্ডিত মূর্খ অভিজাত অভাজন—এসব কিছুই বিচার নেই তাঁর কাছে। সবাইকে, সবাইকে নরসিঁ ভালোবাসেন। সকলের সাথে একসঙ্গে তাই নাম গান করেন রণছোড়জীর।

নরসিঁ সবাইকে বলেন।—

তোমরা নামৈকশরণ হ'য়ে থাকো।

কেউ হয়ত বলে, মনের মধ্যে অনেক মল আছে। আছে কুটিলতা। তাই নাম করতে রুচি আসে না যে, নরসি ভাই।

নাম করো। নাম করো। নাম করতে করতেই দেখবে, তোমার মন স্থির হয়েছে। নির্মল হয়েছে। মধুর হয়েছে। ছাখো, যার শরীরে পিত্ত অধিক, তার কাছে এত যে মিষ্ট মিছরি, সেই মিছরিও তিক্ত মনে হয়। মজার কথা, এই তিক্ততার ওযুধ কিনা মিছরি! মিছরি আগে তিক্ততা কাটিয়ে পরে প্রতিষ্ঠিত করে তার মিষ্টত্ব। ঠিক এই রকম, হ্যাঁ, ঠিকই এই রকম, নাম আগে চিত্তকে শুদ্ধ করে।

পরে জাগায় কৃষ্ণরতির মাধুর্য। অভ্যাস থেকে আসে অনুরাগ। আর, অনুরাগ যদি হোলো, তখনই তো বুঝতে পারবে, কোন সাধ্যের জন্যে কি সাধন। কৃষ্ণপ্রেম লাভের জন্যেই কৃষ্ণকীর্তন।

সাধিতে সাধিতে যবে প্রেমাঙ্কুর হবে।
সাধ্য সাধনতত্ত্ব জানিবা সে হবে॥

সাধ্য কাকে বলে? সাধনই বা বলে কাকে, এ-সব তো জানিনে কিছু, নরসি ভাই।

যাঁকে লাভ করবার জন্যে মানুষ ভজনা করে তিনি হলেন সাধ্য। আর, সাধ্যকে পেতে যে অনুষ্ঠান বা আচরণ করি, তাই হোলো সাধন। কৃষ্ণই সাধ্য। ভজনই সাধনা।

নাম করো, নাম করো।

'মধুর মধুরমেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাং সকল নিগমবল্লী সৎফলং চিৎস্বরূপম্।

শ্রীকৃষ্ণের নাম সকল মধুরের মধুর, সকল মঙ্গলের মঙ্গল, সকল নিগমলতার সৎফল ও অপ্রাকৃত চৈতন্যস্বরূপ।

সবই তো বুঝলাম, নরসি ভাই। সবই বুঝলাম। কিন্তু মন বড়ই চঞ্চল, অস্থির। তাই কঠিন সাধনা যে পেরে উঠবো না। কেবল দেহ দ্বারা চলে এমন কোনও স্বল্প সাধন থাকে তো তা-ই বলো।

স্বল্প-সাধন? স্বল্প-সাধন হোলো নাম-কীর্তন। সব সময়েই—উঠতে বসতে, চলতে ফিরতে, নিদ্রার আগে, নিদ্রার পরে, 'যৈছে তৈছে যোই কোই', সব সময়েই কৃষ্ণনাম করবে। এমন কি মরণের সময়ও। চিত্ত চঞ্চল, তা হোক না। নাম-কীর্তন তারও অপেক্ষা রাখে না। চিত্ত-চাঞ্চল্যেও চলে নাম-কীর্তন। নাম-কীর্তনই শ্রেষ্ঠ অবলম্বন। একমাত্র অবলম্বন।

জানো—কলির যুগধর্মই নামকীর্তন? কথায় আছে না?—
সত্যযুগে ধ্যান, ত্রেতায় যজ্ঞ, দ্বাপরে অর্চনা আর কলিযুগে হরি-কীর্তন।
—ঐ যা বললাম নাম-কীর্তন।

নাম করতে হ'লে যে শ্রদ্ধা চাই। আমাদের যে শ্রদ্ধার অভাব, নরসিং ভাই। আমাদের উপায় ?

না না। নাম শ্রদ্ধারও অপেক্ষা রাখে না। সংশয় রয়েছে ? থাক না। তবু নাম করো। রয়েছে শুষ্কতা ? ভয় পেয়ো না। তাঁকে ডাকতে ডাকতেই ভক্তি আসবে। প্রবল নাম-শক্তির দুয়ারেই যে ভক্তিদেবী বাঁধা প'ড়ে আছেন।

আরও এক কথা আছে, ভাই।

আগুন যেমন রাশি রাশি তুলো পুড়িয়ে ফেলে, তেমনি কোনও হৃদয়ে যদি পাপ সঞ্চিত থাকে, কিংবা আশে পাশে থাকে পুঞ্জীভূত হ'য়ে ; সবই, সে সবই, নাম কীর্তন পুড়িয়ে দেবে, দূর ক'রে দেবে ; চারিদিক নির্মল করে দেবে।

তাই বলি, নাম করো। কৃষ্ণের নাম গাও। তাঁর নাম ভজনা করো।

সবাইকে বলেন নরসিং—

হ্যাঁ, তোমরাও নাম গান করো। শ্রীকৃষ্ণের নাম-গান। নাম-গানেই সব হবে। সব পাবে। নাম-গানই করো। সবাই।

আরও এক কথা জেনে রাখো, ভাই। নাম কথাটা কোথা থেকে পেলাম ? পেলাম নম্ ধাতু থেকে। নম্ অর্থে নামানো। নামায়। নামে নামায়, নামিয়ে আনে।

নামায় কাকে ? নামায় গোলোক থেকে হরিকে মর্ত্যের ধূলিতে, যে নাম করে তার কাছে। তার কাছেই নামিয়ে আনে।

নরসিং ব'লে চলেন,—

আরও কি করে ? নামে নামায় নামীকে অহঙ্কার থেকে, অভিমান থেকে দীনতায়। আড়ম্বর থেকে সরলতায়। তাই বলি, বলেন নরসিং—

নাম করো নাম করো নাম করো সার।
কলিকালে নাম বিনা গতি নাহি আর॥

এত সহজ ক'রে, হৃদয়গ্রাহী ক'রে নরসিঁ এই সব কথা বলতেন, তা শুনবার জন্যে বহুলোক তাঁর গৃহে নিত্য সমবেত হতেন।

নাম-গান শেষ হ'লে সবাইকে ঠাকুরের প্রসাদ দেওয়া হোতো। কোথা হতে, কেমন ক'রে সব জোগাড় হোতো, তা লোকে ভেবেই পেতো না। সবাই মনে করতো, এ হোলো কৃষ্ণের সংসার। স্বয়ং কৃষ্ণই এ সংসার চালাচ্ছেন। কৃষ্ণের এ সংসার একদিনের তরেও কিন্তু অচল হয় নি।

নরসিঁর এই সর্বজনীন ভক্তিবাদ, তথাকথিত নিম্নবর্ণের লোকদের সঙ্গে অবাধে, ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করা, খাওয়া-দাওয়া করা, আত্মীয়রা পছন্দ করলেন না।

তাঁরা একদিন দল বেঁধে এলেন নরসিঁর কাছে।

নরসিঁ, বৈষ্ণব হয়েছো, এ-তো ভালো কথা। তাই ব'লে যত সব ছোট লোক, অচ্ছুৎদের নিয়ে এত মাতামাতি করছ কেন? বৈষ্ণব হয়েছো ব'লে কি অচ্ছুৎদের নিয়ে এক সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করতে হবে? এ কী কথা! শাস্ত্র পড়ো। শাস্ত্রবিধি মেনে চলো। সেই অনুযায়ী আচার অনুষ্ঠান করো। বৈষ্ণব যদি হতে চাও, খাঁটি বৈষ্ণব হও। খাঁটি বৈষ্ণব।

নরসিঁ এর জবাব দিলেন স্বরচিত এই গানটি গেয়ে।—

বৈষ্ণবজন তো তেনে কহিয়ে
জে পীড় পরাই জানে রে।
পরদুঃখে উপকার করে তে,
মন অভিমান ন জানেরে॥

সকল লোকমাঁ সহুনে বন্দে,
নিন্দা তে ন করে কেনীরে॥

বাচ কাছ মন নিশ্চল রাখে তো,
ধন্য ধন্য জননী তেনী রে॥

সমদৃষ্টি নে তৃষ্ণা ত্যাগী,
পরস্ত্রী জেনে মাত রে ॥
জিহ্বা থকী অসত্য ন বোলে,
পরধন নব জ্ঞানে হাত রে ॥

মোহমায়া ব্যাপে নহি জেনে,
দৃঢ় বৈরাগ্য জেনা মন মাঁ রে।
রামনাম স্থঁ তালি রে লোগী
সকল তীরথ জেনা তনমাঁ রে ॥

বন লোভী নে কপট রহিত ছে,
কামক্রোধনে নির্বার্যা রে।
ভনে নরসৈয়োঁ তেনুঁ দরশন করতাঁ
কূল ই কোতের ত্যার্যা রে ॥

বৈষ্ণব ভবে তারেই বলি
আপন পর যার নাইরে জ্ঞান।
ভবে পরের দুঃখ আপন ভেবে
যে জন দুঃখে ম্রিয়মাণ ॥

দুঃখীর সেবা সদাই করে,
নিরভিমান রয় যে জন।
সবে জানায় নম্রনতি
ঘৃণার ভাব যার নাই কখন।
ধীর স্থির হয় সকল কাজে
দেহে মনে শক্তিমান ॥

নিস্তরঙ্গ নিস্পৃহ হয়
জীবন তৃষ্ণা ত্যাগ ক'রে।
এই জগতের পরম বৈষ্ণব
ভাগ্যবতীর সন্তান সে।

সে ভাই ভক্তিভরে পরস্ত্রীকে
মাতৃসম করে মান ॥

সদাই কহে সত্য কথা
পরধনকে লোষ্ট্রজ্ঞান।
ভবে আত্মবিশ্বাস যার আছে
তার নাই বা থাকুক শাস্ত্রজ্ঞান।
সদা মায়া মোহের উর্ধ্বে থাকি
সেই লভেছে মুক্তপ্রাণ ॥

যে জন বিষয়লুব্ধ হয় না কভু,
ভক্তিরসে সিক্তমন।
জীব তীর্থ-ভ্রমণ পুণ্য লভে
করলে তারে দরশন।
যে জন তত্ত্ব ছেড়ে ভক্তিভরে
করে রামের গুণগান ॥

আকাঙ্ক্ষা আর ক্রোধ রিপু
সকল সময় বশে যার।
এমন বৈষ্ণব ক'জন মেলে
খুঁজলে তবু পাওয়া ভার।
খুঁজে পাও যদি ভাই এ সংসারে
বলবো তোমায় ভাগ্যবান।
ভকত নরসিঁ কয় একান্তর পুরুষ
দর্শনে তার লভে প্রাণ ॥

কথনো নরসিঁ গান করেন, যার ভাবার্থ হোলো,-

করি স্নান তর্পণ আর আরাধনা
প্রভুর দেখা যায় কি পাওয়া ?

শুধু দান দাতব্যে কাটলে জীবন
কাছে কি তাঁর যায়রে যাওয়া ?

ষড়্ দর্শনেতে প্রাজ্ঞ হ'লে
পরম ধন কি তাতে মেলে ?
ঘুচলে জাতের মোহ,
তবুও পিছন বিষয়সুখ তোর করবে ধাওয়া।

ভকত নরসিঁ বলে বুকের মাঝে
আত্মারাম তোর লুকিয়ে আছে।
যে পেলো না তার দরশন
তার বৃথায় গেলো চাওয়া পাওয়া।
এই জীবনের পরম রতন
ফাঁকতালে সে আপনি হাওয়া॥

কখনও নরসিঁ গান করেন, যার ভাবার্থ—

ওগো, সত্য কি কখনো চুলচেরা তত্ত্বের বিচারে উদ্‌ঘাটিত হয় ? জীবাত্মা, ভগবান, পরমাত্মার ভেদাভেদ নির্ণয় ক'রে ? নরসিঁ বলেন, আগে দূর করো সব ভেদবুদ্ধি। ভুলে যাও 'আমি তুমি'র ভেদাভেদ। তবেই গুরু আবির্ভূত হবেন। প্রসারিত ক'রে দেবেন তাঁর কল্যাণ হস্ত।

নরসিঁ গান করেন, যার ভাবার্থ হোলো—

সখি, দয়িত আমায় ডেকেছে বাঁশীর সুরে। এক মুহূর্তও আর ঘরে থাকা যায় না। হৃদয়-সরসীতে উল্লাসের প্রমত্ত তরঙ্গ। একটিবার তাঁর চান্দবদন দেখতে চাই, সই। বলো, তুমি বলো, এজন্যে আমায় কী করতে হবে ? কানুর কণ্ঠে ছিল আমার বাহু জড়ানো। তার বদন-সুধা আমি পান করেছিলাম।······কী ক'রে যাবো পানিয়া ভরণে ? তার বাঁশীর যাদু আমায় আচ্ছন্ন করেছে। তার মোহন

আঁখি দুটি সদাই তীক্ষ্ণ বাণ হানছে। তার অঙ্গ লাবণি আমায় অবশ, বিহ্বল করেছে। সই, আমার শ্যামের আঁখিদুটির তুলনা নেই। তাতে প্রেমের অমোঘ মায়াজাল। এ জাল ছিন্ন ক'রে, বলো সই বলো, কেমন ক'রে নিজের ঘরে ফিরে যাবো? আমার দেহ মন প্রাণ সব-ই যে চুরি গিয়েছে, সখি।

নরসিঁ গান করেন, ভাবার্থ যার—

সেই শ্রীরাধামাধব কৃষ্ণকেশব
লভেছি তাহার সঙ্গ।

বাহুর মিলনে জুড়ায়েছি প্রাণ
শীতল করেছি অঙ্গ।

দু'জনেই হ'য়ে গেছি দু'জনার।
আর তাই কিছু নাই ভাবনার।
পেয়ে দিয়ে তারে সব অধিকার
মিছে ভয়ে নাহি মরি।
আমি দু'নয়ন ভ'রে হেরেছি মধুর
মধুময় রাসরঙ্গ।
এই দেহমন আর নয়গো আমার,
হ'য়ে গেছে তাহা ব্রজ গোপীকার।
(আমি) প্রেমের বাসরে শ্রীমতী রাধার
প্রিয়তমা সহচরী।

শুনিয়াছি বাঁশী রাধা পাশে বসি,
(বাঁশী) প্রাণমন নিল হরি।
সে-ও মোর প্রিয়তম স্বামী।
সেই রাধিকারমণ ব্রজের জীবন,
দেহ মন প্রাণ তারে করি দান
হারায়ে গিয়েছি আমি।

এমন ধারা কত সুন্দর, মধুর গান তিনি লিখেছেন, গেয়েছেন!

মেয়ের বিয়ে আগেই হ'য়ে গিয়েছে। এবার পুত্র শ্যামলের বিয়ের সম্বন্ধ এলো এক মস্ত বড় ধনীর বাড়ী থেকে। বিয়ে ঠিক হ'য়ে গেলো।

আত্মীয়রা বেঁকে বসলেন।

বিয়ে যখন ঠিকই করেছ, নরসিঁ, তখন ঘটা করেই বিয়ে দিতে হবে। নইলে আমাদের অপমান হবে। তা সইবো না আমরা। আগে থাকতেই এটা কিন্তু জানিয়ে রাখলাম।

মানেকবাঈ বললেন, তা এর জন্যে এত ভাবনা কেন? দ্বারকার অধিপতি যার প্রভু, তার আবার অভাব? তুমি আজ-ই রওনা হও। রণছোড়জীকে সব জানাও। নিশ্চয় একটা কিনারা হবে।

ঠিক কথাই বলেছো, মানেকবাঈ, ঠিক কথাই বলেছো।

নরসিঁ খুসী মনে রওনা হলেন।

এলেন দ্বারকায়।

কয়েকদিন কেটে গেলো রণছোড়জীকে দেখে। নাম-গানে, ভজনে।

যে জন্যে নরসিঁ এসেছেন দ্বারকায় রণছোড়জীর কাছে, তা বলাই হয়নি। ভুলেই গিয়েছেন সে কথা। প্রভুকে দেখলে কি এ-সব তুচ্ছ বিষয়ের কথা মনে থাকে? শুধু নাম-গান, শুধু ভজন। তাই চলছে। অষ্টপ্রহর।

নরসিঁ ভুলে গেলে কি হবে? যাঁকে ভার দেওয়া হয়েছে, যিনি ভার নিয়েছেন; সেই রণছোড়জী তো ভোলেন নি। তিনি একদিন নরসিঁকে দেখা দিলেন।

নরসিঁ, এখানে আর দেরী কোরো না। বাড়ী যাও। সেখানে আমার অগণিত ভক্ত তোমার প্রতীক্ষায় প্রহর গুনছে। আর শোন, মানেকবাঈ তো ঠিক-ই বলেছে। আমি তোমার প্রাণ-প্রিয় সখা।

ইহকালের পরকালের সখা। হ্যাঁ, এ দুই-ই আমি দেখবো। তুমি ভেবো না। শ্যামলের বিয়ে ভালো ভাবেই হবে।

ভালো কথা মনে ক'রে দিলে, প্রভু। তোমার কাছে এসে সে কথাটা ভুলেই গিয়েছিলাম। কি জানো, তোমায় দেখলে সব-ই ভুলে যাই। তা কথাটা যখন বললে, তখন খুলেই বলি। এ-সব ব্যাপারে আদৌ ভাবি নে। কেন ভাববো?

আমি কাঙাল। কিন্তু সবাই তো জানে, তোমার মত রাজরাজেশ্বর আমার সখা। সবাই জানে, তুমি আমায় পালন করো। দেখো ঠাকুর, তোমায় যেন কেউ নিন্দে না করে। তা হ'লে কিন্তু আমি বাঁচবো না।

না, নরসিঁ, তোমার কোনো ভয় নেই। জেনে রাখো, যারা এক হাতে সংসার ধরে, অন্য হাতে ধরে আমায়, তাদের ভার আমি বইনে। যারা তোমার মত দুই হাত দিয়েই আমাকে ধরেছে, তাদের সব ভার-ই আমি আনন্দের সঙ্গে বহন ক'রে থাকি। তোমার সব ভার-ই তো আমি নিয়েছি, নরসিঁ।

ফিরে এলেন নরসিঁ।

শ্যামলের বিয়ে হ'য়ে গেলো মহাসমারোহে, খুবই ঘটা ক'রে। কেউ-ই বুঝলো না, এটা কী ক'রে হোলো। কোথা থেকে সব হোলো। আত্মীয়েরা তো সব অবাক! দু একজনে বললো, তা আর অবাক কথা কি। নরসিঁ-র শিষ্য অনেক। তারাই হয়ত সাহায্য ক'রে থাকবে।

একদিন একদল নিতান্ত সাধারণ লোক নরসিঁ-র কাছে এলো।

রোজই তো তোমার বাড়ীতে নাম-গান হয়। এবার চলো না আমাদের পাড়ায়, নরসিঁ ভাই। সেখানেই গিয়ে নাম-গান করবে।

এ তো ভালো কথা, ভাই, ভালো কথা। কৃষ্ণসেবায় তোমাদেরই যে শ্রেষ্ঠ অধিকার। ঠাকুরের কি তোমাদের 'পরে কম কৃপা?

তোমাদের অর্থ দেননি। উচ্চবর্ণের গৌরব দেন নি! পাণ্ডিত্য দেন নি। এ-সব কি কম ভাগ্যের কথা? তোমাদের যে অহঙ্কার করবার, অভিমান আসতে পারে, এমন কিছুই নেই, ভাই। তাই সহজেই, অতি সহজেই, প্রাণের ঠাকুরকে তোমরা প্রাণে প্রাণে ধরতে পারবে। হ্যাঁ, আমি যাবো। নিশ্চয়-ই যাবো। তোমাদের ওখানে গিয়ে প্রাণ ভ'রে কীর্তন করবো। সবাই এক সঙ্গে।

নরসিং গেলেন তাদের পল্লীতে। একবার নয়, বহুবার। কাটান প্রহরের পর প্রহর নাম-গানে, ভজন-কীর্তনে।

জ্ঞাতিরা, আত্মীয়রা, রক্ষণশীল যাঁরা তাদের সবাই, ভীষণ ক্ষেপে গেলেন নরসিং-র উপর।

তোমায় প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। ক্ষমা চাইতে হবে। প্রতিজ্ঞা করতে হবে, ভবিষ্যতে আর কখনও ওই সব পল্লীতে যাবে না। এ-সব না করলে, আমরা তোমায় সমাজচ্যুত করবো।

আপনারা যে-সব কথা বললেন. তার একটিও আমা দ্বারা সম্ভব হবে না জানবেন। মানুষে মানুষে ভেদাভেদ আমার ঠাকুর করেন না। সবাই আমার ঠাকুরের নিজজন। যাদের কথা বলছেন, তারা অক্ষম। তাই তারা আমার ঠাকুরের আরও বেশী আপন। তাইতো আমায় আরও বেশী ক'রে ওখানে যেতে হবে। আমার ঠাকুর তাতে খুসী-ই হবেন।

নরসিং ব'লে চললেন,—আপনারা শাস্ত্রের কথা বলছেন? শাস্ত্র বলছেন, ইন্দ্রিয় নির্মল ক'রে প্রিয়তমের যে সেবা তারই নাম ভক্তি।

ভক্তিতে তো জাতিকুলের বিচার নেই। ভক্তি যে সার্বত্রিক। হোক না সে শূদ্র, হোক না সে চণ্ডাল, হোক না সে বিধর্মী, সে-ও যদি ভক্তিকে আশ্রয় করে বা ভক্তকে আশ্রয় করে, সে-ও পবিত্র হয়ে ওঠে।

কৃষ্ণ তুল্য কৃষ্ণ নাম কৃষ্ণ শক্তি যত।
অপ্রাকৃত সর্বশক্তি নামেতে অর্পিত॥

তাহে কালাকাল নাহি কীর্তনে বিচার।
এতো কৃপা ঈশ্বরের জীবের উপর ॥

অর্থাৎ কিনা, ভক্তিতে স্থান অস্থান নেই। যেখানে খুশি, হাটে বাটে, মাঠে ঘাটে, ভবনে শ্মশানে, ভজন করতে পারো। আর, যে কোনও অবস্থায়। 'ন কাল নিয়মঃ কশ্চিন্ন দেশ নিয়মস্তথা'।—'স্থানের নিয়ম নাহি কালের নিয়ম।'

নাম-সঙ্কীর্তনে কভু কালাকাল নাস্তি।
সর্বদা লইবে নাম দৃঢ় করি অস্তি ॥

শুনুন, প্রহ্লাদ নাম করতেন মাতৃগর্ভে থেকে, ধ্রুব করতেন শৈশবে, অম্বরীষ যৌবনে, যযাতি বার্ধক্যে আর অজামিল নাম করেছিলেন মরণকালে। হ্যাঁ, নরকে বসেও যদি নাম করে কেউ নরক হয়ে উঠবে স্বর্গ। জানবেন, নাম-কীর্তনই শ্রীকৃষ্ণ-ভজন।

তাই আমার অনুরোধ আপনাদের কাছে, আপনারা আমাকে নিষেধ করবেন না। বরং আমি আপনাদের অনুরোধ করছি, আপনারাও চলুন আমার সঙ্গে ওদের পল্লীতে। দেখবেন. কত আনন্দ পাবেন! আপনারা কত সুখী হবেন!

না না।—গর্জে উঠলেন সবাই। না না। ওসব আমাদের দ্বারা হবে না। তাঁরা আরও শাসালেন,—

তুমি ওদের নিয়েই থাকো। ত্যাগ করো আমাদের সংশ্রব। আমরা তোমার সংশ্রবে আর থাকতে চাইনে।

সেদিন এক অলৌকিক ঘটনা ঘ'টে গেলো।

এক ধনী জ্ঞাতির বাড়ী বিবাহ-উৎসব। নরসিং-কে তাঁরা নিমন্ত্রণ করলেন না।

বিবাহ হোলো। খেতে বসলেন সবাই।

ওঃ হরি! প্রত্যেকের-ই পাশে ব'সে রয়েছেন এক একজন অচ্ছুৎ—হরিজন!

রামচন্দ্র!—সবাই খাওয়া বন্ধ ক'রে উঠে পড়লেন।

নিশ্চয়ই এ নরসিঁ-র কাজ! তার ক্ষমতায়-ই এটা সম্ভব হয়েছে। সবাই প্রত্যক্ষ করলেন নরসিঁ-র ক্ষমতা। তাঁরা স্বীকার করলেন নরসিঁ-র প্রভাব।

আগের মতো নরসিঁ-কে আবার সমাজে নেওয়া হোলো।

জুনাগড়ের রাজা একদিন নিমন্ত্রণ ক'রে আনলেন নরসিঁ-কে।

নরসিঁ প্রাসাদে এসেই নামকীর্তন শুরু করলেন।

কীর্তন শেষ হ'লে রাজা নরসিঁ-কে অনুরোধ করলেন, দেখুন, আজ আমার জন্মদিন। বড় ইচ্ছে, আজ এখানে ব'সে রণছোড়জীর প্রসাদী মালা পাই। আপনি তো রণছোড়জীর চিহ্নিত সেবক, ভক্ত। আপনি দয়া ক'রে ঐ মালা এখানে এনে দিন।

না না, মহারাজ! আমার কোনও ক্ষমতা নেই। আমি রণছোড়জীর দীন সেবক মাত্র। দীনাতিদীন আমি।

রাজা বার বার অনুরোধ করতে লাগলেন।

নরসিঁ-র ঐ একই জবাব।—

এ সব ক্ষমতা আমার নেই, মহারাজ।

রাজা কোনও কথা শুনলেন না। শেষে ক্রোধে ক্ষিপ্ত হ'য়ে বললেন, হয় মালা আনুন, নয় কারাগারে গিয়ে প'চে মরুন।

নরসিঁ কারাগারেই গেলেন।

নরসিঁ-র আনন্দ আর ধরে না। সারাদিন রণছোড়জীর নাম-গান করেন প্রভুর আবির্ভাব-স্থান কারাতীর্থে ব'সে।

এরই ফাঁকে একবার তাকালেন রণছোড়জীর মুখের দিকে। লীলাময় হাসছিলেন।

প্রভু, সবাই জেনেছে, নরসিঁ তোমার শরণাগত। সে তোমার অপার কৃপা লাভ করেছে। তাই বলি, প্রভু, নরসিঁর মান রক্ষা ক'রে তোমার শরণাগতি-তত্ত্বের জয় ঘোষণা করো।

রণছোড়জী হাসলেন।

ভোর হোলো।

রাজা এলেন কারাকক্ষের সামনে।

নরসিঁ নাম-গানে বিভোর। দুই চোখে তাঁর অশ্রুর প্লাবন। কিন্তু হাত দুখানিতে রণছোড়জীর দুগাছি বড় মালা!

হ্যাঁ, এই তো রণছোড়জীর মালা!—সবাই আনন্দে চেঁচিয়ে উঠলেন।

রাজা পুলকিত হলেন। কৃতার্থ হলেন। নরসিঁর কাছে বার বার ক্ষমা চাইলেন। তাঁকে অশেষ সম্মান দেখালেন।

এ-ও সম্ভব!

জয় রণছোড়জীর জয়!

জয় ভক্ত নরসিঁ-র জয়!!

কেটে গেলো বেশ কিছু দিন।

জুনাগড়ের একজন বড় বণিক এলেন নরসিঁ-র কুটিরে।

আমি বড় বিপদে পড়েছি। আমায় উদ্ধার করুন।

সঙ্কটত্রাতা তো আমি নই, শেঠজী। যিনি সকল সঙ্কট মোচন করেন, তাঁকেই জানান আপনার বিপদের কথা।

বেট দ্বারকার বন্দরে একজন বড় শেঠকে আমার পাঁচ হাজার মোহর দিতে হবে। দিতে হবে নির্ধারিত সময়ের আগেই। দেশে ঘোর অরাজকতা চলছে। এখন এত মোহর সঙ্গে নিয়ে যাওয়া সমীচীন নয়। বিপদের আশঙ্কা করি।

তা, এ ব্যাপারে আমি কি করতে পারি?

আমি চাই, ঐ পরিমাণ অর্থ এখানে কারও তহবিলে জমা দিই। আর, দ্বারকায় পৌঁছে ওঁর কোনও স্থানীয় প্রতিনিধির কাছ থেকে তা গ্রহণ করি। দ্বারকা থেকে বেট দ্বারকা বন্দর কাছেই। এ ব্যবস্থায় কোনও অসুবিধা হবে না।

আপনার কথার তাৎপর্য, আর আমার সঙ্গে এ ব্যাপারের সংশ্রব কি, আমি কিছুই যে বুঝে উঠতে পারছি নে।

আপনি পারেন সবই। সবাই জানে রণছোড়জী আপনার বন্ধু। দেখুন, আপনার কাছে আমি পাঁচ হাজার মোহর জমা রাখছি। তার

বদলে আপনি আমায় একখানা চিরকুট লিখে দিন। সেই চিরকুটে লিখে দেবেন, আমি দ্বারকায় পৌঁছলে আপনার বন্ধু রণছোড়জী যেন ঐ মোহরগুলো দিয়ে দেন। তা না করলে আমার ব্যবসা থাকবে না। মান ইজ্জত সবই যাবে।

নরসিঁ তো অভিনব এই প্রস্তাব শুনে হতবাক্!

যিনি জগতের প্রভু, তাঁর সাথে বেনিয়ার হাত-চিঠায় অর্থের লেন দেন করবো!

বণিক কোনও কথা বলবার অবকাশই দিলেন না। নরসিঁর কাছে মোহরগুলো রেখে চ'লে গেলেন।

বণিক দ্বারকায় চ'লে এলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই এক শ্যামল কিশোর এসে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলো, আপনি কি নরসিঁর লোক?

বণিক সম্মতি জানালেন।—হ্যাঁ, আমি ই।

এই নিন মোহরের থলি। এতে পাঁচ হাজার মোহর আছে।

শ্যামল কিশোর থলি দিলেন বণিককে।

এমনি ভাবেই নরসিঁর মান রেখেছিলেন সেদিন রণছোড়জী।

হ্যাঁ, ভক্ত নরসিঁর মান রাখতে রণছোড়জী এ-ও করেছিলেন!

আশি বছর বেঁচেছিলেন নরসিঁ।

শেষকালে তিনি শোক পেলেন বিস্তর। স্ত্রী মারা গেলেন। পুত্র শ্যামল মারা গেলো : মেয়েটি বিধবা হোলো।

কেউ সান্ত্বনা দিতে এলে নরসিঁ বলতেন।—

এ আঘাত নয়, পরীক্ষা। যাকে ভজন সাধন দিয়েছেন, সিদ্ধি দিয়েছেন, পরীক্ষা দেবার শক্তি যে শুধু তারই রয়েছে, ভাই। রণছোড়জী কৃপা ক'রে এ জীবনে কিছু দিয়েছেন আমায়। তাই পরীক্ষাও নিচ্ছেন এমনি ভাবেই। না, ভাই, এ নিগ্রহ নয়, এ অনুগ্রহ, অনুগ্রহ।

তাই ব'লে এক বিন্দু জলও পড়বে না আপনার চোখ দিয়ে?

ভাই, রণছোড়জী যে ভাবে আমায় তৈরী করেছেন, তাতে এই আচরণ ছাড়া আমি কী করতে পারি? রণছোড়জীর কৃপায় আমি

উপলব্ধি করেছি—আমার সবই, দেহ মন প্রাণ, আমার আত্মীয় স্বজন সবাই, তাঁর কাছ থেকেই উদ্ভূত। যারা গেলো, তারাও মিললো তাঁর কাছে গিয়ে। তবে আমার ক্ষোভ কোথায়? কেন? কেনই-বা নিরানন্দ? আমার জগৎ রণছোড়জী সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছেন। তার বাইরে তো কেউ নেই, ভাই। কিছু নেই।

যাবার দিন—যাবার দিন কেন? মিলনের দিন। রণছোড়জীর সঙ্গে শাশ্বত মিলনের দিন।

নরসিঁ ডাকলেন সবাইকে।

আমার অপ্রকট হবার লগ্ন এসে গিয়েছে। আমি গাইছি। তোমরাও গাও, ভাই সব। গাও আমারই সঙ্গে সুর মিলিয়ে—

সুখ সংসারী মিথ্যা করী মানজ্যো,
কৃষ্ণ বিনা বীজুঁ সব কাচুঁ।

এই বিশ্ব প্রপঞ্চের স্তরে স্তরে যত কিছু সুখ আর আনন্দ সে সবই অলীক, ছায়াময়। আমার পরাণ-প্রভু কৃষ্ণজী বিনা আর সব-ই যে ক্ষণস্থায়ী—বুদ্বুদের মতো!

গাইতে গাইতে নরসিঁ সমাধি মগ্ন হ'য়ে পড়লেন। এ সমাধি আর ভাঙ্গলো না।

সুখ সংসারী মিথ্যা করী মানজ্যো,
কৃষ্ণ বিনা বীজুঁ সব কাচুঁ॥

——

রাজা রামকৃষ্ণ

রাজা রামকৃষ্ণ।

নাটোরের রাণী ভবানী। তাঁর দত্তকপুত্র রামকৃষ্ণ।

রাজসাহীর আটগ্রাম নামক গাঁয়ে রামকৃষ্ণের জন্ম।

রাণীর অপরিমেয় ঐশ্বর্য। প্রতিপত্তির আরও বেশী। তার চাইতেও বেশী খ্যাতি।

অগাধ ঐশ্বর্য ও প্রতিপত্তি মধ্যে রামকৃষ্ণ বড় হ'তে লাগলেন। শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতদের কাছেই তাঁর বিদ্যা শুরু হোলো।

ঐশ্বর্য-প্রতিপত্তি, বিলাস-ব্যসনের মধ্যে থেকেও রামকৃষ্ণ উদাসীনের মত থাকেন।

ঐশ্বর্য ভালো লাগে না। আড়ম্বর ফাঁকি ব'লে মনে হয়। রাজত্বে মন বসে না।

গুরুদেব রঘুনাথ তর্কবাগীশ। তাঁর শরণাপন্ন হলেন রাণী ভবানী।

গুরুদেব, রামকৃষ্ণকে নিয়ে কী করি? সে কি সন্ন্যাসী হ'য়ে ঘরসংসার ছেড়ে চ'লে যাবে?

সুন্দরী সুলক্ষণা সর্বগুণান্বিতা মেয়ের সন্ধান করো। ওর বিবাহ দাও।

রামকৃষ্ণের বিবাহ দেওয়া হোলো। পরমা সুন্দরী বধূ কাত্যায়নী এলেন ঘরে।

রাণী অল্প অল্প ক'রে জমিদারীর ভার ছেড়ে দিতে লাগলেন রামকৃষ্ণের 'পরে। রামকৃষ্ণ জমিদারী দেখেন।

কিন্তু কোথায় শান্তি?

স্ত্রী আছেন। নবজাত পুত্রও রয়েছে। এ-সব তো রামকৃষ্ণের কাছে কিঞ্চিৎ আকর্ষণও নয়।

স্ত্রী-পুত্রের চাইতেও যে তাঁর কাছে প্রিয়তর মা, মা কালী।

রামকৃষ্ণ এই মা-কে—মার বিগ্রহ দেখলেই কেমন যেন হ'য়ে পড়েন। নিমেষে যেন চ'লে যান আর এক জগতে।

সেখানে রয়েছেন শুধু তিনি আর তাঁর মা। মা কালী।

মা আর ছেলে। ছেলে আর মা।

রামকৃষ্ণ মুক্তির জন্যে পাগল। যেতে চান ঐ জগতে।

তাঁর কণ্ঠে সব সময়েই মা মা মা!

নাটোরের জয়কালী বিগ্রহ বড়ই জাগ্রত।

রামকৃষ্ণ ছুটে যান বিগ্রহ দেবতার কাছে। জপ করেন মাতৃমন্ত্র। কেটে যায় প্রহরের পর প্রহর।

মাঝে মাঝে আত্রেয়ী নদীতীরে বাগ্‌সারের শ্মশানে গিয়েও সাধনা করেন।

ভবানীপুর। একান্ন শক্তিপীঠের একটি। নাটোরের নিকটেই এই পুণ্য পীঠস্থান। দেবী ভবানী। বিশেষ বিশেষ তিথিতে রামকৃষ্ণ যান ভবানী মন্দিরে। মায়ের পূজো করেন। পঞ্চমুণ্ডী আসনে ব'সে ধ্যান করেন। মন্দিরের চারদিকে রামকৃষ্ণ চারটি পঞ্চমুণ্ডীর আসন পেতেছেন।

মাঝে এক সময়ে তারাপীঠে গিয়েও সাধনা করলেন। সে সময়ে সিদ্ধ মহাত্মা আনন্দনাথ তারাপীঠে থেকে সাধনা করতেন। রামকৃষ্ণ আনন্দনাথের কাছ থেকে নানা তত্ত্ব শিক্ষা করলেন।

রামকৃষ্ণ দীক্ষা নিয়েছেন। দীক্ষা নিয়েছেন মাতৃমন্ত্রে।

থাকেন পূজার ঘরেই দিনের বেশীক্ষণ। সঙ্গে আর কেউ নয়, একা।

নিষেধ ক'রে দিয়েছেন, মন্দিরে থাকবার কালে কেউ-ই যেন তাঁর সঙ্গে দেখা না করে। সতর্ক ক'রে দিয়েছেন প্রহরীদের।

রাজকার্য তাই দিন দিন উপেক্ষিত হয়।

তবু স্ত্রী রয়েছেন। তাঁর 'পরে কর্তব্যও আছে। রাণী কাত্যায়ণী মনোরমা ভার্যা। স্বামীর মনোবৃত্ত্যনুসারিণী!

স্ত্রীকে নোতুন কঙ্কণ গড়িয়ে দিতে হবে।

স্বর্ণকারকে ব'লে দিলেন রাণীর পছন্দ মতো খুব ভালো কঙ্কণ গড়িয়ে দেবার জন্যে।

কেটে গেলো দিন কয়েক।

সেদিন রাজা রয়েছেন পূজার ঘরে। সেখানে এলেন রাণী কি এক কাজে।

রাজা সেই কঙ্কণের কথা জিজ্ঞাসা করলেন।

এখনও গড়ানো শেষ হয়নি, রাণী জানালেন।

পর দিন।

রাজা পূজার ঘরেই রয়েছেন।

অকস্মাৎ এক জটাজুটধারী সন্ন্যাসী আবির্ভূত হলেন প্রাসাদের সিংহদ্বারে।

তোমাদের মহারাজা কোথায়? তাঁকে গিয়ে বলো, একজন সন্ন্যাসী এসেছেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে।—সন্ন্যাসী বললেন।

প্রহরী জানালো, প্রভু, মহারাজ এখন তাঁর পূজার ঘরে রয়েছেন। সেখানে কারও যাবার হুকুম নেই। তা ছাড়া, কোনও কথা জানালেও তার জবাব মিলবার সম্ভাবনা নেই। তিনি বাইরেকার কারও সঙ্গে তখন কথা বলেন না।

সন্ন্যাসী হাসলেন।

আমি বলছি, যাও।

প্রহরী পড়লো উভয় সংকটে। রাজার আদেশ অমান্য করবে এত সাহস নেই। এদিকে আবার এই সন্ন্যাসীর আদেশ। যে-সে

সন্ন্যাসী নন। তেজঃপুঞ্জকায় জটাজুটধারী সন্ন্যাসী। দেখলেই ভক্তি করতে ইচ্ছে হয়।

ভয়ে ভয়েই প্রহরী গেলো। পূজার ঘরের সামনে গিয়ে জানালো সন্ন্যাসীর আগমন সংবাদ। তিনি যা বলতে বলেছেন, তা-ও জানালো।

কোনও জবাব এলো না রাজার কাছ থেকে।

রাজা রামকৃষ্ণ তখন ইষ্টদেবী ভগবতী কালীর মানস-পূজায় নিমগ্ন।

সন্ন্যাসীর আগমন-সংবাদ শুনেও রামকৃষ্ণ কোনও কথা কইলেন না।

প্রহরী ফিরে এসে সন্ন্যাসীকে সব-ই জানালো।

সন্ন্যাসীর মুখে আবার হাসি ফুটলো। এবার কিছুটা বিদ্রূপের হাসি।

সন্ন্যাসী বললেন, পূজা শেষ ক'রে রাজা বাইরে এলে তাঁকে বোলো, রাণীর কঙ্কণ-চিন্তা আর ইষ্টদেবীর মানস-পূজা এক নয়।

সন্ন্যাসী দ্রুত সে স্থান ত্যাগ করলেন।

প্রহরী নিতান্ত সাধারণ সরল মানুষ। এ নির্দেশের গভীর তত্ত্ব সে কী ক'রে বুঝবে!

হ্যাঁ, শুধু এইটুকু সে বুঝেছে, স্বচ্ছন্দচারী এ সন্ন্যাসীর আদেশ অমান্য করা চলে না।

রাজা পূজার ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন বেশ খানিকক্ষণ বাদে। এসেই জিজ্ঞাসা করলেন, সেই সন্ন্যাসী কোথায়?

প্রহরী সব কথা জানালো। রেগে চ'লে গিয়েছেন তা-ও জানালো। জানালো যা বলতে বলেছেন রাজাকে সেই কথাও।— রাণীর কঙ্কণ-চিন্তা আর ইষ্টদেবীর মানস-পূজা এক নয়।

ঠিক! ঠিক!—রাণীর কঙ্কণ-চিন্তা আর ইষ্টদেবীর মানস-পূজা এক নয়।

রাজার মরমে পৌঁছুলো এই কথা।

অন্যায় করেছি। অপরাধ করেছি।

ব্রহ্মরন্ধ্র তাঁর যেন কেঁপে উঠলো।

কোথায় সন্ন্যাসী? সেই সন্ন্যাসী কোথায়?

ছুটে চললেন সন্ন্যাসীর খোঁজে।

কিন্তু হায়, সন্ন্যাসী যেখানে, রাজা রামকৃষ্ণ সেখান থেকে এখনও অনেক দূরে। সন্ন্যাসীর সন্ধান তিনি পাবেন কী ক'রে?

কিন্তু সেই মহাপুরুষ রাজাকে যে সন্ধান দিয়ে চ'লে গেলেন, তার ফলে সেই মুহূর্ত থেকে রামকৃষ্ণের সন্ধান পাওয়াও সকলের পক্ষে সাধ্যাতীত হ'য়ে পড়লো।

রাজা কখন, কোথায়, কি অবস্থায় থাকেন তার কিছুরই ঠিকানা রইলো না।

সেই সময় থেকে রাজা সর্বদাই অন্যমনা। সর্বদাই ধীর-স্তিমিত-লোচন। তখন থেকে প্রায়ই সমাধিস্রোতে নিমজ্জিত থাকেন।

কেটে গেলো এই ভাবে তিন বছর।

সেদিনও রামকৃষ্ণ পূজায় নিমগ্ন।

অকস্মাৎ সেই সন্ন্যাসী প্রাসাদের সিংহদ্বারে আবির্ভূত হলেন।

সেই পুরানো প্রহরী ছিল সিংহদ্বারে। সন্ন্যাসীকে দেখেই সে চিনলো। প্রণাম করলো ভক্তিভরে। সসম্মানে তাঁকে নিয়ে গেলো পূজার ঘরে রাজার কাছে।

রাজা তখনও মায়ের মানস-পূজায় নিমগ্ন। তিনি তখন এক মহাসংকটে পড়েছেন।

রাজা আজ মনোময় উপচারে মনোময়ীর পূজায় বিভোর। তিনি মনে মনে মায়ের যে মূর্তি গড়েছেন, সে মূর্তির শিরোদেশে মনোময়

মণি-মাণিক্য—খচিত মুকুট বিরাজিত। আর, সেই মুকুটের কিরীটখানি বেশ উঁচু।

রামকৃষ্ণ নিয়ে এলেন মনোময় রক্তজবার মালা।

মুক্তকেশী মহামায়ার গলায় সেই মনোময় রক্তজবার মালা পরাবেন।

দুই হাতে মালা-গাছি নিয়ে রাজা যতবার মায়ের গলায় সেই মালা পরাতে চেষ্টা করছেন, ততবারই উঁচু কিরীটের মাথায় ঠেকে সে মালা ফিরে ফিরে আসছে।

রাজা গলদ্‌ঘর্ম হ'য়ে উঠলেন। বড়ই বিষণ্ণ, বড়ই বিপন্ন তিনি।

হায়, মাকে আজ মালা পরাতে পারলাম না!

দারুণ দুঃখে রাজার চোখ দুটি ছলছল ক'রে উঠলো। রাজা কেঁদে ফেললেন।

মা, আমি কী করবো? তুমি ব'লে দাও, মা, এখন আমি কী করবো?

ঠিক তখনই পূজাঘরের বাইরে থেকে জবাব এলো।—

রামকৃষ্ণ, কাঁদছো কেন? মুক্তকেশীর মাথায় রত্নমুকুট দিয়েই তো আজ এই বিপদ ঘটিয়েছো! মুকুট উঠিয়ে মালা পরাও।

মা রইলেন। পূজো রইলো। রাজা তক্ষুনি ঘরের বাইরে এলেন দরজা খুলে।

রাজা সেই মুহূর্তে বাইরেকার পূজা—ঘরের দরজা খুললেন, তাই নয়; অন্তর্মন্দিরের দরজাও নিমেষে খুলে ফেললেন।

বাইরে এসে রাজা দেখলেন ভস্মবিভূষিত, দীর্ঘজটাজুট—সমন্বিত এক সন্ন্যাসী সেখানে দাঁড়িয়ে। তাঁর সকল অঙ্গ দিয়ে যেন জ্যোতি নির্গত হচ্ছে!

সন্ন্যাসী হাসছিলেন।

রাজা সন্ন্যাসীকে চিনতে পারলেন।

জন্মান্তরের শ্মশান-সাধনার সহচর তিনি। তিনি সিদ্ধ সাধক মহাত্মা পূর্ণানন্দ গিরি।

রাজা মহাপুরুষের চরণে লুটিয়ে পড়লেন।

দাদা, ত্মাখো, আজ আমার এই দশা! সেই যে তুমি তিন বছর আগে আমায় লজ্জা দিয়ে কৃপা ক'রে পালিয়ে গেলে, তারপর থেকে এই দীর্ঘকাল—পূরো তিন তিনটে বছর, আমার যে কী ভাবে কেটেছে, তা জানেন মা মহামায়া, আর দাদা, জানো তুমি।

পূর্ণানন্দ হাসলেন।

ভয় নেই! সেদিন আমি পালিয়ে গিয়েছিলাম ব'লেই এই তিন বছর পরে আজ তোমার কাছে, অতি কাছে আসতে পারলাম যে, ভাই! তুমি তখন যা ছিলে তাতে তখন আমার আসবার সময় হয়নি। একবার মনে করোতো, ভাই, কোথায় তোমার সেই কঙ্কণের চিন্তা! আর, কোথায় বা এই মালা-সংকট!

কৃপাময়ী জননী তোমাকে কৃতার্থ করেছেন ব'লেই জন্মান্তরের প্রতিশ্রুতি পালনের জন্যে আমি আবার তোমার কাছে এলাম, ভাই।

শোনা যায়, এর পর থেকে রামকৃষ্ণ রাণী কাত্যায়নীর সঙ্গে ভৈরব ভৈরবী যুগলমূর্তিতে বাগ্‌সারের মহাশ্মশানে সাধনায় মহাপুরুষ পূর্ণানন্দ গিরির সহচারী হ'য়ে রইলেন কিছুকাল।

সেদিন অমাবস্যা।

রামকৃষ্ণ জয়কালীর মন্দিরে গিয়ে মহাশক্তির আরাধনা করছেন। পান করেছেন প্রচুর কারণবারি। আঁজলা ভ'রে বারবার অঞ্জলি দিচ্ছেন মায়ের পায়ে রক্তজবা আর বিল্বপত্র।

কণ্ঠে মা মা মা!

রামকৃষ্ণ নিমগ্ন হলেন মায়ের ধ্যানে।

কাছে রইলো প্রিয় অনুচর ভোলা। ভোলা রামকৃষ্ণের উত্তরসাধক। আর রইলেন পুরোহিত।

এমন সময়ে অকস্মাৎ আবির্ভাব হোলো এক সন্ন্যাসীর। হাতে তাঁর দণ্ড কমণ্ডলু। মাথায় দীর্ঘজটা।

পুরোহিত তাঁকে অভ্যর্থনা জানালেন।

সন্ন্যাসী বললেন, আমি রাজার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।

ভোলা রয়েছে মন্দির আগ্‌লে। সে জানালো,

প্রভু ধ্যানাসনে থাকলে কারও সাথে দেখা করেন না।

আগন্তুক চেঁচিয়ে বললেন, রাজা রামকৃষ্ণ, ধিক তোমায়! এমন ক'রে আপন ভুলে ব'সে আছ? একবার মনে কর, কি ছিলে তুমি! জানবার চেষ্টা কর, তোমার আসল পরিচয়। স্মরণ কর পূর্বকথা। ঘুচিয়ে ফেলো এই মায়ার বাঁধন।

নিমেষে সন্ন্যাসী অন্তর্হিত হলেন।

দিন যায়।

রাজার বিষয় বিরক্তি এর মধ্যে চরমে উঠেছে।

নাটোরের পাশেই বাগ্‌সারের শ্মশান। শ্মশানে শেয়াল কুকুরের ভীড়। শব ও নরকঙ্কালের ছড়াছড়ি। এখানেই রাজা কাটান অধিক সময়।

কণ্ঠে শুধু মা মা মা!

কখনও গান ধরেন—

এখনো কি ব্রহ্মময়ী,
হয়নি মা তোর মনের মত।
অকৃতী সন্তানের প্রতি
বঞ্চনা কর মা কত!

দিন যায়। যায় মাসের পর মাস।

রাজার ঔদাসীন্য বেড়ে যায়। বেড়ে যায় সাধনার তীব্রতা।

একদিন এক ব্রাহ্মণ এলেন! হাতে তাঁর একটি শিলাখণ্ড। এতে হেঁয়ালীপূর্ণ একটি সংকেতলিপি অঙ্কিত আছে।

রাজাকে ব্রাহ্মণ এই শিলাখণ্ড দান করলেন।

ব্রাহ্মণ, কোথায় পেলেন এই শিলা?

শ্মশানে।

কে দিয়েছেন?

এক সন্ন্যাসী।

ব্রাহ্মণ অভাবের তাড়নায় আত্মহত্যা করতে চলেছিলেন, এমন সময়ে এই সন্ন্যাসী এসে তাঁকে এই শিলাখণ্ড দিয়ে বললেন,

রাজাকে আপনি দিয়ে আসুন। তাহ'লে অভাবের তীব্রতা কিছুটা আপনার লাঘব হবে। কিছু অর্থপ্রাপ্তি ঘটবে।

রাজা ব্রাহ্মণকে প্রচুর অর্থদান করলেন।

শিলায় লেখা ছিল—

যদুপতে ক্ক গতা মথুরাপুরী।
রঘুপতে ক্ক গতোত্তর কোশলা।
ইতি বিচিন্ত্য কুরুষ্ব মনস্থিরং
ন সদিদং জগদিত্যবধারয়॥

যদুপতি শ্রীকৃষ্ণের সেই মথুরাপুরী কোথায় গেলো? কোথায় গেলো রঘুপতি শ্রীরামচন্দ্রের উত্তর কোশলা? এর তাৎপর্য বুঝে মনস্থির করো। জেনো এ জগতে কিছুই চিরস্থায়ী নয়।

ইতিমধ্যে রাণী ভবানীর সঙ্গে রামকৃষ্ণের মতান্তর ও মনান্তর ঘটলো। ঘটলো বিষয় দেখাশুনার ব্যাপারে।

'রাণী ভবানী রামকৃষ্ণের উপর রাজ্যভার দিয়া কাশী-বাসিনী হইয়াছিলেন। কিন্তু এধারে রাজ্যশাসনের ভার দিয়া যাহাকে তিনি রাখিয়া গিয়াছিলেন, ভগবান তাঁহাকে রাজ্যশাসন করিবার জন্য পাঠান নাই। মহারাজ রামকৃষ্ণ একজন সাধক পুরুষ ছিলেন। অন্তরে বাহিরে, চিন্তায় ধ্যানে তিনি ছিলেন একজন পরম বৈরাগী। রাজস্ব অনাদায়ে এক এক জমিদারী নীলামে উঠিতেছে, অমনি কালীর সম্মুখে আনন্দে ছাগ-বলি দিতে থাকেন, আর বলেন, আঃ বাঁচিলাম, আর একটি বন্ধন ঘুচিয়া গেল। সে এক অপরূপ দৃশ্য! জমিদারীর পর জমিদারী নীলামে উঠিতে থাকে, আর দেবী-পূজার ধূম ততই

বাড়িয়া যায়। বাহিরের বন্ধন যতই খসিয়া যাইতে লাগিল, মহারাজ রামকৃষ্ণের অন্তরে ততই বৈরাগ্য প্রকট হইয়া উঠিতে লাগিল।

রাণী ভবানী কাশী হইতে আসিয়া এই ব্যাপার দেখিয়া শুধু বলিলেন, তুমি সূর্য-বংশের রাজাদের মত হও, আর কিছু চাই না।'—নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ।

রাণী ভবানী বলতে চেয়েছিলেন, সূর্যবংশীয় রাজারা দুই কূল বজায় রেখেছিলেন। বজায় রেখেছিলেন একদিকে ধর্ম, ত্যাগ, বৈরাগ্য, দান, ধ্যান ; অপর দিকে রাজ্যশাসন, প্রজাপালন এই সব। রাজা রামকৃষ্ণ রাজ্যশাসনের দিকে মন না দিয়ে শুধু ধর্মের দিকেই মন দিয়েছিলেন—এটা রাণী ভবানীর অভিপ্রেত ছিল না।

এই নিয়েই মতান্তর। এই নিয়েই মনান্তর।

দিন যায়।

ইতিমধ্যে রাজার এসে গেলো যেন দিব্যোন্মাদ অবস্থা। কখনও ছুটে যান বড়নগরের কিরীটেশ্বরী মন্দিরে। কখনও যান ভবানীপুরের শক্তিপীঠে। ধ্যানে জপে কাটে দিনের পর দিন।

অবশেষে এক শুভলগ্নে ভবানীপুরের পীঠে পঞ্চমুণ্ডীর আসনে উপবিষ্ট অবস্থায় রাজা ইষ্টদেবী মহামায়ার দর্শন লাভ করলেন।

মা দেখা দিলেন রামকৃষ্ণকে। রামকৃষ্ণ কৃতার্থ হলেন।

ভবানীপুর পীঠে সেবার রামনবমী উৎসবের বিপুল সমারোহ।

রাজা রামকৃষ্ণ সাড়ম্বরে দেবীর পূজো করছেন। দেবী-বিগ্রহের দিব্য অঙ্গে বহুমূল্য রত্ন আভরণ। রাজপুরীর মহিলারাও এসেছেন নানা অলঙ্কারে ভূষিতা হ'য়ে। রাজার কোষাগারে জমা পড়েছে প্রচুর অর্থ।

অমাবস্যার মধ্যরাত্রে দেবীপূজা হবে।

রাজা রামকৃষ্ণ আজ প্রেমানন্দে বিভোর। তিনি স্বরচিত একটি গান গাইছেন প্রাণ ঢেলে।

ভবে সেই সে পরমানন্দ
যে জন পরমানন্দময়ীরে জানে ॥

সে জন না যায় তীর্থ পর্যটনে, কালী ছাড়া কথা না শুনে কানে।
সন্ধ্যা পূজা কিছু না মানে, যা করেন কালী সেই সে জানে ॥
কালীর চরণ যে করেছে স্থূল সহজে হয়েছে বিষয়েতে ভুল।
ভবার্ণবে পাবে সে কূল, মূল হারাবে সে কেমনে ॥
রামকৃষ্ণ কয় এমন জনে লোকের নিন্দা না শুনে কানে।
আঁখি ঢুলুঢুলু রজনী দিনে কালী নামামৃত-পীযূষ পানে ॥

রাজা কুঠিবাড়ীর ছাদে ব'সে গানটি বারবার গাইছেন। চোখের জলে বুক ভেসে যাচ্ছে।

ঠিক এমনি সময়ে একদল ডাকাত এলো—হারে রে রে!

তাদের হাতে নানা ধরণের মারাত্মক অস্ত্র।

অন্ধকারে রাজা রয়েছেন ছাদে। দেখলেন এক বিস্ময়কর, অভূতপূর্ব দৃশ্য!

ডাকাতরা মশাল নিয়ে, অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আক্রমনোদ্যত হ'য়ে এগিয়ে আসছে, সঙ্গে সঙ্গেই ভীত হ'য়ে তারা পালিয়ে যাচ্ছে। আবার তারা আসছে। আবার কিছুক্ষণ পরেই পিছিয়ে যাচ্ছে।

মন্দিরে তো রক্ষী নেই বেশী!

তবে কে তাদের আক্রমণ প্রতিহত করছে?

খানিকক্ষণ এইভাবে যুদ্ধ ক'রে ডাকাতের দল ভয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে পালিয়ে গেলো।

আর কেউ কিছু বুঝলো না। রাজা সব বুঝলেন। শুধু বুঝলেন না, দেখলেন।

রাজা দেখলেন, স্বয়ং মহামায়া হাতের খড়্গ নিয়ে রণরঙ্গিণী মূর্তিতে দস্যুদের আক্রমণ প্রতিহত ক'রে তাদের বিতাড়িত করছেন! মায়ের তখন কী রুদ্রাণী মূর্তি! ভ্রূকুটি-কুটিলাননা!

রাজা দেখছেন আর গান গাইছেন।—

কার রমণী সমরে বিরাজে ?
কে গো লজ্জারূপা দিগম্বরী অসুর সমাজে ?
মায়ের পদতল বরণ জিনি তরুণ অরুণ।
নখরে নিশাকর লুকাইল লাজে।

অপূর্ব, অচিন্ত্যনীয় এই দৃশ্য দেখে রাজা গাইছেন আর কপোল বেয়ে দরদর ধারায় জল গড়িয়ে পড়ছে! আজ তাঁর অপার সৌভাগ্য! মা-র এই অলৌকিক লীলা তিনি স্বচক্ষে দেখলেন। দস্যু-দলের ত্রাসরূপে স্বয়ং অবতীর্ণা হ'য়ে মা আজ ভক্তকে রক্ষা করলেন।

ডাকাতদের সর্দার পরদিন ভোরে এলো। লুটিয়ে পড়লো রাজার পায়ে। তারা যা দেখেছে, এই আলৌকিক লীলা, সব তাঁর কাছে প্রকাশ করলো। যতবারই তারা আক্রমণ করতে গিয়েছে, যে দিক দিয়েই গিয়েছে, অসুর-সংহারিণী দানব-দলনী মা, ততবারই সব দিক দিয়েই তাদের প্রতিহত করেছেন। পিছু হঠতে তারা বাধ্য হয়েছে।

সর্দারের নাম শঙ্করা। সে কাঁদতে লাগলো। সে কী কান্না!

উত্তর বঙ্গের সবচেয়ে দুর্ধর্ষ ডাকাত সে। তার চোখে জল! ভয়ে নয়। সে-তো মরণকে ভয় করে না। কাঁদছে সে, মা-কে দেখেছে ব'লে। কাঁদছে সে, মায়ের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে ব'লে। কাঁদছে সে, মায়ের ভক্ত, রাজার অর্থ লুণ্ঠন করতে এসেছিল ব'লে। কাঁদছে, মায়ের প্রিয় ভক্ত, তাদের রাজাকে এতদিন চিনতে পারে নি ব'লে। আজ তারা চিনেছে।

সর্দার রাজার পায়ে লুটিয়েই রইলো। সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য ডাকাতরাও।

শঙ্করা আজ পাষণ্ড নয়, আজ সে ভক্ত। তার অনুচররাও।

শঙ্করা কাঁদতে কাঁদতেই বললো, মহারাজ, আমি জানতাম, মাত্র কয়েকজন রক্ষী আপনার এখানে আছে। তাই লুঠ করতে এসেছিলাম। একবারও ভাবিনি, যিনি সবাইকে পালন করেন, সংহার

করেন, সেই জগৎজননী আপনার হ'য়ে স্বয়ং যুদ্ধে নামবেন। আজ বুঝেছি, মহারাজ, আপনার আশ্রয়-ই সবচেয়ে নিরাপদ আশ্রয়।

ভাই, তোমার সৌভাগ্যের সীমা নেই। স্বয়ং জগন্মাতাকে দেখতে পেয়েছো, তাঁকে যুদ্ধে নামিয়েছো, তাঁকে খড়্গ ধরিয়েছো। এ সৌভাগ্য আর কার কপালে জুটেছে, বলতো ভাই! তোমার সব দোষ ক্ষমা করলাম। আজ থেকে মায়ের নাম করো। মায়ের গান গেয়ে দিন কাটাও, ভাই।

রাজভাণ্ডার শূন্য হ'তে চলেছে। রাজার যশ কিন্তু বিপরীতভাবেই বেড়ে চলেছে। সংবাদ এলো, বাদশাহ রাজা রামকৃষ্ণকে 'মহারাজাধিরাজ পৃথ্বীপতি বাহাদুর' উপাধি প্রদান করেছেন। বাদশাহ ও ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রতিনিধিরা আসছেন এই উপলক্ষ্যে উৎসব-অনুষ্ঠানে যোগ দিতে।

নাটোরে উৎসব শুরু হয়েছে। সর্বত্রই সমারোহ, ঘটা। রাজা কিন্তু একেবারে নিস্পৃহ। মুক্ত-পুরুষ তিনি। রাজছত্র ও কৌপীন তাঁর কাছে আজ সমান। রাজা দেওয়ানকে আদেশ দিলেন, ক্রমাগত কয়েকদিন ষোড়শোপচারে নিত্য দেবী পূজা হবে, ব্রাহ্মণ ভোজন ও কাঙালী বিদায় চলবে।

শোভাযাত্রা চলেছে। সে শোভাযাত্রার পুরোভাগে হাতীর পিঠে চলেছেন রাজা।

অকস্মাৎ আবার সেই সন্ন্যাসীর আবির্ভাব!

সন্ন্যাসী রাজাকে দেখতে পেলেন। রাজাকে ইশারা করলেন।—

নেমে এসো।

রাজা তৎক্ষণাৎ হস্তীপৃষ্ঠ থেকে নেমে এলেন।

হ্যাঁ, ইনিই তো প্রস্তরখণ্ডে সংকেত পাঠিয়েছিলেন।

সেই ব্রাহ্মণ ছিলেন অনতিদূরে। তিনিই একথা জানিয়ে দিলেন।

রাজা সন্ন্যাসীর পিছু পিছু চললেন। আর কাউকে তাঁদের অনুগমন করতে নিষেধ করলেন।

সন্ন্যাসী আর কেউ নন—শ্রীজী। এই নামে উচ্চকোটি সাধু সমাজে ইনি সম্মানিত। বুঁদি রাজবংশে এঁর জন্ম। যৌবনেই গৃহত্যাগ ক'রে সন্ন্যাসী হয়েছেন। এক মহাযোগীর আশ্রয়ে এসে ইনি হয়েছেন সিদ্ধপুরুষ।

উভয়ে এলেন এক প্রান্তরে। তাঁরা বসলেন।

শ্রীজী বহুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন রাজার দিকে। তারপর হঠাৎ রাজার মেরুদণ্ড স্পর্শ করলেন।

নিমেষে রাজার চোখের সামনে গত জন্মের সব ঘটনা ভেসে উঠলো।

রাজা দেখলেন, হরিদ্বারে এক গিরিগুহায় তিনি ব'সে রয়েছেন। তাঁর সামনে উপবিষ্ট তাঁরই গুরুদেব আর গুরুভাই। সকলেই ধ্যানমগ্ন। সেই গুরুভাই-ই শ্রীজী।

শ্রীজী ছিলেন রামকৃষ্ণের নিত্যসঙ্গী। তাঁর অধ্যাত্ম-জীবনের অন্যতম পথপ্রদর্শক। রামকৃষ্ণ সংসার বাঁধনে বাঁধা পড়েছেন জেনে তাঁকে মুক্ত করবার জন্যেই ছুটে এসেছেন।

অতর্কিতে শ্রীজী অন্তর্হিত হলেন।

রাজা রামকৃষ্ণ তো প্রস্তুত হ'য়েই রয়েছেন।

বিদায় নিলেন প্রিয়তমা পত্নীর কাছ থেকে। দুটি নাবালক পুত্র রয়েছে। তাদের রাখলেন পত্নীরই তত্ত্বাবধানে।

রাজা এলেন ভবানীপুরের মন্দিরে। ভবানীদেবীর কাছে।

বসলেন পঞ্চমুণ্ডীর আসনে ধ্যানে।

ধ্যানের সে কী তীব্রতা! কী কঠোর সাধনা!

ইষ্টদেবী তো আগেই তাঁকে দেখা দিয়েছেন। কিন্তু সে কি দেখা? দেখা দিয়েছেন আর ক্ষণ-পরেই মিলিয়ে গিয়েছেন।

রাজা সঙ্কল্প করলেন, ইষ্টদেবীর অচঞ্চল, স্থায়ী আসন পাতবেন তাঁর হৃদয়-বেদীতে।

সেদিন অমাবস্যা। ঘোর অন্ধকার। চারদিকই নিস্তব্ধ। রামকৃষ্ণ গভীর ধ্যানে নিমগ্ন।

অকস্মাৎ চারিদিক আলোয় আলোময় হ'য়ে উঠলো। তারপর সেই আলোকমণ্ডলের মধ্য থেকে আবির্ভূতা হলেন জগজ্জননী মহামায়া!

রাজা লুটিয়ে পড়লেন।

এতক্ষণে এলে মা! মা! মাগো!......

বৎস রামকৃষ্ণ, আজ আমি এলাম তোমাকে আমার ক'রে নিতে। কিন্তু বৎস, তার আগে তো তোমার অন্তিম প্রস্তুতিটি ক'রে নিতে হবে। রাণী ভবানী তোমার মা। অধ্যাত্ম-জীবনের প্রথম পাদে তুমি তাঁর কাছ থেকেই দীক্ষা নিয়েছিলে। বর্তমানে তাঁর সঙ্গে তোমার কিছুটা মনান্তর ঘটেছে। তাঁর সঙ্গে তোমার সব ভুল-ভ্রান্তি মিটিয়ে না ফেললে তো পরমপ্রাপ্তি ঘটবে না। এখনই সব মিটিয়ে এসো। আর বিলম্ব কোরো না। শুভ লগ্ন এসে গিয়েছে।

মা, মাগো, তুমি তো সব জানো। জানো, কেন মা আমার 'পরে বিরূপ হয়েছেন? এবার তুমি-ই ব'লে দাও মা, কী, আমায় করতে হবে।

বৎস, রাণী চেয়েছিলেন তোমাকে শক্তিমান সাধক ও প্রজানুরঞ্জক রাজা দুই-ই করতে। কিন্তু তুমি রাজত্ব ঠেলে ফেলে হ'য়ে উঠলে মুক্তিকামী সাধক। এই জন্যেই তো মনান্তর। তুমি মায়ের কাছে যাও। ক্ষমা ভিক্ষা কর। মিটিয়ে ফেলো লৌকিক জীবনের যত দাবী-দাওয়া। তারপর এসো আমার কোলে। আমার কোল তো পেতেই রেখেছি, বৎস, তোমার জন্যে।

দেবী অন্তর্হিতা হলেন।

রাজার অন্তরে নিমেষে জাগলো তীব্র আলোড়ন।

সম্মুখে প্রসারিত মাতৃক্রোড়—স্থির অচঞ্চল।

কিন্তু, কিন্তু তার আগে যে সব বোঝাপড়া, হিসাব নিকাশ চুকিয়ে আসতে হবে!

রাণী ভবানী তখন থাকেন মুর্শিদাবাদে বড়নগরে।

সেখানে আজই—এখনই যেতে হবে। যেতেই হবে।

না, বিলম্ব নয়। এক মুহূর্তও বিলম্ব নয়।

রাজার জীবনে এসে গেলো অলৌকিক ক্ষমতা।

মুহূর্তমধ্যে রাজার সিদ্ধদেহ পঞ্চমুণ্ডী আসন থেকে ঊর্ধ্বে উত্থিত হোলো। ধাবিত হোলো সবেগে বড়নগরের দিকে। ছুটে চললো।

রাজার অনুচর ভোলা তখনও সাধনস্থল পাহারা দিয়ে চলেছে।

ভোলা শুনতে পেলো।—রাজা তাকে বলছেন,—

ভাবিস্ নে, ভোলা। আমি মায়ের কাছে যাচ্ছি। ভাবিস্ নে।

রাজা আকাশমার্গে ছুটলেন।

ভোলা ঊর্ধ্বাকাশে চেয়ে রইলো। সে বিস্ময়ে হতবাক্!

এর পরে সংবাদ এলো।—

রাজার দেহ ঐদিন রাত্রে ভবানীপুর থেকে বহুদূরে পাকুড়িয়া অঞ্চলে এক সেতুর ধারে নিপতিত হয়। আঁধার রাতে এত অল্প সময়ে কী ক'রে এতদূরে রাজা এলেন, তা জেনে সবাই অবাক হ'য়ে গেলো।

এখানে নাটোরের গুরুবংশের লোকেরা বাস করেন। তাঁরা ছুটে এলেন সংবাদ পেয়ে। পাল্‌কী ক'রে রাজাকে নিয়ে গেলেন রাণী ভবানীর কাছে। মায়ে পোয়ে মিলন হোলো।

রাণীর মার্জনা পেলেন রামকৃষ্ণ। মিটে গেলো সব ভুল বোঝাবুঝি!

রাজার জীবনে এলো নব রূপান্তর।

এই আসে—এই আসে পরমপ্রাপ্তির মহা-লগ্ন! এই আসে!

বড়নগরের গঙ্গাতীরে তিনরাত্রি বাস করবার পর রাজা শেষবারের মতো দর্শন লাভ করলেন জননী আগ্তাশক্তির।

মা এলে! আমায় নিতে এলে, মা!

মা, মাগো!

মহালগ্ন এসে গিয়েছে।

রাজার আননে পরমপ্রাপ্তির চরম প্রশান্তি। পেয়েছেন মায়ের দর্শন। এখনই তো পাতবেন মায়ের কোলে গিয়ে শাশ্বত আসন।

মা কথা দিয়েছেন!

রাজা গাইতে লাগলেন।—

আমার মন যদি যায় ভুলে।
তবে বালির শয্যায় কালীর নাম দিও কর্ণমূলে॥
এ দেহ আপনার নয়রে, সদা রিপু সঙ্গে চলে।
তবে আনরে ভোলা জপের মালা, (দেহ) ভাসাই গঙ্গাজলে॥

উত্তর সাধক ভোলা রাজার কর্ণমূলে মাতৃনামের সুধা সিঞ্চন করতে লাগলো। মা, মা, মা!

রাজা ইষ্ট নাম জপ ক'রে চলেছেন। মা, মা, মা!

সবাই দেখলেন, জপ করতে করতে রাজার ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ হ'য়ে গেলো।

১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দের কথা এ।

বাবাজী জয়কৃষ্ণদাস

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে পশ্চিমবঙ্গের এক বৈষ্ণব পরিবারে জয়কৃষ্ণদাসের জন্ম হয়েছিল।

ছেলে বয়স থেকেই জয়কৃষ্ণদাসের জীবনে দেখা দিলো ধর্মভাব।

বয়স বাড়তে লাগলো, ধর্মভাব প্রবলতর হ'তে থাকলো, বিকশিত হ'তে লাগলো নানা সদ্‌গুণ।

বৈষ্ণবের ঘরে জন্ম। তাই বৈষ্ণবীয় আচার অনুষ্ঠান পরম নিষ্ঠার সঙ্গেই পালন ক'রে চলেন। সহজাত বৈরাগ্যভাব তো পেয়েছেন-ই।

এক শুভদিনে তিনি সংসার ছেড়ে বৃন্দাবনের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন।

জয়কৃষ্ণদাস বৃন্দাবনে এলেন। বহু পুণ্যফলে অনতিকাল মধ্যেই সদ্‌গুরু লাভ হোলো।

গুরুদেবের নির্দেশিত পথেই জয়কৃষ্ণদাস চলতে লাগলেন।

গুরুদেব জয়কৃষ্ণদাসকে একদা বলেছিলেন,—

প্রেমসাধনা ক'রে, বৎস, যদি অভীষ্ট লাভ করতে চাও, যদি রাগানুগা ভজনের পরমপ্রাপ্তির বাসনা থাকে, তবে দেহমনকে আগে থেকেই বৈরাগ্যের অনলে দগ্ধ ক'রে নিতে হবে। শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামীর আদর্শ-ই অনুসরণ ক'রে চলবে। ক'রে চলবে তাঁকে আদর্শ ক'রেই কৃচ্ছ্রসাধন। এক বৃক্ষতলে একরাত্রির বেশী তিনি কাটান নি। আহার বলতে ছিল শুক্‌নো আঙাকড়ি। আর, আলুনি বুনো শাক। এ আদর্শ থেকে বিচ্যুত হবে না। আরও একটা নির্দেশ দিই, বৎস। সেটি পালন ক'রো। একাদিক্রমে বারো বছর কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন করবে। তারপর কাম্যবনে গিয়ে ধ্যান করবে। বৎস, কাম্যবন বড় পবিত্র স্থান। বহু সিদ্ধ তপস্বীর তপস্যায় পবিত্র হয়েছে এই

দেবতাবাঞ্ছিত কাম্যবন। মনে রেখো, এখানেই তোমার অভীষ্ট লাভ হবে। তোমার পরমপ্রাপ্তি ঘটবে।

গুরুদেবের বাক্য বাবাজী অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন। পালন করেছেন তাঁর সকল আদেশ। মেনেছেন সকল নির্দেশ।

কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনের পর বাবাজী এসেছেন কাম্যবনে। নিমগ্ন রয়েছেন গভীর ধ্যানে।

দিন রাত্রির ভেদাভেদ নেই। শীত গ্রীষ্মের বোধ নাই। আহার নিদ্রার বালাই নেই। দিনরাত সাধনা ক'রেই চলেছেন।

কাম্যবনের নির্জন গহন-অঞ্চলে বাবাজী সাধনা করেন। গভীর সাধনা। আহার নেই, নিদ্রা নেই। নেই বাহ্যজ্ঞান। কথা কইতেও কষ্ট হয়। শরীর বুঝি আর থাকে না।

এমন অবস্থার মধ্যে একদিন এক কিশোরী এলেন—ব্রজমায়ী। হাতে তাঁর একটি পাত্র। পাত্রে দুধ।

বাবাজী, না খেয়ে মরবে ঠিক করেছো? এ কী কাণ্ড! কিছু দুধ এনেছি খাও তো। বাবাজী, ও বাবাজী, আমার কথা শুনছো?

ধ্যান ভাঙ্গে না বাবাজীর।

বাবাজী, ও বাবাজী! শোনো—

না। তবু ধ্যান ভাঙ্গে না।

বাবাজী, ও বাবাজী!—শুরু হোলো চেঁচামেচি।

এতক্ষণে ধ্যান ভাঙ্গলো। তাকালেন ব্রজমায়ীর দিকে।

এই সুযোগে সেই কিশোরী বাবাজীর মুখে পাত্রের দুধ ঢেলে দিলেন।

হিঃ হিঃ হিঃ হিঃ। খিল খিল ক'রে কিশোরী হেসে ফেললেন।

কেঁদে ফেললেন বাবাজী।

—মায়ী, তুমি এ কী করলে! আমি যে এতক্ষণ দুর্লভ লীলা দর্শন করছিলাম! তুমি আমার এই তুচ্ছ শরীরটাকে বাঁচিয়ে

রাখবার জন্যে তা থেকে আমায় বঞ্চিত করলে! তাতে ছেদ টেনে দিলে! এ তুমি-কী করলে!

বাবাজীর চোখের জল থামে না।

শোন বাবাজী, প্যারীজী বলেছেন, কোনও বৈষ্ণব এই কাম্যবনে এসে উপোসী থেকে যেন দেহ-পাত না করে। শ্রীমতীর হুকুম তো আমায় মানতে হবে। আরে বাবাজী, শরীরটাকে তো আগে জীইয়ে রাখো। শরীর-ই যদি না রইলো, তবে ভজন-সিদ্ধির পরম মধুর রস ধারণ করবে কোথায়? বাঁচিয়ে রাখো, বাঁচিয়ে রাখো এই দেহটাকে। শোন, তুমি ভেবো না। আর, এত কষ্ট-ও কোরো না। রাধাকৃষ্ণের নিত্যলীলা তুমি জীবন-ভর দর্শন করবে। তোমার মনস্কামনা অচিরে পূর্ণ হবে।

ভুবন-ভোলানো হাসি হেসে চ'লে গেলেন ব্রজমায়ী।

কে ইনি? ইনি নিশ্চয়-ই মানবী নন। মানুষের তো এত রূপ হয় না! তার কণ্ঠে তো এত মধু থাকে না! দেহে তো থাকে না এত বিভা, এত দ্যুতি? কোনও মানুষকে দেখে তো মনে এত নাড়া লাগে না, আসে না এত আনন্দ! তবে? তবে?—ভাবতেই লাগলেন বাবাজী। কে ইনি? কে ইনি?

কিছুক্ষণের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়লেন।

রাত্রে বাবাজী স্বপ্ন দেখলেন।

আকাশ দিব্য জ্যোতিতে পরিপূর্ণ হ'য়ে গিয়েছে। আলোয় আলোময়।

তার পর সেই জ্যোতির্মণ্ডলে ধীরে ধীরে দেখা দিলেন এক দিব্য নারী!

তিনি তাকালেন তাঁর দিকে। মধুর সেই দৃষ্টিতে অন্তর শান্তিতে ভ'রে উঠলো। তারপর?

তারপর তিনি স্নেহমধুর হাসি হাসতে লাগলেন। হাসির লহরীতে দিঙ্মণ্ডল আনন্দে ভাসতে লাগলো।

হাসতে হাসতে তিনি বললেন,

বাবাজী, আমায় তখন চিনতে পারো নি। আমি বৃন্দা। যে কথা ব্রজমায়ীর মূর্তি ধ'রে ব'লে এসেছি, তা সত্য হবে-ই। দ্বিধা মনে রেখো না। মধুর ভজনের যে সাধনায় ব্রতী হয়েছো, তা অচিরে সফল হবে। গুরুদেবের আদেশে তুমি খুবই কৃচ্ছ্রসাধন করলে। কাম্যবনে এসে এখন পৌঁছেছো তোমার সাধনার অন্তিম লগ্নে। শীঘ্রই তুমি শ্রীমতী রাধারাণীর কৃপালাভ করবে। কঠোরতার আর প্রয়োজন নেই।

বৃন্দাদেবী অন্তর্হিতা হলেন।

অচিরে জয়কৃষ্ণদাস বাবাজী আপ্তকাম হলেন। রাগানুগা ভজনে সিদ্ধ হলেন।

তখন কাম্যবনের বিচেল্লীবাস নামে এক নির্জন স্থানে তিনি ভজন সাধন করছেন।

এমন সময়ে একদিন ঢাকা থেকে নিত্যানন্দ বংশের এক ভক্ত বৈষ্ণব তাঁর কাছে এলেন। নাম নবকিশোর গোস্বামী। নবকিশোর সঙ্গে নিয়ে এসেছেন তাঁর নিত্য-উপাস্য শ্রীরাধামদনমোহন বিগ্রহ।

কয়েকদিন নবকিশোর রইলেন বাবাজীর কাছে। বাবাজী রাধামদনমোহনকে দেখে বড় আনন্দ পেলেন। সাধনভজনের পর যখনই অবসর মেলে, এসে বসেন রাধামদনমোহনের কাছে। তাঁকে দেখেন। প্রাণ ভ'রে দেখেন। ভাবে অভিভূত হয়ে পড়েন। দুই চোখ দিয়ে জল নামে। শেষে লুটিয়ে পড়েন বিগ্রহের সামনে। ঠাকুর, ওগো ঠাকুর!······

কিছুদিন কেটে গেলো।

নবকিশোর দেশে ফিরে যাবার উদ্যোগ করছেন। এমন সময়ে রাধামদনমোহন স্বপ্নে নবকিশোরকে বললেন,—

নবকিশোর, তোমার এতদিনকার সেবা-পরিচর্যায় আমি পরম

সন্তুষ্ট হয়েছি। কিন্তু আমার যে তোমার সঙ্গে যেতে আর ইচ্ছে করছে না। আমার ইচ্ছে হয়েছে, আমি এখন থেকে আমার সাধের বৃন্দাবনে থেকেই জয়কৃষ্ণদাসের সেবা গ্রহণ করি। তুমি দুঃখ ক'রো না, নবকিশোর।

প্রভু, এতদিন আমি যথাসাধ্য তোমার সেবা ক'রে এসেছি। তুমি আমার সেবায় সুখী হয়েছো, এর চেয়ে আনন্দের কথা আমার আর কিছুই নেই। এ আমার মহা সৌভাগ্য। এখন থেকে তুমি জয়কৃষ্ণদাস বাবাজীর কাছে থাকতে চাইছো, তাতে তোমার সুখ হবে বলছো, এ-তে আমি কেন দুঃখ পাবো? তোমার সুখেই যে আমার সুখ, প্রভু! না, না প্রভু, আমি এতে একটুও দুঃখ পাবো না। তবে একটা কৌতূহল জন্মেছে। তা আমায় কিছুটা চিন্তিতও ক'রে তুলছে। প্রভু, এই নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণব বাবাজী কি ক'রে তোমার সেবা চালিয়ে যাবেন?

জয়কৃষ্ণদাস পরম নিষ্ঠার সঙ্গে এই কাম্যবনে এতকাল আমাকে তপস্যা ক'রে চলেছে। তার সেবায় আমার কি কোনও কষ্ট হ'তে পারে, নবকিশোর? তা ছাড়া, এখানকার ব্রজবালারাও আমায় দেখা শোনা করবে। তোমাকে একটা গুহ্য কথা বলি, নবকিশোর। যেভাবে কঠোর তপস্যা ক'রে চলেছে জয়কৃষ্ণদাস, আমার সেবা-পূজা নিয়ে না থাকলে তার দেহ-ই থাকবে না। তাকে দিয়ে যে আমার অনেক কাজ করাতে হবে। তুমি আশ্বস্ত হও। এখানে আমার কোনও কষ্ট হবে না।

জয়কৃষ্ণদাস বিগ্রহ পেলেন। তাঁর আনন্দ ধরে না। পরদিনই ঠাকুরের জন্যে ঝুপড়ি তৈরী করলেন। বন্ধনহীন বাবাজীর জীবনে এলো ইষ্ট সেবা ও জনকল্যাণের ব্রত। ধীরে ধীরে বাবাজীকে কেন্দ্র ক'রে গড়ে উঠলো রাগানুগা ভজনের এক বৈষ্ণবগোষ্ঠী।

দিন যায়।

একদিন এক তরুণ বৈষ্ণব এলেন জয়কৃষ্ণদাস বাবাজীর কুটিরে। তাঁর সাধ, সিদ্ধ বাবাজীর সেবা ক'রে জীবন ধন্য করবেন।

বাবাজী ভাবলেন, ভালো হোলো। প্রভু-ই সুযোগ মিলিয়ে দিলেন। শ্রীরাধামদনমোহনের সেবা করবার লোক এসে গেলো।

এই তরুণ বৈষ্ণব মনেপ্রাণে শ্রীবিগ্রহ ও বাবাজী এই উভয়েরই সেবা ক'রে চলেন।

বাবাজী বড় সন্তুষ্ট হলেন এঁর সেবানিষ্ঠা দেখে।

একদিন বাবাজী বললেন, বৎস, তুমি কৃষ্ণভজনের যোগ্য অধিকারী। তোমার এ দেহ শুদ্ধ-সত্ত্ব আধার। তোমায় আমি রাগাণুগা সাধনের পদ্ধতি শিক্ষা দেবো। কিন্তু তার আগে আমার তো জানতে হবে, তোমার গুরুপ্রণালী কি। তুমি কি তা জান?

না প্রভু, আমার গুরুদেবকে তো কখনও এ কথা জিজ্ঞাসা করিনি।

বৎস, সাধনার পথে পরম্পরা-ক্রমে গুরুদের ঐকান্তিক আনুগত্য স্বীকার করতে হয়। তাঁদের কৃপায় লাভ করা মন্ত্রের সাধন করতে হয়। তাঁরা যে পথ নির্দেশ ক'রে দিয়েছেন সেই পথেই সিদ্ধগোপীরূপা মঞ্জরী দেহে করতে হয় সেবা। এই হোলো রাগাণুগা ভজনের পথ। কালবিলম্ব না ক'রে তুমি দেশে যাও। দেখা করো তোমার গুরুদেবের সঙ্গে। তাঁর কাছ থেকে তোমার গুরুপ্রণালী নিয়ে এসো। তা না হ'লে শ্রীরাধামদনমোহনের প্রেম-সেবার যথার্থ অধিকারী তো হ'তে পারবে না, বৎস।

দুঃখের সঙ্গে তরুণ বৈষ্ণব রওনা হোলেন দেশের দিকে। হাথ্রাস্ স্টেশনে গিয়ে গাড়ী ধরতে হবে। হাথ্রাসের দিকেই চলতে লাগলেন। বাবাজীকে ছেড়ে যেতে তাঁর মন সরছিল না।

তিনি চলেছেন। যেতে যেতে রাধারাণী ও বৃন্দাদেবীকে কেঁদে কেঁদে মিনতি জানাতে লাগলেন,—গাড়ী হাথ্রাস্ স্টেশনে পৌছানোর আগেই আমার যেন জীবনের অবসান হয়।

স্টেশনে এসে তিনি শুনলেন, রেলগাড়ী ইতিমধ্যে এসে চ'লে গিয়েছে। তিনি ফিরে এলেন কাম্যবনে।

তিনি এলেন। ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর হ'য়ে পড়েছেন। এদিকে মনে আশঙ্কা, বাবাজী তাঁকে কুটির থেকে হয়ত তাড়িয়ে দেবেন। তাঁর আদেশ ঠিক ঠিক পালন করা হয়নি।

ভীত হ'য়ে পড়লেন।

কিন্তু এ কী! বাবাজী তাঁকে দেখেই বুকে জড়িয়ে ধরলেন! কাঁদতে লাগলেন! কাঁদতে কাঁদতেই তাঁকে আশীর্বাদ করলেন!

বাবাজী জানালেন, গত রাত্রে বৃন্দাদেবী স্বপ্নে তাঁকে কঠোর ভৎ'সনা করেছেন।

তুমি কেন ওকে নিষ্ঠুরভাবে অত দূরে পাঠিয়েছো? ওর গুরু-প্রণালী তো রাধামদনমোহন বিগ্রহের সিংহাসনের নীচেই রয়েছে। ওখানে গ্যাখো। পাবে।

বাবাজী ছুটে গেলেন।

হ্যাঁ, সিংহাসনের নীচে-ই তো রয়েছে ওর গুরুপ্রণালী!

বাবাজী কেঁদে ফেললেন।

কৃপাময়ী, এতই যদি তোমার করুণা, তবে আমার সেবককে দ্রুত ফিরিয়ে আনো।

সেবক ফিরে এসেছেন! তাই বাবাজীর আনন্দ।

এই ঘটনার পর থেকে সবাই বুঝতে পারলো জয়কৃষ্ণদাস বাবাজী একজন সিদ্ধ মহাপুরুষ।

দিন যায়।

জয়কৃষ্ণদাস সাধনা ক'রেই চলেছেন।

এমন সময়ে একদিন এলেন কৃষ্ণদাস। তিনি এলেন রাজস্থানের জয়পুর হ'তে। সেখানে গোবিন্দজীর মহাপ্রসাদ খাবার পর থেকে তিনি কামাক্রান্ত হ'য়ে পড়েন। ব্যাকুল হ'য়ে তাই এসেছেন

বাবাজীর কাছে। তাঁর আশ্রয় চাইলেন। পরিত্রাণের উপায় জানতে চাইলেন।

বাবাজী কৃষ্ণদাসকে আশ্রয় দিলেন। আশ্বাস দিলেন। দিলেন উপদেশ। নির্দেশ দিলেন কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন করবার।

তিনি বললেন, বৎস গাছ কেটে কূপের মধ্যে ফেলে রেখে দেবার পর তাতে যদি আগুন ধরাতে চাও, আগুন ধরবে? গাছটিকে যে শুকিয়ে নিতে হয়। তেমনি, জীব জন্মাবধি বিষয়-কূপে তলিয়ে থাকে। বিষয়-মোহ ত্যাগ করিয়ে জীবনকে তো বৈরাগ্যের তাপে শুকিয়ে নিতে হবে। তবেই তাতে ভক্তির আগুন জ্বলবে। কৃচ্ছ্রসাধন, কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন ছাড়া তো এটা সম্ভব নয়। দাস গোস্বামীর কথা স্মরণ করো। স্মরণ করো শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামীর কথা। সেইভাবেই জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করো, পরিচালিত করো।

কৃষ্ণদাস চললেন বাবাজীর নির্দেশিত পথে বেশ কিছুকাল। হলেন সিদ্ধ।

বৈষ্ণব সাধু মোহান্তরা বাবাজীর কাছে এসে রাগাণুগা সাধনের নির্দেশ চাইতেন। তাঁর কাছে প্রেমতত্ত্বের ব্যাখ্যান শুনতে চাইতেন। ব্যাখ্যান শুরু হ'লে বাবাজীর শুধু গাত্ররোম নয়, মাথার সকল চুল প্রেমবিকারে সজারুর কাঁটার মতো খাড়া হ'য়ে উঠতো।

সেবার এক বিশেষ উৎসব হচ্ছে বাবাজীর কুটিরে। বহু সাধু মোহান্ত এসেছেন। নাম-কীর্তন চলছে অবিরাম। হঠাৎ বাবাজী দিব্যভাবে উদ্দীপিত হ'য়ে পড়লেন।

প্রেম-প্রমত্ত হ'য়ে হুঙ্কার ক'রে উঠলেন। কুটিরের ছপ্পরটি সেই প্রবল হুঙ্কারে সশব্দে বিদীর্ণ হ'য়ে গেলো।

একদিন বাবাজী অন্তরঙ্গ সেবা ও লীলা আস্বাদনে বিভোর হ'য়ে আছেন। হঠাৎ কোথা থেকে একদল গোপবালক তাঁর কুটিরে এসে চীৎকার শুরু ক'রে দিলো।

বালকরা এইরকম উপদ্রব তো ক'রেই থাকে। এখানেও করে বাবাজী আপন মনে সাধনা ক'রেই চললেন।

বালকরা চেঁচাতে লাগলো।—

বাবাজী, ও বাবাজী, বড় পিপাসা পেয়েছে। তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে। একটু জল দাও না।

বাবাজীর তখন অর্ধবাহ্য অবস্থা। তিনি মধুর লীলারস উপভোগ ক'রে চলেছেন। বালকদের কথা শুনতে পেলেন না।

বালকেরা চেঁচাতেই লাগলো।

ইয়ে বাবাজী, তুমি কেমন ভজন করছো? যার দয়ামায়া নেই তাকে তো সবাই কষাই বলে। তুমি কি কষাই? শীগ্‌গীর ভজনকুটির থেকে বেরিয়ে এসে ঠাণ্ডা জল দাও। আমাদের প্রাণ বাঁচাও।

না, আর কুটিরে থাকা যায় না। বেরিয়ে এলেন কুটির থেকে। দেখলেন,—

একদল গোপবালক দুষ্টুমী আর হুটোপুটি করছে। প্রতিটি বালকেরই কী দিব্য মধুর কান্তি!

বালকদের দেখেই বাবাজীর মন প্রসন্ন হোলো।

তোমরা কোথা থেকে এলে? থাকোই বা কোথায়? তোমাদের নাম কি কি?

একটি বালক এলো এগিয়ে। শ্যামল স্নিগ্ধ কান্তি। ভুবনমোহন রূপ।

আমার নাম? আমার নাম কান্‌হাইয়া। আর, এঁর নাম বলদেও।

বাবাজীকে কথা বলবার অবকাশই দিলো না।

আগে জল দিয়ে প্রাণ বাঁচাও তো। তার পর অন্য কথা।

মন্ত্রমুগ্ধের মত বাবাজী কুটিরে গেলেন। কড়ঙ্গ ভ'রে ঠাণ্ডা জল নিয়ে এলেন। সবাইকে জল ঢেলে দিলেন।

এতক্ষণে বালকেরা শান্ত হোলো। শান্ত হোলো কান্‌হাইয়া, বলদেও।

যাবার সময় কানহাইয়া বললো,

বাবাজী, তুমি ঘরের ভিতরে ব'সে থেকে চোখ বুজে মালা ঘুরাও। কোনও দিকে খেয়াল থাকে না। কোনও দিকে তাকাও না। এদিকে আমাদের যে হয় মহা মুশকিল। রোজ আমরা ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর হ'য়ে এখান থেকে চ'লে যাই। ছাখো, কাল থেকে রোজ ঠাণ্ডা জল আর কিছু খাবার আমাদের জন্তে রেখে দিতে ভুলো না। মনে থাকে যেন।

নাচতে নাচতে হাসতে হাসতে বালকেরা চ'লে গেলো।

এতক্ষণে বাবাজীর হুঁশ হোলো। দেখলেন তারা চ'লে গিয়েছে।

বাবাজী ধ্যানস্থ হ'য়ে পড়লেন।

ধ্যানে জানতে পারলেন, কৃষ্ণ বলরাম আর তাঁদের সখারা আজ এসেছিলেন। ছলনার সাহায্যে তাঁরা দর্শন দিয়ে গেলেন। কৃষ্ণ তাঁর সঙ্গে কথা কইলেন। তাঁর দেওয়া জল খেয়ে গেলেন।

বাবাজী মাটিতে প'ড়ে গড়াগড়ি দিতে লাগলেন। চোখের জলে বান ডাকলো।

অকস্মাৎ দৈববাণী হোলো।—

শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে বলছেন, জয়কৃষ্ণ মনে খেদ রেখো না। ধৈর্য ধরো। আগামী কাল তোমার কুটিরে উপস্থিত হবো।

পরদিন ভজন কুটিরে এক ব্রজমায়ী এলেন।

বাবাজী, এই বিগ্রহ তোমাকে দিতে এলাম।

আমি বৃদ্ধ, অশক্ত। প্রভুর সেবা আমা দ্বারা আর চলছে না। এবার থেকে তুমি-ই এর সেবার ভার নাও। তা ছাড়া, মায়ী, আরও এক কথা। প্রভুর উপযুক্ত সেবা করবো, সে সামর্থ্যও আমার নেই। গোপালের জন্তে দুধ চাই, ছানা চাই, ননী চাই। এ কাঙাল তা পাবে কোথায়?

সে জন্তে ভেবো না, বাবাজী। সেবার দ্রব্য সব আমি-ই জুগিয়ে যাবো।

রাত্রে স্বপ্নে জানলেন, বিগ্রহ নিয়ে যিনি এসেছিলেন, তিনি বৃন্দাদেবী।

হ্যাঁ। ঠিকই তো বিগ্রহরূপে প্রভুই যে এসেছেন!

কেটে গেলো দীর্ঘকাল।

নিত্য লীলায় প্রবেশের মহালগ্ন এসে পড়লো।

সবাই এসেছেন।

বাবাজীর সারা দেহ অলৌকিক আনন্দের আবেশে কাঁপছে থর থর ক'রে। একে একে দেখা দিচ্ছে অষ্ট সাত্তিক বিকার।

সবাই বিস্মিত!

বাবাজী মাঝে মাঝে বলছেন,

ওগো, আমার ঘাঘরী কোথায়? ওড়না কোথায়? কোথায় আমার কাঁচুলি?

হাত যেন নড়ে ওঠে এসবের সন্ধানে।

সবারই চোখে জল।

সবাই বুঝতে পারলেন, রাগাণুগা ভজনের মহান সাধক, সমগ্র ব্রজমণ্ডলের মহান পুরুষ আজ খুঁজে পেয়েছেন তাঁর পরিণতি।

প্রিয় মিলনের লগ্ন।

অভিসার প্রস্তুতির কথা কইছেন বারবার। চোখ দিয়ে জল ঝরছে অনিবার।

বাবাজী চ'লে গেলেন পরম অভিসারের পথেই।

প্রেমাস্পদের সঙ্গে চিরমিলন হোলো।

কাম্যবনে বিমলা-কুণ্ডতীরে সিদ্ধ শ্রীশ্রীজয়কৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজের সমাধি আছে।

শিবরামকিঙ্কর যোগত্রয়ানন্দ

সুবিখ্যাত গ্রন্থ আর্যশাস্ত্রপ্রদীপের নাম আমরা অনেকেই জানিনে। এটা আমাদের লজ্জার কথা, দুর্ভাগ্যের কথা।

এই মহান গ্রন্থখানি লিখেছেন শিবরামকিঙ্কর যোগত্রয়ানন্দ।

আর্যশাস্ত্রপ্রদীপ ও এর লেখক সম্বন্ধে সাহিত্যিক সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় একদা বলেছিলেন—

পড়িয়া যাহা বুঝিলাম তাহাতে বলিতে পারি. এতগুলি বিষয় সম্বন্ধে কোনও একজনে গ্রন্থ লিখিতে পারেন, ইহা আমার ধারণাই ছিল না। এইরূপ একটা প্রয়াসও করিতে পারেন, এমন পুরুষ আমি বর্তমান কালে কল্পনা করিতে পারি না। যদি ইহা সত্য হয়, তাহা হইলে বলিব, এইরূপ অসাধারণ মস্তিষ্কসম্পন্ন ব্যক্তি আমি কখনও দেখি নাই।

তবে একটা কথা ইহাই বলি, লেখক গ্রন্থখানি ইংরেজীতেই লিখুন। তাহা হইলে উহার সমুচিত সমাদর হইবে। এদেশে এই গ্রন্থের মর্ম গ্রহণ করিবার লোকের সংখ্যা নিতান্তই অল্প। বাঙলা ভাষায় গ্রন্থ প্রকাশ করিলে ইহার যথোচিত পূজা হইবে না। ফলে লেখকের গ্রন্থ লিখিবার প্রবৃত্তি কমিয়া যাইবে। আর এক কথা। ইংরেজীতে গ্রন্থ প্রকাশ করিলে শীঘ্রই ইহার প্রচার হইবে এবং জাগতিক দৃষ্টিতে লেখকের কিছু সুবিধা হইতে পারিবে।

আর্যশাস্ত্রপ্রদীপের প্রথম খণ্ড পাঠ ক'রেই কলকাতা হাইকোর্টের অস্থায়ী প্রধান বিচারপতি স্যার রমেশ চন্দ্র মিত্র বলেছিলেন—

আমার জীবনের পরম আকাঙ্ক্ষা, আমি যেন আর্যশাস্ত্রপ্রদীপ বইখানি সমাপ্ত হয়েছে দেখে যেতে পাই। আর, তার পূর্বেই যদি আমার মৃত্যু ঘটে, তবে সেটা আমার জীবনের চরমতম দুর্ভাগ্য ব'লে মনে করবো।

বর্তমান কালের অসামান্য প্রতিভাধর পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় ডঃ গোপীনাথ কবিরাজ বলেছেন—

শিবরামকিঙ্কর যোগত্রয়ানন্দজী বহু গ্রন্থ লিখেছিলেন। কিন্তু তাঁর সর্বপ্রথম ও প্রধান গ্রন্থ হোলো আর্যশাস্ত্রপ্রদীপ। এই মহাগ্রন্থ সম্পূর্ণ প্রকাশিত হ'লে পৃথিবীর অশেষ কল্যাণ হোতো সন্দেহ নেই। এর ভূমিকায় যে অংশটুকু প্রকাশিত হয়েছে, তা-ও অতি বিশাল ও অপূর্ব।

এই মহান গ্রন্থে এমন অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও বহু-দর্শিতার নিদর্শন ছিল, যা দেখে সেকালে আমার মন স্তব্ধ হ য়ে গিয়েছিল এবং নীরবে মহাজ্ঞানী ঋষিকল্প গ্রন্থকারের চরণে পুনঃ পুনঃ প্রণতি জ্ঞাপন করেছিলাম। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য, প্রাচীন ও নবীন দর্শন, বিজ্ঞান, সকল শাস্ত্রেরই পূর্ণ জ্ঞানের পরিচয় এই গ্রন্থে পেয়ে আমার একান্ত ইচ্ছা হোলো, এঁকে দর্শন করবো, আর এঁর চরণে ব'সে জ্ঞানের অনুশীলন করবো। বইখানি প'ড়ে মনে হয়েছিল যে লেখক কর্ম, ভক্তি, জ্ঞান প্রভৃতি সকল মার্গেই সমরূপ অধিকারী। তিনি ঋষিকল্প এবং বিজ্ঞান-মদগর্বিত বর্তমান ইংরেজী-শিক্ষিত সমাজের গুরু-স্বরূপ।

এই শিবরাম যোগত্রয়ানন্দ কে? এই মহাত্মার প্রকৃত পরিচয় কি?

শিবরামকিঙ্কর যোগত্রয়ানন্দের প্রকৃত নাম শশিভূষণ সান্যাল। এঁর পিতার নাম রামজীবন সান্যাল। এঁদের পৈতৃক নিবাস হাওড়া জেলার বালীতে।

শশিভূষণের জন্ম হয় ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে।

পঞ্চম বর্ষে বালকের বিদ্যারম্ভ হোলো। বালক কিন্তু লেখাপড়ায় এত উদাসীন যে, আট বছর বয়স অবধি সামান্য বর্ণ-পরিচয়েও সে সক্ষম হয় নি। লেখাপড়ায় চরম অবহেলা দেখে বাবা একদিন শশিভূষণকে নিদারুণ তিরস্কার করেছিলেন। কিন্তু বালক যেন এ জগতের কেউ নয়।

রামজীবনের বড় ভাই কালীনাথ। সরল নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। সাধন ভজন, পূজা অর্চনা, ঠাকুর সেবা, এই সব নিয়েই থাকেন। যোগীরাজ শিবরামানন্দ স্বামীর প্রিয় শিষ্য ছিলেন কালীনাথ।

নয় বছর বয়সে শশিভূষণের উপনয়ন হোলো। উপনয়নের পর থেকেই শশিভূষণ উৎকট মূর্ছারোগে আক্রান্ত হ'য়ে পড়লেন।

এই সময়ে শিবরামানন্দ স্বামী মাঝে মাঝে বালীতে এসে থাকতেন।

শশিভূষণের যখন দশ বছর বয়স তখন গুরু শিবরামানন্দ স্বামী একবার বালী এলেন। কিছুকাল রইলেন কালীনাথের এক প্রতিবেশীর গৃহে।

একদিন কালীনাথ শশিভূষণকে নিয়ে এলেন গুরুদেবের কাছে। তাঁকে জানালেন ভাইপোর অসুখের কথা।

গুরুদেব সস্নেহে শশিভূষণকে কাছে ডেকে আনলেন। কিছুক্ষণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন তার দিকে। তারপর ধীরে ধীরে তার মেরুদণ্ডে হাত বুলোতে লাগলেন।

শশিভূষণ সম্বিৎ হারিয়ে ভূমিতে লুটিয়ে পড়লেন।

গুরুদেব বললেন, ভয় নেই। ওকে কিছুক্ষণ নিশ্চিন্তে শুইয়ে রাখো। খানিকক্ষণ ও বিশ্রাম করুক।

এরপর গুরুদেব কেনোপনিষদের একটি শ্লোকের ব্যাখ্যা ক'রে ভক্তদের বুঝিয়ে দিতে লাগলেন।

ব্যাখ্যা শেষ হোলো।

গুরুদেব বললেন, এইবার তোমরা শশীকে আমার কাছে নিয়ে এসো। ওর বাহ্যজ্ঞান এতক্ষণে ফিরে এসেছে।

শশীকে গুরুদেবের সামনে আনা হোলো।

গুরুদেব শশীকে জিজ্ঞাসা করলেন, শশী, বলো তো, এতক্ষণ এখানে বসে সবাইকে আমি কি বুঝোচ্ছিলাম।

শশী সোজা হ'য়ে বসলেন। চোখে মুখে তাঁর প্রতিভার দীপ্তি।

ধীরে ধীরে তিনি যোগীরাজের কেনোপনিষদের দুরূহ শ্লোকের ব্যাখ্যার সারমর্ম বিবৃত করলেন।

সমাগত সবাই বিস্ময়ে হতবাক্ হ'য়ে পড়লেন।

এও সম্ভব!

গুরুদেব কালীনাথকে বললেন, বাবা, শশীর রোগ সেরে গিয়েছে। আর কোনও ভয় নেই। মূর্ছা রোগে সে আক্রান্ত হোতো না। আসলে এটা ছিল শশীর পূর্বজন্মের সংস্কারগত একটা ধ্যানাবেশ। ভুলে এতদিন তা চাপা প'ড়ে ছিলো। আজ তা অপসারিত হোলো।

শশীকে দেখে যোগীরাজ খুবই পুলকিত। নিজে আগ্রহী হ'য়ে পরদিনই তাকে দীক্ষা দিলেন।

গুরুদেবের কৃপায় অল্পবয়সেই শশিভূষণের জীবনে অমানুষী মেধা ও প্রতিভার বিকাশ ঘটলো। দিন দিন দ্রুতগতিতে তা বৃদ্ধি পেতে লাগলো।

গুরুদেব শশীকে ডাকতেন 'পণ্ডিত' বলে।

কখনও কোনও বিদ্যালয়ে পড়েননি। কোনও শিক্ষক বা পণ্ডিতের সাহায্য গ্রহণ করেন নি। গুরুদেবের কৃপাবলে অল্পকাল মধ্যেই শশী উচ্চশ্রেণীর ছাত্রদের পড়াতে সক্ষম হলেন।

বন্ধু বলতে কেউ ছিলো না। নির্জন স্থান তিনি ভালবাসেন। পুঁথিপত্র আর কুলদেবতাই তাঁর সঙ্গী। নিত্য তিনি গুরুদেবের আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেন। ছেলে বয়স থেকেই ছিল তাঁর শাস্ত্রে গভীর অনুরাগ ও দৃঢ় ভক্তি। কেউ শাস্ত্র আলোচনা করলে তিনি মন দিয়ে তা শুনতেন ও স্মরণে রাখতেন।

যে দেখে, যে শোনে, সেই-ই বিস্মিত হ'য়ে পড়ে।

শঙ্করাচার্য আবার জন্ম নিলেন নাকি!

গুরুদেব শিবরামানন্দ স্বামী স্বেচ্ছায় দেহত্যাগ করছেন।

ব্যাকুল হ'য়ে ছুটে এলেন শশিভূষণ। লুটিয়ে পড়লেন গুরুদেবের দুই পায়ে। কাঁদতে লাগলেন।

গুরুদেব আশ্বস্ত করলেন শশিভূষণকে।

তোমার ভবিষ্যতের জন্যে ভেবো না, বৎস। সে ভাবনা আমার। আমার আশীর্বাদে তোমার সাধন-সত্তায় সকল তত্ত্ব স্বতই স্ফুরিত হ'য়ে উঠবে। আয়ত্তে আসবে শাস্ত্রজ্ঞান ও যোগসিদ্ধি অনায়াসে।

কাশীনাথকে উদ্দেশ্য ক'রে যোগীরাজ বললেন,

বাবা, শশিভূষণের সম্বন্ধে আমি ভবিষ্যদ্বাণী ক'রে গেলাম। সে একজন মহাসাধক হবে। সে একজন শাস্ত্রবিদ অদ্বিতীয় পণ্ডিত হবে। অসামান্য প্রতিভা ও যোগসিদ্ধির অধিকারী হবে সে। বেদ ও অপরাপর শাস্ত্রধৃত বুদ্ধিতে সে পারঙ্গম হবে। তার চরিত্রে ও পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হ'য়ে দেশের লোক তাকে অশেষ সম্মান করবে। চারিদিক থেকে জ্ঞানপিপাসুরা একে একে আসবে তার কাছে জ্ঞান লাভের জন্যে। সে হবে একজন মহা-আচার্য।

গুরুদেব দেহ রক্ষা করলেন।

তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী দেহ সম্পুটে ভ'রে গঙ্গায় বিসর্জন দেওয়া হোলো।

এইদিন থেকে শশিভূষণ নিজের পরিচয় দিতে লাগলেন শিবরাম-কিঙ্কর নামে। কর্ম, ভক্তি ও জ্ঞান এই তিন মার্গেই তাঁর প্রভূত অধিকার। তাই পরে শিষ্য ও অনুগামী ভক্তজনেরা এঁকে অভিহিত করতে লাগলেন শিবরামকিঙ্কর যোগত্রয়ানন্দ নামে। পুরো নাম হোলো তাই শিবরামকিঙ্কর যোগত্রয়ানন্দ।

দিন কাটতে লাগলো।

বালক এখন পড়েছে কৈশোরে। অসাধারণ শ্রুতিধর তিনি। তিনি পরম মেধাবী। যে কোনও বই একবার মাত্র পড়লেই আয়ত্ত এসে যায়। শশিভূষণের মুখ থেকে যে কোনও বই-এর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ যিনিই শোনেন তিনিই বিস্মিত হন, মুগ্ধ হন।

বয়স বাড়তে লাগলো। শাস্ত্রজ্ঞানের পিপাসা ও সাধননিষ্ঠা তীব্রতর হ'তে লাগলো। বেদ, পুরাণ, স্মৃতি, উপনিষদ এইসব

শাস্ত্রগ্রন্থ আর মুগ্ধবোধ, পাণিনি, সাংখ্য, পাতঞ্জল, জ্যোতিষ এইসব বিষয়ই তিনি পড়তে লাগলেন।

সহসা শশিভূষণের সঙ্গীত শাস্ত্র শিক্ষা করবার প্রবল ইচ্ছা হোলো। অল্পকালের মধ্যেই তিনি সঙ্গীত শাস্ত্র আয়ত্ত ক'রে ফেললেন। শশী ভালো গাইতে পারতেন। এদিকে এসরাজ, সেতার, পাখোয়াজ ভালো বাজাতেও পারতেন। পরে সাধনভজনে ও পড়াশুনায় বাধা জন্মে এই আশঙ্কায় সঙ্গীতচর্চা ত্যাগ করলেন।

আর্থিক অবস্থা সচ্ছল নয়। সংসার চালাতে হবে। কিছু অর্থাগমের প্রয়োজন। জনকল্যাণও হয় এমন কিছু করতে হবে। তাই শশিভূষণ আয়ুর্বেদ শিখতে শুরু করলেন। তিনি কবিরাজী করবেন। এ সম্বন্ধে তাঁর হৃদয়ে একটা ক্ষতও ছিলো।

শৈশবে শশী একবার রোগাক্রান্ত হন। কবিরাজী চিকিৎসাই চলছিল। একবার ওষুধের দরুণ আট টাকা বাকী পড়ে। কবিরাজ কিছুতেই আর ধারে ওষুধ দিতে চাইলেন না। ফলে চিকিৎসা বন্ধ হ'য়ে যায়। দৈবানুগ্রহে বিনা চিকিৎসায়-ই শশী রোগমুক্ত হলেন। তাই শৈশবেই শশী সঙ্কল্প করেছিলেন, চিকিৎসক হবেন। দরিদ্রদের চিকিৎসায় নিজেকে নিয়োজিত রাখবেন। শুধু চিকিৎসা নয়, তাদের সেবায়। শশী কবিরাজ-ই হলেন।

আয়ুর্বেদ শিক্ষার পর তাঁর ইচ্ছা হোলো ইংরেজী শিখবেন। অতি অল্পদিনের মধ্যেই খ্যাতনামা লেখকদের বিখ্যাত বিখ্যাত বইগুলি সব প'ড়ে ফেললেন। পড়লেন সম্পূর্ণ বাইবেল।

শুধু তাই নয়। শশিভূষণ বিশুদ্ধভাবে ইংরেজী লিখতে বলতে ও ইংরেজীতে বক্তৃতা দিতেও পারতেন।

বাল্যকাল থেকেই শশীর জীবনে দেখা যায় বৈরাগ্যভাব। তাই মা ব্যাকুল হ'য়ে মাত্র তেরো বছর বয়সে শশীভূষণের বিবাহ দিয়েছিলেন। শশী ছিলেন খুবই মাতৃভক্ত। মা-কে সাক্ষাৎ দেবতা জ্ঞানেই দেখে গিয়েছেন সারা জীবন।

আয়ুর্বেদ চিকিৎসক হয়েছেন। অচিরেই চিকিৎসক হিসাবে সুনাম হোলো।

দিনে চিকিৎসা বিদ্যা নিয়ে থাকেন। রাত কাটান শাস্ত্রপাঠে, সাধনভজনে।

যোগত্রয়ানন্দজীর দিন এমনিভাবেই চলতে লাগলো।

এই সময়ে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে দেখতে, তাঁর সঙ্গ করতে যোগত্রয়ানন্দজী প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে যেতেন। ঠাকুর যোগত্রয়ানন্দজীকে পণ্ডিত ব'লে ডাকতেন। তাঁকে বিশেষ স্নেহ করতেন। একদিন ঠাকুর ভক্তদের নিয়ে যোগত্রয়ানন্দজীর বাসায় বালীতেও এসেছিলেন। সেখানে খাওয়া দাওয়াও করেছিলেন।

ঠাকুর যোগত্রয়ানন্দজীকে উপদেশ দিয়েছিলেন, দ্যাখো, চিকিৎসা ক'রে টাকা নিও। তবে সংসার চালাবার জন্যে যেটুকু মাত্র প্রয়োজন, তার বেশী কখনও নিও না।

একদিন যোগত্রয়ানন্দজী ঠাকুরের পা দুখানি নিজের বুকের উপর রাখলেন। বললেন, আশীর্বাদ করুন, জীবনে যেন শান্তি পাই।

ঠাকুর যোগত্রয়ানন্দজীকে কত ভালোবাসতেন তা একটা অলৌকিক ঘটনার মাধ্যমে জানা যায়।

যোগত্রয়ানন্দজীর বয়স তখন প্রায় আঠাশ। তিনি আছেন তাঁর বাবার কাছে সাগ্রামপুরে।

সে ১২৯৩ সালের ৩০শে শ্রাবণের কথা।

রাত্রি গভীর।

যোগত্রয়ানন্দজী স্বপ্ন দেখলেন।

ঠাকুর কাশীপুর উদ্যানবাটীতে দেহরক্ষা করছেন।

শেষবারের মত দেখবার আশায় শোকাকুল যোগত্রয়ানন্দজী বন্ধু শশিভূষণ ঘোষকে সঙ্গে নিয়ে দক্ষিণেশ্বর থেকে উদ্যানবাটীর দিকে যাত্রা করলেন।

যখন তাঁরা উদ্যানবাটীর সামনের ফটকের কাছে এসেছেন, তখন

দারোয়ান পথ আগ্‌লে দাঁড়ালো। তাঁদের ভিতরে ঢুকতে দিলো না। যোগত্রয়ানন্দজী অনেক কাকুতি মিনতি করলেন। দারোয়ান তাঁদের কোনও কথা শুনলো না।

হঠাৎ ঠাকুর সেখানে উপস্থিত হলেন। দারোয়ানকে বললেন, এদের ছেড়ে দে। এরা আমার আপনার জন।

ঠাকুর তাঁদের সঙ্গে নিয়ে বাড়ীর ভিতরে গেলেন।

বললেন, আমি আর এখানে থাকবো না। এবার দেহটাকে ছেড়ে দেবো।

ঠাকুরের মুখে এই কথা শুনে যোগত্রয়ানন্দজী কেঁদে ফেললেন।

ঠাকুর যোগত্রয়ানন্দজীকে আদর ক'রে বললেন, তুই আমার কাছে কিছু প্রার্থনা কর।

যোগত্রয়ানন্দজী ভাবে বিভোর হ'য়ে বললেন, আপনার শ্রীচরণে অচলা ভক্তি দান করুন। আর কিছু চাইনে। এই আমার একমাত্র প্রার্থনা।

বড় আনন্দ হোলো ঠাকুরের। তিনি যোগত্রয়ানন্দজীর মাথায় সস্নেহে হাত বুলিয়ে আশীর্বাদ করলেন।

যোগত্রয়ানন্দজীর ঘুম ভেঙ্গে গেলো। তিনি কাঁদতে লাগলেন।

১২৯৩ সালের ৩১শে শ্রাবণ ঠাকুর দেহরক্ষা করলেন।

এই সংবাদ পেয়ে যোগত্রয়ানন্দজী বড়ই ব্যথিত হলেন।

ঠাকুর যোগত্রয়ানন্দজীকে বিশেষ স্নেহ করতেন। তাই দেহরক্ষার সময় তাঁকে স্বপ্নে দর্শন দিয়ে ধন্য করলেন।

যোগত্রয়ানন্দজীর জীবনের মূল লক্ষ্য ছিল, ভারতের প্রাচীন ঋষিদের রচিত শাস্ত্রগ্রন্থের প্রকৃত মর্ম উদ্‌ঘাটন করা। ঋষিদের জ্ঞানবিজ্ঞানের সঠিক পথ অনুসরণ ক'রে, তত্ত্ব অনুধাবন ক'রে, ঋদ্ধি ও সিদ্ধিলাভ করা। তাইতো বেদান্ত, স্মৃতি, পুরাণ, আগম, জ্যোতির্বিদ্যা, সঙ্গীতশাস্ত্র, আয়ুর্বেদ শাস্ত্র প্রভৃতি সব শাস্ত্রই তিনি অধ্যয়ন করেছেন। কোনও কিছু অধ্যয়ন করতে বাকী রাখেন নি।

আয়ুর্বেদশাস্ত্র পড়তে গিয়ে তিনি একদিকে চরক, সুশ্রুত এইসব বিখ্যাত গ্রন্থগুলি পড়েছেন ; অন্যদিকে আবার অথর্ববেদের মন্ত্র ও অথর্ববেদে বর্ণিত ঔষধ ব্যবহার করতেও তাঁকে দেখা যেতো। বৈদিকমন্ত্র উচ্চারণ ক'রে তিনি অনেক দুরারোগ্য ব্যাধি নিরাময় করেছেন।

যোগত্রয়ানন্দজী চিকিৎসাকে জনকল্যাণ ও জনসেবা ব'লেই ধরতেন। যে কোনও বিপন্ন রোগী যে কোনও সময়ে তাঁর কাছে এসেছেন, তিনি তক্ষুনি তাঁর সঙ্গে দেখা করেছেন। যখনই কোনও রোগী তাঁকে তাঁর বাড়ী যেতে বলেছেন, কালবিলম্ব না ক'রে তক্ষুনি তাঁর বাড়ী গিয়ে তাঁর চিকিৎসায় নিযুক্ত হয়েছেন। এ-ও অথর্ব বেদেরই নির্দেশ।

যোগত্রয়ানন্দজী ছিলেন মাতৃভক্ত। এ-সম্বন্ধে মা আদেশ করলে, কোনও কিছু বললে, তা তাঁর কাছে ছিলো শিরোধার্য।

একদিনের কথা।

রাত্রি তখন গভীর। যোগত্রয়ানন্দজী সাধনায় নিমগ্ন রয়েছেন।

হঠাৎ পাশের বাড়ীতে কান্নার শব্দ শোনা গেলো।

সেখানে একজন মহিলা বহুদিন যাবত ভুগছিলেন। এখন বোধ হয় আর বাঁচেন না।

সেই বাড়ীর এক ভদ্রলোক ছুটে এলেন যোগত্রয়ানন্দজীর কাছে। কাতর কণ্ঠে তাঁকে ডাকতে লাগলেন।

যোগত্রয়ানন্দজী বাইরে এলেন। তাঁর মা-ও বাইরে এসে ছেলের পাশে দাঁড়ালেন।

যোগত্রয়ানন্দজী প্রতিবেশীকে বললেন, আপনি বাড়ী যান। আমি এক্ষুনি যাচ্ছি।

আশ্বস্ত হ'য়ে প্রতিবেশী বাড়ী চ'লে গেলেন।

অল্পক্ষণের মধ্যেই সামান্য কিছু ওষুধপত্র নিয়ে যোগত্রয়ানন্দজী মা ও মাসীমাকে সঙ্গে নিয়ে প্রতিবেশীর বাড়ীর দিকে যাত্রা করলেন।

সামান্য পথ গিয়েছেন।

হঠাৎ তাঁরা দেখলেন, ঘোর কৃষ্ণবর্ণের এক বিরাট ছায়ামূর্তি পথ আগ্‌লে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

সবাই থম্‌কে দাঁড়ালেন।

যোগত্রয়ানন্দজী বুঝলেন, এ আর কিছুই নয়, আসন্ন মৃত্যুর করাল ছায়া।

মা-ও বুঝতে পেরেছেন। তিনি ছেলেকে বললেন, বাবা, আর এগিয়ে কাজ নেই। এ-সব ঘোর অমঙ্গল চিহ্ন।

মা নিষেধ করলেন! এদিকে বিপন্ন প্রতিবেশীকে কথাও দিয়েছেন!

উভয়সংকটে পড়লেন যোগত্রয়ানন্দজী। শেষে আর কোনও পথ না দেখে মায়ের পায়ে লুটিয়ে পড়লেন।

মা, তোমার আশীর্বাদে এ অমঙ্গল দূর হ'য়ে যাবে। তুমি যে আমার পাশে রয়েছো, মা। তোমার কৃপায় রোগিণী নিশ্চয়-ই ভালো হ'য়ে উঠবে।

ছায়া মূর্তি তক্ষুনি অদৃশ্য হ'য়ে গেলো।

ফিরে এলো মায়ের মনোবল। ছেলের মাথায় হাত দিয়ে তিনি বললেন, বাবা, তোর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হোক।

কাল বিলম্ব না ক'রে তাঁরা এগিয়ে গেলেন।

মাত্র দুদিন আগে এক মুমূর্ষু রোগীর জন্যে একটা ওষুধ তৈরী করেছিলেন, সেই ওষুধ সঙ্গে ছিল। তাই-ই দিলেন।

রোগিণী ভাল হ'য়ে উঠলেন। চার পাঁচ দিনের মধ্যে তিনি সম্পূর্ণ নিরাময় হলেন।

রোগিণীর অভিভাবক জলভরা চোখে কৃতজ্ঞতা জানাতে এলেন। মুখ দিয়ে তাঁর কথা সরছিল না।

যোগত্রয়ানন্দজী বললেন, না না, আমি কিছু নয়। সেবক মাত্র। সবই ভগবানের কৃপা।

গুরুদেবের কৃপায় ও নিজের যোগশক্তিপ্রভাবে, সর্বোপরি নিজের জন্মার্জিত পুণ্যফলে যোগত্রয়ানন্দজী মাঝে মাঝে দেবতাদের দর্শন পেতেন। মাঝে মাঝে সূক্ষ্মলোকবিহারী মহাত্মাদেরও আবির্ভাব হোতো তাঁর গৃহে। এঁদের কৃপায় ও সাহায্যে শাস্ত্রের জটিল বিষয়ের মর্ম উদ্‌ঘাটন ক'রে নিতেন।

এক সময়ে তিনি পতঞ্জলির পাণিনি-মহাভাষ্য পড়বার জন্যে বড়ই ব্যাকুল হ'য়ে পড়লেন। এ বিষয়ে কলকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক দ্রাবিড়ী পণ্ডিত গোবিন্দ শাস্ত্রী ভরদ্বাজ ছিলেন অদ্বিতীয়।

যোগত্রয়ানন্দজী এঁরই দ্বারস্থ হলেন। অধ্যাপক বাইরের কাউকে পড়াতে রাজী হলেন না।

যোগত্রয়ানন্দজী বার বার অনুরোধ করলেন ; তিনি তবুও সম্মত হলেন না। বরং দু একটা কটু কথা বললেন।

যোগত্রয়ানন্দজী অন্তরে খুবই আঘাত পেলেন। বাড়ী এসে আহার নিদ্রা ত্যাগ করলেন। জলস্পর্শ না ক'রে ঠাকুর ঘরেই সারাদিন কাটালেন।

শেষে দেবাদিদেব মহাদেবের শরণাপন্ন হলেন। তাঁর কাছে প্রার্থনা জানালেন।

দেবাদিদেব, আমি নিজের সঙ্কীর্ণ স্বার্থের জন্যে ব্যাকুল হ'য়ে পতঞ্জলি পড়তে আগ্রহী হইনি। ঋষিদের শাস্ত্র অধ্যয়নে যাতে অসুবিধা না হয়, তার জন্যেই আমার এ ব্যাকুলতা। জীবের কল্যাণ-সাধনই আমার একমাত্র কাম্য। আজ থেকে আমি আর জ্ঞানলাভের জন্যে মানুষের দ্বারস্থ হবো না। হে সর্বজ্ঞানাকর, আজ থেকে শুধু তোমার কৃপার উপরই নির্ভর করবো। তুমি আমায় বিমুখ কোরো না। আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করো।

সারাদিন সারারাত কেটে গেলো অনাহারে।

রাত্রি তখন গভীর।

যোগত্রয়ানন্দজী নিবিষ্টমনে ধ্যান ক'রেই চলেছেন।

হঠাৎ পূজামণ্ডপ আলোয় উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠলো। দিব্য জ্যোতিতে, দিব্যভাবে চারিদিক পরিপূরিত হ'য়ে গেলো।

যোগত্রয়ানন্দজী চোখ মেলে তাকালেন। দেখলেন, অদূরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন জটাজুটধারী এক ঋষিকল্প মহাপুরুষ।

দুয়ার বন্ধ! এই মহাপুরুষ এলেন কি ক'রে? কোন্ পথে? কে ইনি? বিস্মিত হ'য়ে এই সবই ভাবছেন, এমন সময়ে সেই জ্যোতির্ময় পুরুষ বললেন, –

বৎস, তুমি হয়ত আমায় চিনতে পারছো না। যে গ্রন্থ পড়বার জন্যে তোমার এত ব্যাকুলতা আর এত মনোকষ্ট, আমি সেই গ্রন্থের রচয়িতা পতঞ্জলি।

অসীম বিস্ময়ে, অপার আনন্দে যোগত্রয়ানন্দজী ভূমিতে লুটিয়ে প্রণাম করলেন।

মহর্ষি পতঞ্জলি ব'লে চললেন, বৎস, কেন তোমার এই মনোবেদনা? কেন সারাদিন অভুক্ত রয়েছো? জলটুকুও মুখে দাও নি? শরীরকে কেন বৃথা কষ্ট দিচ্ছ? গোবিন্দ শাস্ত্রী তোমার জ্ঞানপিপাসা নিবৃত্ত করেনি, তাই?

তুমি কি জাননা, বৎস, প্রকৃত জিজ্ঞাসু ও তপঃনিষ্ঠ সাধক— এঁরাই একমাত্র শ্রীভগবানের নিকট থেকে জ্ঞান আহরণ ক'রে থাকে?

নিরাশ হোয়ো না, বৎস। আমি নিজে তোমায় ব্যাকরণ ভাষ্যের রহস্য বুঝিয়ে দেবো।

যোগত্রয়ানন্দজী আবার ভূঁমে লুটিয়ে পড়লেন। অকল্পনীয় কৃপালাভে ধন্য, অসীম আনন্দে পুলকিত যোগত্রয়ানন্দজীর দুই চোখ থেকে জল ঝরতে লাগলো ধারায় ধারায়।

মহর্ষি বললেন, আর বিলম্ব কেন? স্থির হ'য়ে বোসো। আমি ব্যাখ্যা শুরু করি।

মহর্ষি ব্যাখ্যা শুরু করলেন।

অল্প সময়ের মধ্যেই মহর্ষি পতঞ্জলি যোগত্রয়ানন্দজীকে সব কিছু তত্ত্ব, সব কিছু রহস্য বিশদভাবে বুঝিয়ে দিয়ে অন্তর্ধান করলেন।

সে এক পরম আশ্চর্য ব্যাপার! অভাবনীয় ঘটনা!

যোগত্রয়ানন্দজীর সকল সংশয় ছিন্ন হোলো। দিব্য আনন্দে তিনি আপ্লুত হলেন।

প্রকৃতই বুঝতে পেরেছেন কি না তা পরীক্ষা করবার জন্যে যোগত্রয়ানন্দজী বইখানি খুললেন। দেখলেন, যেখানেই পড়েন সেখানকার সব-ই বুঝতে পারছেন। পড়বার সঙ্গে সঙ্গেই অধীত বিষয়ের নিহিতার্থ স্পষ্টরূপে ফুটে উঠছে।

যোগত্রয়ানন্দজী নিজেকে কৃতার্থ মনে করলেন।

আর একদিন।

সেদিন শিবরাত্রি। তখন মহানিশা।

আবির্ভূত হলেন যোগত্রয়ানন্দজীর সম্মুখে মহর্ষি গৌতম। তিনি কৃপা ক'রে যোগত্রয়ানন্দজীকে ন্যায়দর্শন বুঝিয়ে দিলেন।

কিছুদিনের মধ্যে দেবানুগৃহীত ও দৈবীশক্তিসম্পন্ন শাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিত সাধকরূপে যোগত্রয়ানন্দজীর খ্যাতি সারা দেশে প্রচারিত হোলো।

যোগত্রয়ানন্দজীর তপঃনিষ্ঠ জীবনে এইভাবে দেখা দিল কর্ম, ভক্তি ও জ্ঞানের অপূর্ব মিলন। এ এক বিরল দৃশ্য!

জীবনযুদ্ধে জয় পরাজয়, লাভ লোকসন এ সবেই নিরাসক্ত থেকে গীতার আদর্শ সম্মুখে রেখে যোগত্রয়ানন্দজী চলতে লাগলেন।

তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন, ভগবান কৃপাময়। কৃপাময় ভগবানের উপর, তাঁর অপার কৃপার উপর, সম্পূর্ণ নির্ভর ক'রে যোগত্রয়ানন্দজী অযাচকভাবেই সংসার চালাতে লাগলেন।

সংসারটিও ছোট নয়। নিজের স্ত্রী-পুত্র আছে। তা ছাড়াও, রোগী, রোগীর আত্মীয় স্বজন, প্রায়ই থাকেন তাঁর গৃহে। সেখানেই খাওয়া দাওয়া চালান।

যোগত্রয়ানন্দজী চাকরী করেছেন মাত্র দুইবার। প্রথমে তিনি

নোয়াখালি গভর্ণমেণ্ট স্কুলে কয়েকদিনের জন্যে প্রধান পণ্ডিতের কাজ করেছিলেন। কয়দিনের জন্যে বালীতে টমসন বিদ্যালয়ে পণ্ডিতের কাজও করেছেন।

তখন যোগত্রয়ানন্দজী নোয়াখালিতে কাজ করছেন।

তাঁর ব্যবহার, চরিত্র-মাধুর্যে মুগ্ধ হ'য়ে বহু গুণগ্রাহী তাঁর অন্তরঙ্গ হ'য়ে পড়েছেন। এঁদের মধ্যে স্থানীয় সরকারী ইঞ্জিনীয়ার বিনোদ বিহারী দত্ত একজন।

বিনোদবাবু ও আরও কয়েকজন ধরলেন, চলুন, সন্দ্বীপ বেড়িয়ে আসি।

যোগত্রয়ানন্দজী সাত্ত্বিক-ভাবাপন্ন লোক। তিনি অন্য লোকের রান্না খেতেন না। বাজারের কোনও খাবারও খেতেন না।

সন্দ্বীপে নেমে গোরুর গাড়ীতে তাঁরা চলেছেন। রোদের তেজ ক্রমশঃ বাড়তে লাগলো। কিছুক্ষণ বাদে যোগত্রয়ানন্দজী ক্ষিধে-তেষ্টায় খুব কাতর হ'য়ে পড়লেন। দারুণ পিপাসায় মুখ গেলো শুকিয়ে। রাস্তার ধারে কোথাও জল মিললো না।

যোগত্রয়ানন্দজী ভগবৎ চিন্তায় বিভোর হ'য়েই আছেন। সহযাত্রীরা কিন্তু ভাবনায় আকুল। কোথায় জল?

হঠাৎ একজন অপরিচিত লোক এসে বললো, এই গাড়ীতে তৃষ্ণায় কে কষ্ট পাচ্ছেন? তাঁর জন্যে কচি শসা এনেছি। এই নাও।

সহযাত্রীরা শশার দামের কথা জিজ্ঞাসা করলেন।

না, না। দাম দিতে হবে না।

অপরিচিত লোকটি যোগত্রয়ানন্দজীর হাতেই শশা দিয়ে অকস্মাৎ অন্তর্হিত হ'য়ে গেলো।

কেউ তাঁর কোনও হদিশ পেলেন না।

সবাই অবাক হ'য়ে গেলেন।

আর একটি ঘটনা।

কবিরাজী চিকিৎসায় যোগত্রয়ানন্দজীর সুনাম হয়েছে। নিত্যই রোগীর ভীড়। অধিকাংশই দরিদ্র। যোগত্রয়ানন্দজী তাদের সবাইকে যত্ন ক'রে দেখেন। বিনামূল্যে ওষুধ দেন। মাঝে মাঝে পথ্যও যোগান। যা সামান্য আয় হয়, তা দিয়ে ওষুধ ও বই কেনেন।

সংসার চলে না।

সেদিন হাতে মাত্র দশটা টাকা আছে।

একটি ছাত্র এলো। চোখ খারাপ। চশমা না হ'লে চলবে না। সাহায্য চাইলো। যোগত্রয়ানন্দজী তক্ষুনি সেই দশটা টাকাই তাকে দিয়ে দিলেন।

স্ত্রী এলেন। ঘরে চাল বাড়ন্ত। ছেলেমেয়েদের, অন্যান্য লোকদের খাওয়াবেন কি?

সামান্য চারটি আতপ চাল ও একটা কাঁচা কলা সংগ্রহ হয়েছে। তাই দিয়ে দেবতার ভোগ দেওয়া হোলো।

রান্নাঘরের শিকল এঁটে স্ত্রী বিষণ্ণ মনে রইলেন।

স্ত্রী জানালেন, আজ উপোস করতে হবে।

যোগত্রয়ানন্দজী উর্ধ্বে হাত দেখিয়ে বললেন, তাঁর ইচ্ছা।

সেদিন উপবাসী রইলেন সবাই।

রাত কাটলো।

এদিকে এক পাওনাদার এলো। যোগত্রয়ানন্দজী পড়ার সুবিধার জন্যে ধারে একটা টেবিল কিনেছিলেন। তাকে আজ আসতে বলেছেন।

কিন্তু কোথায় টাকা? কথার খেলাপ হবে?

হঠাৎ ডাক পিওন এলো।

আসাম থেকে যোগত্রয়ানন্দজীর নামে রেজেস্ট্রী চিঠি এসেছে। তার মধ্যে রয়েছে দুখানা দশ টাকার নোট।

পাঠিয়েছে যোগত্রয়ানন্দজীর এক ছাত্র। অনেকদিন আগে যোগত্রয়ানন্দজী তাঁকে যত্ন ক'রে পড়িয়েছিলেন। এখন সে চাকরী করছে।

সে লিখেছে, আপনার কৃপায় আমি এখন দু-পয়সা রোজগার করছি। হঠাৎ মনে হোলো, আপনার অভাব চলছে। তাই সামান্য কিছু পাঠালাম। কৃপা ক'রে গ্রহণ করবেন।

যোগত্রয়ানন্দজীর চোখে জল এলো। পাওনাদারের টাকা শোধ ক'রে বাকী টাকা গৃহিণীকে দিলেন।

হঠাৎ যোগত্রয়ানন্দজীর মা অসুস্থ হ'য়ে পড়লেন।

তিনি একদিন পুত্রকে ডেকে বললেন, বাবা, আমি আর বেশী দিন বাঁচবো মনে হয় না। শেষ কয়দিন বাবা বিশ্বনাথের চরণে প'ড়ে থাকি এই আমার ইচ্ছে। তুই আমাকে কাশী নিয়ে চল।

হাতে একটা টাকাও নেই। তা হোক।

মাতৃভক্ত যোগত্রয়ানন্দজী তক্ষুনি রাজী হলেন।

তাই হবে, মা। তবে আর বিলম্ব কেন? দু' একদিনের মধ্যেই যাত্রা করি।

একজন মহিলা এ সংবাদ শুনে বললেন, বাবা, আমার হাতে একশো টাকা আছে। তুমি নাও।

সেই একশো টাকা মাত্র সম্বল ক'রে যোগত্রয়ানন্দজী মাকে নিয়ে এলেন কাশী। একা নয়। এলেন সপরিবারে। সঙ্গে ষোলো সতেরো জন লোক।

কাশীতে এসে উঠলেন কাশীর দুর্ধর্ষ গুণ্ডা বটুক পাঁড়ের বাসায়। আগে টের পান নি। সে একজন ডাকসাইটে গুণ্ডা।

যেই শুনলেন অমনি বটুকের কাছে গিয়ে বললেন, বাবা বিশ্বনাথের কাছে থেকে গুণ্ডামী কর কেন? আর কোরো না।

বটুকের সঙ্গে কয়েকজন অনুচর ছিল। তারাও দুর্দান্ত পালোয়ান, বিখ্যাত গুণ্ডা। তারা আর তাদের সর্দার বটুক পাঁড়ে কল্পনাও করতে পারেনি, যে তাদেরই আস্তানায় এসে তাদের মুখের 'পরে এমন কথা কেউ কইতে পারে।

অনুচরেরা এগিয়ে গেলো যোগত্রয়ানন্দজীকে উপযুক্ত শিক্ষা দিতে।

বটুক নিরস্ত করলো। সে কেমনতরো হ'য়ে গেলো। পড়লো যোগত্রয়ানন্দজীর পায়ে।

আমায় ক্ষমা করুন। জীবনে এমন কাজ আর করবো না।

হ্যাঁ, কথা সে রেখেছিল। সেদিন থেকে আর গুণ্ডামী সে করে নি। সে হ'য়ে পড়লো যোগত্রয়ানন্দজীর অনুরক্ত ভক্ত। আজীবন অনুরক্তই ছিল।

মার অসুখ সারে না।

মা পুত্রকে একদিন বললেন, বাবা, আমি আর বাঁচবো না। মরার আগে আমায় একটা কথা দে।

বল মা। তুমি যা বলবে, তাই-ই আমি নির্বিচারে পালন করবো।

তুই কথা দে, সংসারে থেকেই তুই সাধনভজন করবি। সন্ন্যাসী হবি নে।

তাই হবে মা। ঘর সংসার ছেড়ে আমি কোথাও যাবো না।

কাশীতেই আছেন।

সংসারটি বেশ বড়। সেদিকে আদৌ ভ্রূক্ষেপ নেই। নিদারুণ অসচ্ছলতার মধ্য দিয়েই সংসার চলছে।

যোগত্রয়ানন্দজীর গুরুভাই চিদ্‌ঘনানন্দ স্বামী এই আর্থিক কষ্টের কথা ভেবে মাসিক সাহায্যের জন্যে আমুটীর রাজাকে বলে দিলেন।

রাজা প্রতিমাসে তিনশো টাকা ক'রে যোগত্রয়ানন্দজীকে সাহায্য করবেন সানন্দে এই প্রতিশ্রুতি দিলেন।

যোগত্রয়ানন্দজী ভগবানের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর ক'রেই চলেছেন। ভবিষ্যতেও চলবেন। সাধারণ মানুষের দানের উপর নির্ভর ক'রে চলবেন না। তাই তিনি এই প্রস্তাবে সম্মত হলেন না।

গুরু ভাই খুবই খুশী হলেন। রাজাও যোগত্রয়ানন্দজীর অনুরক্ত হ'য়ে পড়লেন।

কাশীতে রয়েছেন পুটিয়ার রাণী। তিনি ভয়ানক অসুস্থ। কাশীর সকল ডাক্তার কবিরাজই দেখেছেন তাঁকে। কেউ ই নিরাময় করতে পারেন নি। অসুখ বেড়েই চলেছে।

রাণী শরণাপন্ন হলেন যোগত্রয়ানন্দজীর।

যোগত্রয়ানন্দজী চলেছেন রাণীকে দেখতে।

হঠাৎ দৈববাণী হোলো, রাণীকে অমুক তিনটি অ্যালোপ্যাথিক ওষুধ দিও। তিনি এতেই ভালো হবেন।

যোগত্রয়ানন্দজী সেই তিনটি ওষুধই দিলেন। দু একদিনের মধ্যেই রাণী ভালো হ'য়ে উঠলেন।

যোগত্রয়ানন্দজী চিকিৎসক হিসাবে সুপরিচিত হলেন। দু পয়সা আয়-ও হ'তে লাগলো। সে আয় দিয়ে চলে রোগীদের পথ্য, তাদের আত্মীয় স্বজনের খাওয়া-পরা, দরিদ্র আতুর লোকদের সেবা—এই সব। নিজেদের কষ্ট কমে না।

শুধু একজন শাস্ত্রবিদ মহাপণ্ডিত রূপেই নয়, একজন শ্রেষ্ঠ সাধক রূপেও যোগত্রয়ানন্দজীর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়লো।

দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে খ্যাতনামা পণ্ডিত, জ্ঞানপিপাসু—এঁরা যোগত্রয়ানন্দজীর কাছে জিজ্ঞাসু হ'য়ে আসতে লাগলেন।

আসেন তাঁর কাছে স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী অভেদানন্দ—এঁরা। আসেন মহামহোপাধ্যায় ডঃ গোপীনাথ কবিরাজ, ভারতের জাতীয় আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ, কলিকাতা ডন সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা সতীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়—এঁরা।

আসেন ভারতের নানা স্থান থেকে প্রসিদ্ধ পণ্ডিতরা।

যিনি-ই আসেন জিজ্ঞাসু হ'য়ে, তাঁকেই জ্ঞান বিতরণ করেন অকৃপণভাবে।

প্রতিদিন শাস্ত্রপাঠ, শাস্ত্রালোচনা, এ সব তো আছেই।

এই ভাবেই চলতে লাগলো মহা-আচার্যের জীবন। চলতে লাগলো পূর্বের মতো সম্পূর্ণ অযাচক বৃত্তি অবলম্বন ক'রেই।

যোগত্রয়ানন্দজীর কাছে পাণিনির মহাভাষ্য ও ন্যায় দর্শনের ব্যাখ্যা শুনে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন,—

আমার ইচ্ছা হয়, কোনও নির্জন পাহাড়ের গুহায় গিয়ে আপনার চরণতলে ব'সে ঋষিদের শাস্ত্রগুলো একান্তমনে পাঠ করি।

এঁর মুখে বৈদিক জ্ঞানের মাহাত্ম্য-কীর্তন শুনে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন,—

বেদের পরমতত্ত্ব, বেদের অপৌরুষেয়ত্ব যদি এমনই হয়, তবে এই পৃথিবীতে এমন কোন্ মানুষ আছেন যে, এই মহাপবিত্র গ্রন্থের কাছে মাথা নত করবে না?

মনীষী সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় একদিন যোগত্রয়ানন্দজীর কাছে দর্শনতত্ত্বের কতকগুলি জটিল প্রশ্নের আলোচনা করতে এলেন।

যোগত্রয়ানন্দজী এই সব প্রশ্নের মীমাংসা করলেন গণিতের মাধ্যমে। প্রাচীন ভারতীয় গণিত ও আধুনিক গণিতের তত্ত্ব ও প্রয়োগ কৌশল যেমন নিপুণভাবে তিনি বুঝিয়ে দিয়েছিলেন তা দেখে সতীশচন্দ্র বিস্মিত ও মুগ্ধ হ'য়ে যান।

তিনি বললেন, গণিতের মাধ্যমে ধর্ম ও দর্শনের মর্ম যে এমন ভাবে উদ্ঘাটন করা সম্ভব তা আমার ধারণায় ছিল না। আমার প্রার্থনা, আপনি এই ধরণের ব্যাখ্যাযুক্ত একখানি গ্রন্থ রচনা করুন। আধুনিক যুগের মানুষ এর দ্বারা অশেষভাবে উপকৃত হবে।

যোগত্রয়ানন্দজীর নাম ছড়িয়ে পড়লো।—সর্বত্যাগী জ্ঞানী সাধক।—প্রকৃত জ্ঞানী।

যোগত্রয়ানন্দজী দৈনিক বঙ্গবাসী ও ধর্ম ব্যাখ্যা নামে কাগজে ছদ্মনামে কতকগুলি অমূল্য প্রবন্ধ লিখলেন। ছদ্মনামে লিখলেও দেশবাসী জানতে পারলেন, প্রকৃত লেখক কে। সকলে সবিস্ময়ে মাথা নত করলেন এই মহাজ্ঞানীর কাছে।

অম্বুবাচীর মর্ম ব্যাখ্যা, আর্যশাস্ত্রপ্রদীপ প্রভৃতি প্রবন্ধ প'ড়ে সকলে

হতবাক হয়ে গেলেন। প্রবন্ধ দুটি আধুনিক জগতে নোতুন এক ভাবের সৃষ্টি করলো।

ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র দত্ত আই. সি. এস্ ইংরেজীতে বেদের অনুবাদ করতে লাগলেন। শূদ্র বেদ নিয়ে আলোচনা করছে, বেদের টিপ্পনী লিখছে; এতে ক্ষুব্ধ হ'য়ে পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি 'বেদের অসম্ভাব্য অপমান ও সর্বনাশ' শিরোনামায় এক দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখলেন বঙ্গবাসী পত্রিকায়। রমেশচন্দ্র ও তাঁর অনুগামীরা নিরস্ত হবার পাত্র নন। পত্রিকার মাধ্যমে উভয় পক্ষ অনেক বাদানুবাদ করলেন। কোনও পক্ষই নিরস্ত হলেন না।

যোগত্রয়ানন্দজী লিখলেন 'আশা মিটিল কৈ' নামে এক দীর্ঘ প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধ বের হবার সঙ্গে সঙ্গেই উভয় পক্ষ নিরস্ত হলেন।

পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি লিখলেন, আমি যেন আর্য ঋষির নিকট থেকে অমৃত পান করছি। যোগ-সংসিদ্ধি লাভ না করলে কেউ আর্যশাস্ত্রের এরূপ সারমর্ম গ্রহণ করতে পারে না।

যোগত্রয়ানন্দজী সংস্কৃত ভাষায় ঈশোপনিষদের ভাষ্য এবং প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ন্যায় সম্বন্ধে তুলনামূলক এক মহামূল্য গ্রন্থ রচনায় মনোনিবেশ করলেন।

মহাপণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন এই বই-এর কিছুটা মাত্র অংশ প'ড়ে বললেন, এ হোলো কোনও প্রচীন ঋষি প্রণীত এক অমূল্য শাস্ত্র।

এই সময় একদিন যোগত্রয়ানন্দজী গুরুদেবের প্রত্যাদেশ লাভ করলেন।

বৎস, অযাচক বৃত্তি নিয়ে সংসার চালিয়ে যাচ্ছো। ত্যাগ ও তিতিক্ষা বলে আপ্তকাম হয়েছো। এসব দেখে আমি খুবই সুখী হয়েছি। এ-সবই তোমার কাছে প্রত্যাশা করেছিলাম। কিন্তু তোমার কাছে যে আরও অনেক কিছু আশা রয়েছে।

বৎস, সাধু যদি জন-সমাজেই বাস করতে চায়, তবে তাঁকে জনকল্যাণের জন্য অবশ্যই কিছু করতে হয়। ভগবানের অশেষ কৃপায়

বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধিবলে ঋষিদের গ্রন্থসমূহ উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছো। আমার ইচ্ছা, সেই তত্ত্বগুলি এ যুগের মানুষের উপযোগী ক'রে তুমি প্রকাশ করো। বেদ, আগম, ভক্তিশাস্ত্র সব কিছুর নির্যাস নিয়ে তুমি এক মহাগ্রন্থ রচনা করো।

গুরুদেবের ইচ্ছা! তিনি আদেশ করেছেন!

তবে আর কালবিলম্ব নয়। রচনা করতে শুরু করলেন আর্যশাস্ত্র-প্রদীপ।

এই মহাগ্রন্থ রচনা করবার সময়ে যোগত্রয়ানন্দজী যে অসাধারণ ত্যাগ, তিতিক্ষা ও ধৈর্য দেখিয়েছেন, তাঁর গোটা পরিবারকে যে চরম দুর্গতির মধ্যে টেনে নিয়েছেন, তা ভাবলেও শরীর কণ্টকিত হ'য়ে ওঠে। কোনও দিন গোটা পরিবারের সকলেই আধপেটা খেয়েছেন। কোনও দিন তাও জোটে নি। হাসিমুখে সবাই রয়েছেন অনাহারে। শুধু কাঁচা বেলপাতার রস পান ক'রেই দিন কাটিয়ে দিয়েছেন সবাই।

এই অবস্থার মধ্যেও দিনে চৌদ্দ পনেরো ঘণ্টা ধ'রে গ্রন্থ রচনা করেছেন। রাতে সাধন ভজন করেছেন। হাতে টাকা নেই। অথচ গ্রন্থ প্রকাশও ক'রে চলেছেন।

খণ্ডে খণ্ডে আর্যশাস্ত্র প্রদীপ বের হ'তে লাগলো। বই পড়ে সবাই বিস্মিত স্তম্ভিত হ'য়ে গেলেন। এত জ্ঞান! এত পাণ্ডিত্য! এমন নিরপেক্ষ সরল বিচার-বিশ্লেষণ! আধুনিক যুগে এমনটি আর দেখা যায় নি।

যোগত্রয়ানন্দজী অযাচক বৃত্তি অবলম্বন ক'রেই দিন কাটাতে লাগলেন। তিনি এ সময়ে থাকেন বরানগরে।

সেদিন গৃহিণী এসে জানালেন, ঘরে এক দানা চাল নেই। হাতে একটি পয়সাও নেই। এতগুলি প্রাণী সংসারে! তবে?

যোগত্রয়ানন্দজী আকাশের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, আমরা তাঁর চরণে শরণ নিয়ে ব'সে আছি। রাখতে হয় তিনি রাখবেন। মারতে হয় মারবেন। ধৈর্য ধরো। একটা কিছু হবেই।

সবাই বেলপাতার রস খেয়ে সেদিন কাটালেন।

পরদিনও কাটলো ঠিক এমনিভাবেই। ঐ কাঁচা বেলপাতার রস পান করে।

তৃতীয় দিনও যায় যায়।

ঘরের ভিতর এমন ধারা চরম দুর্গতি চলছে, তা কেউ জানলো না। টের পেলো না। জানলেন না শিষ্যরা, ভক্তরা, অনুগামীরা।

প্রতিদিনকার মতো চলছে শাস্ত্রপাঠ, শাস্ত্র আলোচনা, বই লেখা।

তখন অপরাহ্ণ বেলা।

এমন সময়ে এক অলৌকিক ঘটনা ঘ'টে গেলো।

যথারীতি শাস্ত্র আলোচনা চলছে। স্বামী অভেদানন্দ প্রভৃতি অনুগামী ভক্তেরা রয়েছেন ঘরে।

যোগত্রয়ানন্দজী সবাইকে একমনে দার্শনিক তত্ত্ব বুঝিয়ে চলেছেন।

এমন সময়ে ডাক পিওন এলো। দিলো যোগত্রয়ানন্দজীর হাতে রেজেস্ট্রী করা একখানা ইনসিওর খাম।

যোগত্রয়ানন্দজী খাম খুললেন। তার মধ্যে চিঠি রয়েছে। চিঠিখানা পড়লেন।

পড়া হ'য়ে গেলে ঊর্ধ্বদিকে দৃষ্টি রেখে যোগত্রয়ানন্দজী একেবারে নিস্পন্দ হ'য়ে রইলেন। চোখ দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়তে লাগলো।

উপস্থিত সবাই যারপরনাই বিস্মিত হ'য়ে পড়লেন।

তাঁকে তো এ পর্যন্ত কেউ-ই কাঁদতে দেখে'নি! তাঁর চোখে জল দেখে নি কেউ-ই!

কেটে গেলো মিনিট পনেরো। সবাই রয়েছেন যেন নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে।

স্বামী অভেদানন্দ আর ধৈর্য রাখতে পারলেন না। তিনি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হ'য়ে বললেন,

বাবা কী হয়েছে? আমরা কেউ-ই কিছু বুঝতে পারছিনে।

আপনি শোক দুঃখের অতীত পুরুষ। আপনাকে কেউ-ই কাঁদতে দেখিনি। আপনার চোখে জল দেখিনি কখনও। এমন কী ঘটলো, বাবা, যার ফলে আপনি এতই উতলা হ'য়ে পড়েছেন? বলুন, বাবা, বলুন। আপনার চোখে জল কেন? এই চিঠিখানা প'ড়ে কেনই বা চুপ ক'রে রইলেন? আমরা মহাভাবনায় পড়েছি। কৃপা ক'রে আমাদের মানসিক যন্ত্রণার লাঘব করুন। অস্থির হ'য়ে পড়েছি আমরা।

যোগত্রয়ানন্দজী বললেন, তোমরা আমার চোখে যে জল দেখলে, তা শোকে নয়, দুঃখে নয়। তা আনন্দে। আনন্দে-ই আমার দুই চোখ দিয়ে জল বেরুচ্ছে। শোকে আমায় কখনও অভিভূত করে নি, করতে পারে না। আমার সে মনোবল আছে। ভগবানের করুণা দেখে আজ আমি আর না কেঁদে থাকতে পারছিনে। আর, এই করুণা আমাকে অবলম্বন ক'রেই। তোমরা এই চিঠিখানা প'ড়ে ছাখো।

স্বামী অভেদানন্দ চিঠিখানা পড়লেন। সবাই শুনলেন।

চিঠিখানা লিখেছেন কাশীর চৌখাম্বা মহল্লার অধিবাসী এক ধর্মপ্রাণ সম্ভ্রান্ত লোক। নাম প্রমদাদাস মিত্র। তিনি হলেন কুইনস্ কলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপক।

গতরাত্রে আমি এক স্বপ্ন দেখেছি। বাবা বিশ্বনাথ আমার সম্মুখে আবির্ভূত হ'য়ে বললেন, আমি উপবাসী রয়েছি। অন্নজল কিছুই গ্রহণ করিনি। শীঘ্রই আমার জন্যে অন্নের ব্যবস্থা করো। আমার এক পরম ভক্ত গত দুইদিন উপবাসী রয়েছে। তাই আমারও কাটাতে হচ্ছে উপবাস ক'রে। আমার 'পরে যদি তোমার অনুমাত্র ভক্তি থাকে তবে আমার ঐ ভক্তের অন্নগ্রহণের ব্যবস্থা ক'রে দাও। এতে ক্ষণমাত্র বিলম্ব কোরো না।

বাবা বিশ্বনাথ আপনার নাম ঠিকানাও আমাকে জানিয়ে দিয়েছেন। স্বপ্নে-ই দেখতে পেলাম, আপনার নাম ও ঠিকানা উজ্জ্বল জ্যোতির্ময় অক্ষরে প্রকট হ'য়ে উঠেছে।

আমি বাবা বিশ্বনাথের আদেশ পেয়ে নিজেকে কৃতার্থ মনে করছি। তাঁরই ইচ্ছা অনুযায়ী আপনাকে কিছু টাকা পাঠালাম। আপনি গ্রহণ ক'রে আমায় ধন্য করবেন।

আমার স্থির বিশ্বাস বাবা বিশ্বনাথের স্বপ্নাদেশ ব্যর্থ হবে না। আমার চিঠি ও টাকা ঠিক জায়গায় ঠিক সময়েই পৌঁছবে। চিঠির প্রাপ্তি রসিদ ফেরত আসলেই আমি আপনার শ্রীচরণ দর্শন করতে যাবো।

চিঠির সঙ্গে ছিল চারখানা দশ টাকার নোট।

চিঠি পড়া হোলো।

যোগত্রয়ানন্দজী এই কয়দিনকার সাংসারিক অবস্থা সবাইকে জানালেন। তিনি জানালেন, প্রায় তিনদিন বাড়ীর সবাই উপবাসী রয়েছে। তিনি জানতেন, তাঁর বহু শিষ্য, ভক্ত, অনুগামী রয়েছেন, যাঁরা ইঙ্গিত পেলেই টাকা দিয়ে দিতেন। কিন্তু ইচ্ছে ক'রেই তিনি কাউকে কিছু জানান নি। একান্তভাবে তিনি নির্ভর করেছেন ভগবানের উপর। তিনি সর্বজ্ঞ। সব জায়গাতেই রয়েছেন। করুণাময় তিনি। তিনি সব-ই দেখছেন। তাঁর যদি ইচ্ছা হয়, নিমেষেই এ অভাব মোচন হ'তে পারে। তবে কেন অপরের উপর নির্ভর করবো?

যোগত্রয়ানন্দজী জানালেন, করুণাময়ের এই অপার করুণা দেখে আনন্দে তিনি চোখের জল রোধ করতে পারছেন না। এ অশ্রু দুঃখের নয়, পুলকের অশ্রু।

উপস্থিত সবাই আনন্দে অভিভূত হ'য়ে পড়লেন।

বন্ধ হ'ল অন্য কথা। বন্ধ হ'ল শাস্ত্র পাঠ, শাস্ত্রালোচনা।

শুরু হোলো ভগবানের নাম-কীর্তন। করুণাময়ের নাম-গান।

শুধু এই দিনই নয়।

প্রায়ই সন্ধ্যার সময় কীর্তন হয়। ভগবানের নাম-কীর্তন।

সেদিন সন্ধ্যার পর যোগত্রয়ানন্দজীর বৈঠকখানায় সীতারাম নাম-কীর্তন চলছে। অনেকেই সেই নাম-কীর্তনে যোগ দিয়েছেন।

কীর্তনের সঙ্গে পাখোয়াজ সঙ্গত চলছে। বাজাচ্ছেন যোগত্রয়ানন্দজী নিজে।

ভক্ত সতীশ আবেগে ভূমিতে প'ড়ে সীতারাম, সীতারাম ব'লে গড়াগড়ি দিচ্ছেন।

যোগত্রয়ানন্দজীর বড় ছেলে বিভূতিভূষণ দুই হাত তুলে নাচছেন।

শেষে কীর্তন এত জ'মে উঠলো যে সবাই আসন ছেড়ে দুই হাত তুলে নাচতে লাগলেন।

কিন্তু সেখানে উপস্থিত রয়েছেন মহাবীর স্বয়ং। পবননন্দন শ্রীহনূমান এমন নির্মল নাম-কীর্তনের লোভ ছাড়তে পারেন নি। তিনি ছদ্মবেশে এসে যোগ দিয়েছেন।

মহাবীরও নাচছেন। নাচছেন ভাবে গদ গদ হ'য়ে।

কেউ-ই লক্ষ্য করলো না। কিন্তু লক্ষ্য এড়ালো না যোগত্রয়ানন্দজীর।

তিনি শ্রদ্ধার সঙ্গে লক্ষ্য করছিলেন মহাবীরের হাবভাব ও তীব্র ভক্তির উচ্ছ্বাস।

কীর্তন শেষ হোলো।

যখন সবাই ভূমিতে প'ড়ে গড়াগড়ি দিচ্ছেন, সেই অবসরে সবারই অলক্ষিতে শ্রীরামচন্দ্রের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়ে মহাবীর অদৃশ্য হ'য়ে গেলেন।

সবাই নিজ নিজ আসনে বসলেন।

যোগত্রয়ানন্দজী বললেন, শ্রীরামনাম-কীর্তনে আজ স্বয়ং মহাবীর উপস্থিত হয়েছিলেন। আজ আমাদের পরম সৌভাগ্য। নাম-কীর্তন আজ আমাদের সার্থক হয়েছে।

সতীশ পাল।

তিনি যোগত্রয়ানন্দজীর একনিষ্ঠ ভক্ত।

অল্প বয়সেই সতীশের মনে বৈরাগ্য জন্মে। তিনি বেলুড় মঠে থেকে মঠের ও ওখানকার স্বামীজীদের সেবা-পরিচর্যা করেন।

এই সূত্রে যোগত্রয়ানন্দজীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। শেষে জন্মে ঘনিষ্ঠতা।

সেবার সতীশ নিজের বাড়ী আলমবাজারে গিয়েছেন। সেখানে গিয়ে এক মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হ'য়ে পড়লেন।

ডাক্তাররা আশা ছেড়ে দিলেন। বাড়ীর সকলে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন।

যোগত্রয়ানন্দজীর কাছে এ সংবাদ পৌঁছলো। তিনি তৎক্ষণাৎ সতীশের বাড়ী আলমবাজারে ছুটে এলেন।

তাঁকে দেখেই সতীশ কেঁদে ফেললেন।

বাবা, এবার আর বাঁচবো না। তাতে আমার অণুমাত্র দুঃখ নেই। আপনি শুধু এই আশীর্বাদই করুন, যেন জন্মে জন্মে আপনার সেবা করতে পারি।

যোগত্রয়ানন্দজী সতীশকে দেখে গৃহে ফিরছেন। সঙ্গে রয়েছেন এক তরুণ ভক্ত।

যোগত্রয়ানন্দজী তাঁকে বললেন, সতীশের যে অবস্থা দেখলাম! এখন একমাত্র ভরসা ভগবান!

ভক্ত বললেন, বাবা, এর জন্যে এত উতলা হয়েছেন কেন? আপনি ভগবানকে জানান। তা হ'লেই সতীশবাবু বেঁচে যাবেন।

যোগত্রয়ানন্দজী সারা পথ আর কথা কইলেন না। বাড়ী এসেই ঠাকুর ঘরে প্রবেশ করলেন। দরজা দিলেন বন্ধ ক'রে। বহুক্ষণ প্রার্থনা করলেন। করলেন জপ-ধ্যান। শেষে ঠাকুর ঘর থেকে যখন বেরিয়ে এলেন, তখন দেখা গেলো তাঁর মুখে প্রসন্নতা। দুঃখ ও চিন্তার আভাষ নেই ও মুখে।

সকালে খোঁজ নিয়ে জানা গেলো, সতীশ অনেকটা ভাল হ'য়ে উঠেছেন।

কয়েক দিনের মধ্যেই সতীশ নিরাময় হলেন।

রাজা কালীকৃষ্ণ ঠাকুর যোগত্রয়ানন্দজীর বড়ই অনুরক্ত ছিলেন।

সেদিন যোগত্রয়ানন্দজী নিজের বাড়ী ব'সে ধ্যানে নিমগ্ন।

হঠাৎ তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠলো, কালীকৃষ্ণ নিজের ঠাকুর ঘরে পা ফস্‌কে প'ড়ে গিয়েছেন। উঠে দাঁড়াবার শক্তিও নেই।

আচম্বিতে যোগত্রয়ানন্দজী আহা, আহা ক'রে উঠলেন।

ধ্যান ক'রে কিছুক্ষণ বাদে বাইরে এলেন। এমন সময়ে কালীকৃষ্ণের বাড়ী থেকে একজন কর্মচারী এলেন।

তিনি বললেন, কর্তার বড় অসুখ। আপনাকে এক্ষুনি একবার যেতে হবে।

যোগত্রয়ানন্দজী তক্ষুনি রওনা হলেন।

দেখলেন, কালীকৃষ্ণের পা জখম তো হয়েছেই, ব্যাপার আরও জটিল। আকস্মিকভাবে পক্ষাঘাতের আক্রমণ ঘটেছে তাঁর দুই পায়ে। তাই তিনি মাটিতে প'ড়ে জখম হয়েছেন। এ ব্যাধি চিকিৎসা করা দুরূহ। এ একটা দুরারোগ্য ব্যাধি-ই বলা চলে।

কালীকৃষ্ণ যোগত্রয়ানন্দজীকে দেখে নেহাৎ অসহায়ের মত কেঁদে উঠলেন।

যোগত্রয়ানন্দজী কালীকৃষ্ণের পিঠে ধীরে ধীরে হাত বুলোতে লাগলেন। আশ্বাস দিয়ে বললেন, ভয় কি ? ভাল হ'য়ে যাবেন। ভগবান নিশ্চয়-ই কৃপা করবেন।

সঙ্গে সঙ্গে এক বিস্ময়কর কাণ্ড ঘ'টে গেলো।

কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখা গেলো, কালীকৃষ্ণের পায়ের পক্ষাঘাত আর নেই। একটু একটু ক'রে লাঠি ভর দিয়ে তিনি দাঁড়াতে পারছেন।

সেদিন কালীকৃষ্ণের নাতনীর বিয়ে।

সারাদিনই আকাশ জুড়ে মেঘ। দারুণ বৃষ্টি এলো ব'লে। সকলেই মহাভাবনায় পড়লেন।

যার বিয়ে সেই নাতনী কালীকৃষ্ণকে বললেন, দাছু, সব যে লণ্ডভণ্ড হ'য়ে যায়। এখন উপায় ?

কালীকৃষ্ণ বললেন, তাইতো! এ যে মহাবিপদ! এখন একমাত্র বাবাজী-ই এ বিপদে ভরসা। তিনি পাশের ঘরে রয়েছেন। তোকে তো খুবই স্নেহ করেন। যা না একবার। তাঁকে চেপে ধর গিয়ে।

নাতনী এসে চেপে ধরলেন। আজকের ঝড়-বাদল থামাতেই হবে। না হ'লে চলবে না।

যোগত্রয়ানন্দজী হেসে ফেললেন। বললেন,

ঝড় বৃষ্টিও চলবে। তোমার বিয়েতে কোনো বাধাও হবে না। এই ব্যবস্থাই বরং ভালো। কেমন ?

নীরবে বারান্দায় এসে দূর আকাশের দিকে তাঁকিয়ে মন্ত্র পড়লেন। সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হোলো প্রবল বর্ষণ। বর্ষণের শেষে কিছুক্ষণের মধ্যেই আকাশ সম্পূর্ণ মেঘমুক্ত হ'য়ে গেলো। সে রাত্রে আর এক ফোঁটাও বৃষ্টি পড়লো না।

নির্বিঘ্নে বিয়ের পাট চুকে গেলো।

সবাই বিস্মিত হ'য়ে গেলেন।

এক পশ্চিমদেশীয় সাধু এসেছেন কলকাতায়। তিনি এক দিন এলেন যোগত্রয়ানন্দজীকে দেখতে।

অনেকক্ষণ ধ'রে কথা হোলো। শেষে যোগত্রয়ানন্দজী হাত জোড় ক'রে সাধুজীকে অনুরোধ করলেন, মহারাজ, অনেক বেলা হয়েছে। আজ আপনি আমাদের আতিথ্য গ্রহণ করুন। আমার জন-কয়েক ভক্ত নিকটেই আছে। চলুন, সেখানেই আপনার আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা ক'রে দিই।

সাধুজী বললেন, আমি কোনও গৃহীর আতিথ্য গ্রহণ করিনে। এজন্যে আপনার চিন্তার কোনও প্রয়োজন নেই।

প্রয়োজন আছে ব'লেই বলছি, মহারাজ। আপনার জন্যে বড়ই দুর্ভাবনায় পড়েছি।

আমার ভাবনা আপনার ভাবতে হবে না।

সাধুজী কিছুতেই শুনলেন না।

তখন যোগত্রয়ানন্দজী দৃঢ়স্বরে বললেন, আপনি অবুঝের মত ব্যবহার করছেন। আমি স্পষ্টই লক্ষ্য করছি, একটা মারাত্মক ব্যাধি আপনার শরীরে প্রবেশ করেছে। এখন কিছুকাল আপনার বিশ্রাম একান্ত প্রয়োজন। ভালো চিকিৎসার দরকার।

সাধুজী হেসে চ'লে গেলেন।

দেখা গেলো, রাস্তার মোড় ফিরতে না ফিরতেই তিনি প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হ'য়ে অবসন্ন হ'য়ে পড়েছেন।

যোগত্রয়ানন্দজী ছুটে গেলেন। সাধুজীকে এক গৃহে নিয়ে এলেন। চিকিৎসা ও সেবার ব্যবস্থা করা হোলো। অসুখ মারাত্মক ধরণের বোঝা গেলো।

যোগত্রয়ানন্দজী রোজই তাঁকে দেখতে যান। ওষুধ পথ্যের ব্যবস্থা ক'রে আসেন। সেদিন খাবার ওষুধ ও মালিশের তেলের ব্যবস্থা ক'রে এসেছেন।

ঠাকুর ঘরে ব'সে যোগত্রয়ানন্দজী জপ করছেন।

হঠাৎ দৈববাণী শুনতে পেলেন, কে যেন তাঁকে বলছেন, শীঘ্রই যাও। অসুস্থ সাধুজীকে দেখে এসো। সেবকরা ভুল ক'রে তাঁকে মালিশের ওষুধ খাওয়াতে যাচ্ছে। খাওয়ালেই বিষক্রিয়ায় তিনি মারা যাবেন।

ছুটে এলেন যোগত্রয়ানন্দজী।

সাধুজী সেবকের হাত থেকে ওষুধ খেতে যাচ্ছেন, যোগত্রয়ানন্দজী দৌড়ে এসে তা কেড়ে নিলেন।

না না। এটা খাবার ওষুধ নয়। এটা মালিশের ওষুধ।

সাধুজী ভয়ানক রেগে গেলেন। তিনি উঠে ওষুধের শিশিটি ছুড়ে ফেলে দিলেন।

যোগত্রয়ানন্দজী দুঃখিত হ'য়ে বললেন, আপনি বৃথাই রাগ করছেন। ভুল ক'রে আপনাকে মালিশের ওষুধ দেওয়া হচ্ছে। ঠাকুর এ কথা আমায় স্পষ্টই জানিয়ে দিলেন। তাই ছুটে এসেছি। আর একটু বিলম্ব হ'লেই আপনাকে বাঁচানো যেতো না।

সাধুজী এতক্ষণে সব বুঝলেন। তাঁর চৈতন্য হোলো। তিনি অনুতপ্ত হ'য়ে ক্ষমা চাইলেন।

আপনাকে এতদিন চিনি নি। এখন চিনতে পেরেছি।

সাধুজী যোগত্রয়ানন্দজীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন।

কলিকাতার এক ইঞ্জিনিয়ার।

তাঁর বৃদ্ধা মা রয়েছেন। তিনি যোগত্রয়ানন্দজীর বড়ই অনুরক্ত। যোগত্রয়ানন্দজীর উপর তাঁর অগাধ বিশ্বাস।

বৃদ্ধা তখন হৃদ্‌রোগে ভুগছেন। ডাক্তার বলেন, যে কোনও সময়ে অসুখ বাড়তে পারে। আর, এর ফলে মৃত্যুও হ'তে পারে। এঁর আদৌ নড়াচড়া করা উচিত নয়।

বৃদ্ধা যোগত্রয়ানন্দজীকে বললেন, বাবা, আমার তো এই অবস্থা। ডাক্তার কোথাও যেতে দেয় না। আমার কিন্তু বড় ইচ্ছে, কয়েকটা তীর্থ-দর্শন ক'রে আসি। আরও ইচ্ছে, বাবা, কাশীতেই যেন আমার মরণ হয়।

যোগত্রয়ানন্দজী হেসে বললেন, বেশ, তাই হবে। আপনার তীর্থ দর্শন হবে। কাশীতেও মৃত্যু হবে। তবে একটা শর্ত আছে।

বাবা, কি শর্ত ?

আমি যে যে জায়গায় যেতে বলবো, কেবল সেই সেই জায়গাতেই যাবেন। যেখানে যেখানে যেতে নিষেধ করবো, সেখানে যাবেন না। সেখানে গেলে কিন্তু বিপদ হবে।

বৃদ্ধার অটুট বিশ্বাস যোগত্রয়ানন্দজীর কথায়।

ডাক্তারদের কোন কথা তিনি শুনলেন না। রওনা হলেন। কয়েকটা তীর্থও দেখলেন। তবে ঝোঁকের বশে মস্ত একটা ভুল ক'রে

বসলেন। যোগত্রয়ানন্দজী বলেছিলেন, গীর্ণার পাহাড়ে যাবেন না। উৎসাহের আধিক্যে বৃদ্ধা সে কথা ভুলেই গিয়েছেন। উঠলেন গিয়ে পাহাড়ে। সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হোলো হৃৎপিণ্ডের তীব্র যন্ত্রণা আর স্পন্দন।

ঘেমে উঠেছে সারা দেহ। পা দুটো গিয়েছে অসাড় হ'য়ে।

বৃদ্ধা কাতরে যোগত্রয়ানন্দজীকে ডাকতে লাগলেন।

বাবা, তোমার কথা না শুনে মহা অন্যায় করেছি। কৃপাময় তুমি, আমায় ক্ষমা কর। এ বারটি আমায় বাঁচাও। তা ছাড়া, বাবা, তুমি তো বলেইছো, কাশীতে আমার মৃত্যু হবে। এই গীর্ণার পাহাড়ে মরণ হ'লে তোমারই দুর্নাম রটবে। আমাকে বাঁচাও।

বৃদ্ধার কাতর কান্না যোগত্রয়ানন্দজীর কানে গেলো।

বৃদ্ধা দেখলেন, এক গৌরকান্তি প্রৌঢ় সাধু, দেখতে অনেকটা যোগত্রয়ানন্দজীর-ই মত, তাঁর পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। তাঁকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন। আশ্বস্ত করছেন। সাধু তাঁকে কোলে ক'রে পাহাড়ের উপরকার মন্দির আর যা যা দেখবার আছে সবই দেখালেন। তারপর কোলে ক'রেই নীচে নামিয়ে আনলেন।

নীচে নেমে এলেই বৃদ্ধার অবস্থা ভালো হ'য়ে উঠলো। তিনি নিরাপদে কলকাতায় ফিরে এলেন।

যোগত্রয়ানন্দজী এই কথায় বলেছিলেন, আসল কথাটা কি জানো, ভগবান হচ্ছেন বিশ্বরূপ-স্বরূপ। তাঁর যে ভক্ত যে রূপে তাঁকে দর্শন করতে ইচ্ছে করে, সেই রূপেই ভগবান তাঁকে দর্শন দেন। গুরুদেবকে ঈশ্বর-জ্ঞান করাই শাস্ত্রের উপদেশ। বৃদ্ধা তা-ই করেছিলেন। আমি তো পাষাণ। কিন্তু পাষাণেও ভক্তির জোরে ভগবানের প্রকাশ ঘটে।

কলকাতায় এলে বৃদ্ধার অসুখ আবার বাড়ে। তিনি কাশী যাবার জন্যে অস্থির হ'য়ে পড়লেন।

যোগত্রয়ানন্দজী বললেন, যে যাই বলুন, কোনও ভয় নেই। আপনি কাশী চ'লে যান।

বৃদ্ধা কাশী এলেন।

সেখানেই তাঁর মৃত্যু হোলো।

তুই না গেলে আমি কাশী যাবো না। যদি মরতেই হয় তোর সামনেই মরবো। তুই-ই আমার কাশীধাম।

একথা বলেছিলেন রাজেন বাবুর মা যোগত্রয়ানন্দজীকে।

এই মহিলাই যোগত্রয়ানন্দজীর মাকে নিয়ে প্রথমবার কাশীযাত্রার সময় একশো টাকা দিয়েছিলেন।

যোগত্রয়ানন্দজী বলেছিলেন, আপনি এখন যান। আমি পরে যাবো।

যোগত্রয়ানন্দজী কদাচ মিথ্যা বলেন না। এই বিশ্বাসে রাজেন বাবুর মা কাশী গেলেন।

চার মাস পার হোলো। কৈ, শশী তো এলো না।

এদিকে তাঁর অসুখও বাড়তে লাগলো।

জেদাজেদি ক'রে রাজেন বাবুর মা আবার বালীতে ফিরে এলেন।

অসুখ বেশী।

রাজেন বাবু যোগত্রয়ানন্দজীকে বললেন, দাদা, বলে দিন আর ক'দিন মায়ের কষ্ট-ভোগ আছে? কবে মাকে গঙ্গাতীরে নিয়ে যেতে পারবো?

যোগত্রয়ানন্দজী গম্ভীর হ'য়ে মৃত্যুর দিন ও ক্ষণ ব'লে দিলেন।

তাঁর কথায় আর মাত্র তিন দিন বাকী।

রাজেন বাবু মাকে গঙ্গাতীরে নিয়ে এলেন। অবিরাম নাম-গান চলতে লাগলো।

আজ মহাযাত্রার দিন।

যোগত্রয়ানন্দজী ব'লে দিয়েছেন, রাত্রি সাড়ে আটটার সময় দেহত্যাগ হবে।

আটটা তো বেজে গেলো! কৈ, দাদা তো এলেন না!

মায়ের যে বড় সখ, দাদার সামনেই তাঁর মরণ হোক।

রাজেন বাবু অধীর আগ্রহে ছটফট করছেন, এখনও দাদা এলেন না। তাইতো কি করি? মায়ের অন্তিম কামনা পূর্ণ হবে না!

উতলা হ'য়ে রাজেন বাবু দাদা, দাদা ব'লে চীৎকার করতে লাগলেন।

দূর থেকে জবাব এলো, ওরে, এই তো এয়েছি।

যাক, বাঁচা গেলো! মায়ের ইচ্ছা পূর্ণ হোলো।

ঠিক সাড়ে আটটার সময় রাজেন বাবুর মা যোগত্রয়ানন্দজীকে সামনে বসিয়ে তাঁকে দেখতে দেখতে দেহত্যাগ করলেন।

যোগত্রয়ানন্দজী তখন রয়েছেন বরানগরে।

সেদিন রাতে পাশের জেলে পাড়ায় আগুন লেগেছে।

এক জেলেনী রাতে রান্নার শেষে কতকগুলো ভিজে ঘুঁটে উনুনের পাশে রেখে দিয়েছিল।

রাত হয়েছে। সবাই পড়েছে ঘুমিয়ে।

হঠাৎ ঘুঁটেগুলো জ্ব'লে ওঠে। তারপর সেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে।

শুধু সেই ঘরখানিই নয়। পাশের সব ঘরই বুঝি পুড়ে ছাই হ'য়ে যায়। যায় বুঝি গরীব জেলেদের যথা-সর্বস্ব!

রাতে ঘর থেকেই যোগত্রয়ানন্দজী সেই আগুন দেখলেন। নিমেষে তাঁর মন দুঃখে ব্যথিত হ'য়ে উঠলো।

ঘরের সামনে নর্দমার পাশে কয়েক বালতি জল ছিল।

যোগত্রয়ানন্দজী তখনই একজনকে জাগিয়ে বললেন,

ওরে, বালতিগুলোর জল নর্দমায় এক্ষুনি ঢেলে ফেলে দে তো।

কথামত সব জলই নর্দমায় ফেলে দেওয়া হোলো।

ব্যাপার কি, কেন বালতির জল নর্দমায় ফেলে দিতে বললেন, কেউ-ই তা বুঝলো না। জিজ্ঞাসা করতেও সাহস হোলো না কারও।

পরদিন সকালে সবাই বলাবলি করতে লাগলো।—

সে এক আশ্চর্য ব্যাপার! আগুন জ্বলছে দাউ দাউ ক'রে! সে কী আগুনের তেজ! হঠাৎ কোথা থেকে কি যে হোলো, আগুন হঠাৎ নিভে গেলো! যেন ম্যাজিক হোলো?

যোগত্রয়ানন্দজী শুনে হাসলেন।

সে হাসি দেখে সাহস পেয়ে একজন ভক্ত জিজ্ঞাসা করলেন, বাবা, হাসছেন যে! তবে আপনিই কি আগুন নিভিয়েছেন?

যোগত্রয়ানন্দজী হেসেই বললেন, ওরে, ওই জন্যেই তো তোকে বালতির জল নর্দমায় ফেলতে বলেছিলুম।

তবে কি এই জন্যেই আগুন নিভেছে?

যোগত্রয়ানন্দজী কথা কইলেন না। শুধু হাসলেন মাত্র।

দিন এগিয়ে চলেছে।

যোগত্রয়ানন্দজীর কৃচ্ছ্রসাধন ও ভজন বেড়েই চলেছে।

তবুও এই সময়ে তিনি মাত্র এক মাসের পরিশ্রমে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য দর্শন-বিজ্ঞান-সম্বলিত পাঁচশো পৃষ্ঠায় মানবতত্ত্ব নামে এক খানা বই লিখলেন।

বই খানা প'ড়ে ভারতের অদ্বিতীয় সার্জন ডঃ সুরেশপ্রসাদ সর্বাধিকারী চিঠি লিখলেন যোগত্রয়ানন্দজীকে।—

এত পরিশ্রম করিবেন না। ভবাদৃশ মহাত্মাদিগের সুস্থ থাকা এ পাপ পৃথিবীর নিতান্তই প্রার্থনীয়।

মানবতত্ত্ব বইখানি প'ড়ে বল্লভদাস নামে একজন ধনী ব্যক্তি যোগত্রয়ানন্দজীকে দেখতে এলেন। তাঁকে প্রণাম ক'রে বললেন, আপনার মানবতত্ত্ব প'ড়ে আমার ইচ্ছে হয়েছে, আপনার জন্যে কিছু করি। আমার অনেক টাকা আছে। দুই ছেলেকে বারো লাখ টাকা দিয়ে বাকী দুই লাখ টাকা দান করতে চাই। আপনি যদি কৃপা ক'রে ষাট হাজার টাকা গ্রহণ করেন, তাহ'লে আমি কৃতার্থ হবো।

যোগত্রয়ানন্দজী সে দান গ্রহণ করতে সম্মত হলেন না।

যোগত্রয়ানন্দজী বলতেন, এ সব হওয়া আশ্চর্য কিছুই নয়। এ সব বিভূতি। ভগবানের চরণ ছাড়া, অন্য কিছু কখনও চাই নি। তাই ওই সব তুচ্ছ সামগ্রীতে আমার কোনও প্রয়োজন নেই।

মানবতত্ত্ব প্রকাশের পর যোগত্রয়ানন্দজী প্রকাশ করলেন পরলোক। এ-ও একখানি অমূল্য গ্রন্থ।

বইখানি প'ড়ে বাগবাজারের প্রসিদ্ধ ধনী নন্দলাল বসু ছোট ধুতি প'রে খালি গায়ে কাঁধে একখানি গামছা ফেলে নিজের গাড়ী ক'রে যোগত্রয়ানন্দজীর বাসায় এসে উপস্থিত হলেন।

দাদা গো, এ জ্ঞান তুমি কোথায় পেলে? তোমার পরলোক প'ড়ে আমি মুগ্ধ হয়েছি! অবাক হয়েছি! কী অদ্ভুত জ্ঞান! এ কি মানুষের পক্ষে সম্ভব!

যোগত্রয়ানন্দজীর পায়ে প'ড়ে তিনি বললেন, আমি আজ হরিদ্বার যাত্রা করছি। ফিরে এসে তোমার যত বই ছাপা হবে সব খরচ আমি দেবো।

দুর্ভাগ্যক্রমে সেবারই নন্দবাবুর হরিদ্বারে দেহত্যাগ হোলো।

যোগত্রয়ানন্দজী তখন বুড়ো শিবতলায় মন্মথ স্মৃতিরত্নের বাড়ীতে উঠে এসেছেন। বাড়ী গঙ্গার একেবারেই পাশে।

সেদিন নাট্যসম্রাট্ গিরিশ ঘোষ মশাই যোগত্রয়ানন্দজীর পাশে ব'সে আছেন।

হঠাৎ কালীকৃষ্ণ ঠাকুর সেখানে উপস্থিত হলেন।

যোগত্রয়ানন্দজীকে দেখে ভক্তি-ভরে প্রণাম ক'রে কালীকৃষ্ণ বললেন, জগতের মধ্যে যদি কাউকেও ভক্তি করি তো আপনাকে!

কিছুক্ষণ কথা বলার পর কালীকৃষ্ণ চ'লে গেলেন।

গিরিশচন্দ্র বললেন, কলিকালে ব্রাহ্মণ দেখলাম বটে। আপনার কথা সত্যে পরিণত হোলো।

প্রায় বারো বছর আগে কালীকৃষ্ণ এক সময়ে বিনা কারণে উত্তেজিত হ'য়ে যোগত্রয়ানন্দজীর প্রতি অসন্তুষ্ট হন। সেই সময় গিরিশচন্দ্র যোগত্রয়ানন্দজীকে বলেছিলেন, কালীকৃষ্ণ ঠাকুর বড় কড়া লোক। তিনি আর কখনও আপনার কাছে আসবেন না।

এই কথা শুনে যোগত্রয়ানন্দজী জোর দিয়ে বলেছিলেন, আমি যদি প্রকৃতই নিরপরাধ ব্রাহ্মণ হই, তা হ'লে বারো বছরের মধ্যে নিশ্চয়-ই কালীকৃষ্ণ ঠাকুরকে আমার কাছে আসতে হবে।

আজ সেই পুরানো কথা গিরিশচন্দ্রের মনে জেগে উঠেছে।

যোগত্রয়ানন্দজীর পরম ভক্ত কালীপদ মুখোপাধ্যায়। তিনি ছিলেন মুনসেফ্।

কালীপদ বাবুর কনিষ্ঠ পুত্র গোপীকিশোর।

গোপীকিশোরকে যোগত্রয়ানন্দজী অত্যন্ত স্নেহ করতেন। তিনি যোগত্রয়ানন্দজীর একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন। যোগত্রয়ানন্দজীর নির্দেশ ছাড়া তিনি কোনও কাজই করতেন না।

আসন্ন মৃত্যুর সময় গোপীকিশোর যোগত্রয়ানন্দজীকে বলেছিলেন, মৃত্যুকে আমি ভয় করি নে। আপনার শ্রীচরণ ছাড়া হ'য়ে থাকবো এই জন্য মনে দুঃখ আসছে।

যোগত্রয়ানন্দজী বললেন, আমি তো শীঘ্রই যাচ্ছি। আর বেশী দিন নয়। এই কটা দিন, তুমি পথে একটা স্থানে অপেক্ষা করবে। ভগবানের ধ্যান করবে। তারপর আমি যাবার সময় তোমাকে সেখান হ'তে রামলোকে নিয়ে যাবো।

গোপীকিশোরের মৃত্যুতে যোগত্রয়ানন্দজী তাঁর পিতাকে লিখলেন—গোপীকে আপনি হারান নাই। একদিন আমার এই কথার মূল্য কত, তাহা বুঝিবেন। গোপী হইতে আপনি যে নিত্য পদে প্রতিষ্ঠিত হইবেন, সদানন্দময়-ভবনে চিরদিনের গোপীধনের সহিত বাস করিবেন, মা যে কত দয়াময়ী, মা যে আপনার কত ভাল করিয়াছেন, একদিন তাহা জানিতে পারিবেন।

গোপীকিশোরের মৃত্যুর পর যোগত্রয়ানন্দজী কাশী যাবার মনস্থ করলেন।

শেষ জীবনে তিনি কাশীধামে বাবা বিশ্বনাথের কাছেই থাকবেন। সব কাজকর্ম পরিত্যাগ ক'রে মন প্রাণ তাঁরই চরণে সমর্পণ ক'রে চরম সিদ্ধিতে তিনি উপনীত হবেন।

লোক-শিক্ষা তো অনেক দেওয়া হয়েছে। আতুর ও অনাথ দরিদ্রদের সেবা, সে-ও তো অনেক করা গেলো। আর কেন?

এখন যোগত্রয়ানন্দজী খুবই ক্লান্ত। দেহ মন প্রাণ অবসন্ন-প্রায়। এবার যেতে হবে।

প্রভু, আমার 'আমি'-কে তোমার চরণকমলে স্থান দাও। আমি যেন 'আমার' না হ'য়ে তোমার চরণে 'তোমার' হ'য়ে চিরতরে বিলীন হ'তে পারি।

১৩১৩ সালের ৭ই জ্যৈষ্ঠ কাশী যাবার দিন ঠিক হোলো। ছয় সিন্ধুক বই ও বিভিন্ন শাস্ত্রগ্রন্থ রয়েছে। এর উপর বৃহৎ পরিবারের জিনিসপত্রও আছে।

যোগত্রয়ানন্দজীর আজ আর কোনও কিছুর-ই প্রয়োজন নেই। সব প্রয়োজন ফুরিয়ে গিয়েছে। মৃত্যুর সময় মানুষ যেমন নিঃসঙ্গ হ'য়েই যাত্রা করে, যোগত্রয়ানন্দজী ঠিক তেমনি ভাবে বিশ্বনাথের চরণে স্থান নেবেন।

নিজের লেখা সমুদয় গ্রন্থ গঙ্গায় বিসর্জন দেবেন সঙ্কল্প করলেন। তা টের পেলেন কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের জামাতা বিমলা চট্টোপাধ্যায়। তিনি সব বই-ই কালীকৃষ্ণের পাথুরেঘাটায় বাড়ীতে নিয়ে গেলেন। অন্যান্য মালপত্রও যোগত্রয়ানন্দজী নিয়ে যেতে চান না জেনে ভক্ত শঙ্করলাল ক্ষেত্রী ঐ সব নিয়ে কাশী রওনা হলেন।

কাশী তো চললেন। সংসার চলবে কি ক'রে?

জীব দিয়েছেন যিনি, আহার জোগাবেন তিনি। ভয় কি? ভাবনা কেন?

যোগত্রয়ানন্দজী কাশী এলেন। এলেন কপর্দকহীন অবস্থায়। সঙ্গে গোটা পরিবার।

কাশীতে দিন কাটতে লাগলো।

সম্পূর্ণ অযাচকভাবে কাশীতে দিন কাটতে লাগলো। যোগত্রয়ানন্দজী ভোর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত রুদ্ধ কক্ষে যোগ সাধনায় মগ্ন থাকেন।

যখন বাইরে আসতেন তখন ভাবে বিভোর হ'য়ে বাবা বিশ্বনাথকে দর্শন করতেন। পরে জ্ঞানগঙ্গার ধারে উপস্থিত হ'য়ে নৌকোয় ব'সে রাম নাম করতেন।

একটু রাত হ'লে গঙ্গাস্নান ক'রে ফিরতেন বাসায়।

সেদিন গভীর রাত্রি। চারদিকে ঘন অন্ধকার। সারা কাশী ঘুমে অচেতন।

যোগত্রয়ানন্দজীর চোখে কিন্তু ঘুম নেই। কি যেন পেতে চান, কি যেন আজ মিলবে।

মন চঞ্চল।

তখন ঠিক মহানিশা।

ছুটে এলেন দশাশ্বমেধ ঘাটে।

গঙ্গার জলধারা ঘন আঁধারের মধ্যেও দেখা যাচ্ছে।

যোগত্রয়ানন্দজী আজ আপন-হারা। আবেশে ব'সে রয়েছেন ঘাটে।

অকস্মাৎ আলোয় আলোময় হ'য়ে উঠলো সারা দশাশ্বমেধ ঘাট। গঙ্গার বারিধারা হোলো উদ্ভাসিত।

দিব্যভাবে আকাশ বাতাস পরিপূরিত। স্নিগ্ধ মাধুর্যের স্রোতে ধরিত্রী পরিপ্লাবিত।

যোগত্রয়ানন্দজী চোখ মেলে তাকালেন।

দেখলেন সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন স্বয়ং মা অন্নপূর্ণা। ভগবতী বিশ্বেশ্বরী।

দেবীর চোখে বাৎসল্যের দৃষ্টি। মুখখানি মমতায় মাখানো।

দেবী মৃদু হাসলেন। হাত তুলে আশীর্বাদ করলেন সন্তানকে।

যোগত্রয়ানন্দজী ভূমে লুটিয়ে পড়লেন। মা, মা!

সম্বিৎ হারালেন।

দেবী এই অবসরে অন্তর্ধান করলেন।

দুই চোখে অশ্রু নিয়ে ভাবাবিষ্ট যোগত্রয়ানন্দজী টলতে টলতে গৃহে ফিরে এলেন।

যোগত্রয়ানন্দজী এখন অহরহ গুরুবন্দনায় রত।

সেদিন যোগত্রয়ানন্দজী শ্রীরামচন্দ্রের পূজা শেষ ক'রে যোগ সাধনায় রত হয়েছেন। ধ্যান-ধারণায় কেটে গেলো রাত প্রায় দেড়টা পর্যন্ত।

বাইরে এলেন।

কেরে তুই এখানে মাটিতে প'ড়ে কাঁদছিস্? কি চাস্ তুই?

মামা, আমি।—কেঁদে ফেটে পড়লো যোগত্রয়ানন্দজীর বিধবা ভাগ্নী আনন্দময়ী।

কাঁদছিস্ কেন রে? কী হয়েছে?

মামা, আর কিছু চাইনে। শুধু একটিবার আমার স্বামীকে দেখতে চাই।

কান্না থামে না।

বেশ, তাই হবে। আয়, ঘরে আয়।

দুজনে ঘরে ঢুকলেন।

চুপ ক'রে এখানে ব'সে স্বামীকে চিন্তা কর। ভয় করিস্ নে।

আনন্দময়ী স্বামীর চিন্তায় মগ্ন হলেন।

রাত প্রায় আড়াইটে।

সাধক যোগত্রয়ানন্দজী তখন সমাধিস্থ।

সহসা জানালা দিয়ে এক সূক্ষ্মদেহী পুরুষ ঘরে প্রবেশ করলো।

সে মূর্তি ঘরে ঢুকে যোগীবরকে প্রণাম করলো।

তারপর আনন্দময়ীর সম্মুখে বসলো।

প্রায় একঘণ্টা কেটে গেলো এইভাবে। এই এক ঘণ্টা আনন্দময়ী স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

মুখে একটি কথাও সরলো না। চোখ দিয়ে শুধু বিন্দু বিন্দু জল ঝরতে লাগলো।

অশরীরি মূর্তি যোগীবরকে প্রণাম ক'রে সেই জানালা পথেই অদৃশ্য হয়ে গেলো।

আর কেন ব'সে আছিস, মা। রাত শেষ হ'য়ে এলো। এইবার শুতে যা।

উৎসব-সম্পাদক মহামনীষী রামদয়াল মজুমদার তখন কাশীতে থাকেন। অধ্যাত্মজগতে তিনি সুপরিচিত।

মজুমদার মশাই রোজই গঙ্গাভ্রমণে যান যোগত্রয়ানন্দজীর সঙ্গে।

তখন শীতকাল।

মজুমদার মশাই সেদিনও সঙ্গে রয়েছেন।

দুইজনে গঙ্গাভ্রমণে বেরিয়েছেন। তখন বিকাল।

পথের পাশে এক ভিখারী ছেঁড়া কাপড়ে দাঁড়িয়ে ছিল। কাছে এলে সে ভিক্ষা চাইলো কিছু।

যোগত্রয়ানন্দজী দেখলেন ভিখারী শীতে কাঁপছে। করুণা হোলো। তিনি নিজের কাঁধের পশমী আলোয়ানখানি তাকে দিয়ে দিলেন।

কয়েকদিন আগে এক ধনী ভক্ত এই দামী শালখানি যোগত্রয়ানন্দজীকে দিয়েছিলেন।

মজুমদার মশাই বললেন, এত দামী আলোয়ান না দিয়ে ওকে বাজার থেকে একটা গায়ের চাদর কিনে দিলেই হোতো।

যোগত্রয়ানন্দজী হেসে বললেন, ভগবান যদি দামী শীতবস্ত্র আমায় পরাতেই চান, তবে তো নিজেই কৃপা ক'রে পাঠিয়ে দেবেন। এ নিয়ে ভাববার কি আছে?

সেই দিনই গঙ্গা-ভ্রমণ ক'রে বাসায় ফিরে এলে যোগত্রয়ানন্দজীর হাতে তাঁর ছোটো ভাই একটি পার্শেল দিলেন।

দাদা, এটা কলকাতা থেকে এসেছে।

পার্শেল খুলে দেখা গেলো, এক ভক্ত শীতের ব্যবহারের জন্যে যোগত্রয়ানন্দজীকে একখানি মূল্যবান পশমী শাল উপহার পাঠিয়ে দিয়েছেন।

মজুমদার মশাই বিস্মিত হলেন।

কী আর বলবেন তিনি!

মহামহোপাধ্যায় যাদবেশ্বর তর্করত্ন তখন কাশীতেই থাকেন। মহামহোপাধ্যায় ডঃ গোপীনাথ কবিরাজকে তিনি খুবই স্নেহ করেন। ডঃ গোপীনাথ এদিকে যোগত্রয়ানন্দজীরও স্নেহধন্য।

তখন তর্করত্ন মশাই-এর ছেলে বৃন্দাবনের অসুখ।

সেদিন খুব বাড়াবাড়ি।

উপায়ান্তর না দেখে তর্করত্ন মশাই ডঃ গোপীনাথকে বললেন, চল, বাবাজীর কাছে যাই।

ডঃ গোপীনাথ জানেন, সকালে এই সময়ে তিনি দুয়ার বন্ধ ক'রে দীর্ঘ সময় ধ'রে সাধন-ভজন করেন। এই সময় তিনি কারও সঙ্গে দেখাশোনা করেন না। কেউ-ই তখন ঘরে ঢুকতে সাহস করে না।

ডঃ গোপীনাথ বললেন, বিকালে তিনি সকলের সঙ্গে দেখা করেন। তখন গেলেই তো ভালো হয়।

তর্করত্ন মশাই বললেন, অসুখ বড়ই বাড়াবাড়ি। এখনই না গেলে বিপদ হ'তে পারে।

দুজনে যোগত্রয়ানন্দজীর গৃহে এলেন। দেখলেন, যোগত্রয়ানন্দজীর প্রিয় ভক্ত সতীশ দরজায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

সতীশ বললেন বাবাজী তাঁকে বলেছেন, কিছুক্ষণের মধ্যেই গোপীনাথ আর তর্করত্ন মশাই এখানে আসবেন। বৃন্দাবনের অসুখ

খুব বেশী। দেখো, ওঁরা যেন ফিরে না যান। তুমি নীচে গিয়ে অপেক্ষা করো। আমি ওঁদের জন্যে প্রতীক্ষা করবো। আর একলা থাকবো। যদিও আমি এ সময়ে কারও সঙ্গে দেখা করিনে, তবুও ওঁদের সঙ্গে দেখা করতেই হবে। কেউ যেন ওঁদের বাধা না দেয়।

তর্করত্ন মশাই প্রণাম করলেন যোগত্রয়ানন্দজীকে।

যোগত্রয়ানন্দজী বললেন, গতরাত্রে ধ্যান করবার সময় দেখলাম, বৃন্দাবনের অবস্থা সঙ্কটজনক। আপনি পরম উৎকণ্ঠার মধ্যে আছেন। আপনারা আসবেন, তা-ও জানতে পারলাম। তাই সতীশকে ব লে রেখেছি।

তর্করত্ন মশাই বাবাজীর আশীর্বাদ ভিক্ষা করলেন।

তিনি কৌতূহলী হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলেন, বাবাজী, এসব কি আপনার যোগাভ্যাসের ব্যাপার ?

যোগত্রয়ানন্দজী বললেন, যোগশক্তি ছাড়া আর কি ? হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয়ের যোগ স্থাপিত হ'লে স্বভাবত এই রকমই ঘ'টে থাকে। তখন দূরকেও নিকটে দেখা যায়, ভবিষ্যৎকেও বর্তমানরূপে জানা যায়।

কিছুক্ষণ মৌনী থেকে যোগত্রয়ানন্দজী বললেন, আপনি বৃন্দাবনের জন্যে আর চিন্তা করবেন না। আপনারা বাড়ী ফিরে গেলেই দেখতে পাবেন, তার অসুখ অনেকটা ভাল হয়েছে।

তর্করত্ন মশাই বাড়ী ফিরে এসে দেখলেন, বৃন্দাবনের অবস্থা দ্রুত উন্নতির দিকে।

দুই একদিনের মধ্যেই সে সুস্থ হ'য়ে উঠলো।

যোগত্রয়ানন্দজী প্রায়ই ভক্তদের বলতেন,—

সাধন জীবনের উন্নতি সাধন করতে হ'লে আন্তরিক বিশ্বাস থাকা চাই। এই বিশ্বাসের ভিত্তি দৃঢ় না হ'লে যুক্তি-তর্কের সাহায্যে এ পথে এগুনো যায় না। ছাখো, বিশ্বাসের বলে সবই হ'তে পারে। যা লৌকিক দৃষ্টিতে অসম্ভব ব'লে মনে হয়, বিশ্বাসের বলে তা-ও

অনায়াসে সম্ভব হ'তে পারে। কি ভাবে কোন শক্তি বলে কোন কাজ হয়, তা সাধারণ লোক বুঝে উঠতে পারে না।

১৯২৫ সাল।

যোগত্রয়ানন্দজী বললেন, এবার বিরতির পালা। শিবের কিঙ্কর, রামের কিঙ্কর, শিবরামকিঙ্কর এবার থেকে ভাববে শুধু কৈঙ্কর্যের কথা। আর, মুখে শুধু জপবে তাঁর নাম। সুধামাখা নাম।

ফিরে এসেছেন বরানগরে। রয়েছেন দে মশায়ের উদ্যানবাটিতে।

যোগত্রয়ানন্দজী একদিন ভক্তদের ডেকে বললেন,

ছাখো কাশী, কাঞ্চী, অযোধ্যা সবই রয়েছে পবিত্র এই গঙ্গাতীরে। কাজ নেই আর তীর্থবাসে। সকল তীর্থ রয়েছে এখানে। ঘোর কলির প্রকোপে প্রায় সব তীর্থেই পাপ প্রবেশ করেছে। কাজ নেই আর কাশী অযোধ্যায় যাত্রা ক'রে। শ্রীগুরুবাবার শ্রীপাদপদ্মই সর্বতীর্থ-সার। এখন থেকে ঐ পবিত্র চরণ আশ্রয় ক'রেই জীবন সার্থক করবো।

সর্ব কর্ম পরিত্যাগ ক'রে তিনি স্বরচিত শ্রীরামচন্দ্র স্তোত্র আবৃত্তি করেন অহরহ আর শ্রীগুরুপদ চিন্তা করেন।

ভজ রামপদং নরকান্ত করং
জয় কামরিপুং বিষমং কুটিলম্।
পিব শান্তিসুধাং সততং বিমলাং
যদি কাংক্ষসি মোক্ষপদং সুগমং ॥
ভজ রামপদং ॥

কুরু কোপরিপুং মতি তাপ করং
দম বৃত্তি ভৃতা মনসা দমিতং।
স্মর দাশরথিং ভববোধ করং
যদি চেচ্ছসি শান্তি সুখং দয়িতং ॥
ভজ রামপদং ॥

দল লোভরিপুং বিষয়াভিমুখং
নর মাধব পাদরতিং হৃদয়।
জপ রাঘব নাম সদালপনে
যদি চেচ্ছসি নিত্যসুখং সুলভং॥
ভজ রামপদং॥

ভব তারণ কারণ রামপদং
হৃদি চিন্তয় বিশ্বভূতং নিয়তং।
কুরু মোহরিপুং নিজবোধ জিতং
যদি মোক্ষ সুখে রতিরস্তি তদা॥
ভজ রামপদং॥

... ...

রামভক্ত যোগত্রয়ানন্দজী ক্ষুধাতৃষ্ণা ত্যাগ ক'রে দিবারাত্র সাধ্যমত রাম নামই গাইতে লাগলেন।

যোগত্রয়ানন্দজী আতুর সন্ন্যাস গ্রহণ করেছেন।

অনিদ্রায় ও অসময়ে সামান্য আহারে তাঁর স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙ্গে গেলো।

না, আর ওষুধ নয়। এখন শুধু গঙ্গাজল। গঙ্গাজল। পবিত্র গঙ্গাজলই এখন একমাত্র মহৌষধি।

দিন যেতে লাগলো।

একদিন তিনি ভক্তদের বললেন, যেখানে শ্রীগুরু বাবাকে গঙ্গাগর্ভে জলসমাধি দেওয়া হয়েছিল, দেহত্যাগ করলে সেখানেই এই অসার দেহটাকে বিসর্জন দিও।

ভক্তরা কেঁদে ফেললেন।

বাবা, আরও কিছুদিন থাকলে হোতো।

না না। কোথায় থাকবো, কি খাবো? আমায় যেতে-ই হবে। শ্রীগুরু বাবার চরণে আশ্রয় নেওয়া ছাড়া, আমার আর কোথাও স্থান নেই। আমার আর কিছু ভালো লাগছে না। আমায় শীঘ্রই যেতে হবে।

যোগত্রয়ানন্দজী আহার নিদ্রা ত্যাগ করলেন।
মধ্যে মধ্যে শুধু পবিত্র গঙ্গাজল পান করেন।
কেউ-ই তাঁকে নিবৃত্ত করতে পারলো না।

প্রায় একমাসকাল উপবাসী থাকার পর ১৩৩৪ সালের ২৫শে আশ্বিন, ১৯২৭ সালের ১২ই অক্টোবর বুধবার যোগত্রয়ানন্দজী সমাধিস্থ হলেন।

যখন রাত্রি প্রায় দুটো সেই সময় তাঁর সমাধি ভঙ্গ হোলো।

গঙ্গাতীরে শুয়ে ছিলেন পুত্র ইন্দুভূষণ।

হঠাৎ কে যেন তাঁকে জাগিয়ে দিয়ে চুপি চুপি বললেন, শীঘ্র বাবার কাছে যাও।

ছুটে এলেন ইন্দুভূষণ।

ঈশারায় যোগত্রয়ানন্দজী পুত্রকে বললেন, আমায় গঙ্গাগর্ভেই নিয়ে চলো।

আনা হোলো গঙ্গাগর্ভে।

গঙ্গাজল স্পর্শ ক'রে যোগত্রয়ানন্দজী কুম্ভক বায়ু গ্রহণ করলেন। রাত্রি আড়াইটার সময় সেই কুম্ভক বায়ু ত্যাগ ক'রে পবিত্র গঙ্গাগর্ভেই তিনি করলেন দেহত্যাগ।

পরদিন বেলা দুটোর সময় যোগত্রয়ানন্দজীর পবিত্র দেহ পুষ্প চন্দনে চর্চিত ক'রে কাঠের সিন্ধুকে রেখে বেলুড় মঠের কাছে গঙ্গা-গর্ভে যেখানে শ্রীগুরু বাবার জল-সমাধি দেওয়া হয়েছিল, রাম-নাম গাইতে গাইতে ঠিক সেখানেই বিসর্জন দেওয়া হোলো।

চির সমাধিতে মগ্ন রইলেন মহাসাধক, মহাযোগী।

ঋষিকল্প শিবরামকিঙ্কর যোগত্রয়ানন্দ।

সিদ্ধ কৃষ্ণদাস

সপ্তদশ শতাব্দীর কথা।

উড়িষ্যায় তখনও মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের অখণ্ড প্রভাব।

এই সময়ে উড়িষ্যায় সনাতন কানুনগো নামে একজন সম্ভ্রান্ত লোক বাস করতেন। চাষ বাস ক'রে সংসার চালান। অবস্থা সচ্ছল।

সনাতন একজন ভক্তিমান বৈষ্ণব। দেশের দশজনে তাঁকে শ্রদ্ধা ভক্তি করে।

প্রৌঢ় বয়সে তিনি মারা গেলেন। পত্নী 'সতী' হ'য়ে সহমরণে প্রাণত্যাগ করবেন সঙ্কল্প করলেন। তিনি ধর্মশীলা। পতিকে এতকাল দেবতাজ্ঞানই ক'রে এসেছেন।

সনাতনের স্ত্রী 'সতী' হ'তে চলেছেন। বহু লোক এসেছেন তাঁকে দেখতে। ধীরে ধীরে তিনি চিতায় উঠে বসলেন।

তাঁর তিন পুত্র। চিতায় আগুন দেবার পূর্বে তিনি তিন পুত্রকেই সস্নেহে কাছে ডাকলেন। তিনজনেরই মাথায় নিজ হাতে শিরোপা বেঁধে দিলেন।

প্রথম দুজনকে আশীর্বাদ করলেন, সব সময়েই ধর্মপথে থেকো। রেখো ঈশ্বরে অটুট বিশ্বাস। তবেই সুখে ও শান্তিতে ঘর-সংসার করতে পারবে।

তৃতীয় পুত্রের নাম বটকৃষ্ণ। তাকে বললেন, বাবা, তোমার স্থান গৃহে নয়। বৃক্ষতলই তোমার স্থান। বৃন্দাবনে যাবে। সেখানে সরল বৈষ্ণবের জীবন-যাপন করবে। থাকবে কাঁথা করঙ্গধারী হ'য়ে। নিজেকে দীনাতিদীন মনে ক'রে বৈষ্ণবদের সেবা করবে। তুমি মহাপ্রভুর কৃপা লাভ করবে।

বাবা ও মা একই চিতার অনলে দগ্ধ হলেন। বটকৃষ্ণ তা দেখলেন স্বচক্ষে।

দিন যায়।

বটকৃষ্ণ বড় হ'তে থাকেন। বড় দুই ভাই খুব ভালবাসেন তাঁকে। কিন্তু সুখ নেই। শান্তি নেই। গৃহে থাকতে ভালো লাগে না মায়ের অন্তিম কথা সর্বক্ষণ মনে জাগে—বৃন্দাবনে যাও। বৈষ্ণবের জীবন যাপন করবে।

কেটে গেলো আরও কয়েক বৎসর। সামান্য পড়াশুনাও ইতিমধ্যে করলেন বটকৃষ্ণ। কিন্তু কিছুই ভালো লাগে না। বৃন্দাবনে যাবার জন্যে ব্যাকুলতা বেড়েই চলে।

একদিন তাঁর জীবনে শুভলগ্ন এসে গেলো। বটকৃষ্ণ গভীর রাত্রে গৃহত্যাগ করলেন। হেঁটেই যাবেন বৃন্দাবনে।

বৃন্দাবনে যাবেন। বৈষ্ণব মহাজনদের সঙ্গ করবেন। তাঁদের সেবা করবেন। রাধাকৃষ্ণের চরণধূলি স্পর্শে পবিত্র ব্রজের রজে গড়াগড়ি দেবেন। তাঁর অন্তরে শুধু এই কামনা।—

আর কতদিনে পৌঁছুবো বৃন্দাবনে? কবে তোমার কৃপালাভ করবো প্রভু?

মায়ের অন্তিম আশীর্বাণী সম্বল ক'রে, মহাপ্রভুর শ্রীমুখপদ্ম চোখের সামনে রেখে বটকৃষ্ণ চলেছেন।

বটকৃষ্ণ বৃন্দাবনে এলেন।

শরণাপন্ন হলেন ব্রহ্মকুণ্ডবাসী বৈষ্ণব চরণদাস বাবাজীর। তিনি সানন্দে বটকৃষ্ণকে আশ্রয় দিলেন। সরল-শুভ্র পবিত্র মুখখানি দেখে অন্তরের সঙ্গে তাঁকে আশীর্বাদ করলেন।

বাবাজীর কাছেই বটকৃষ্ণের ভজন-শিক্ষা শুরু হোলো।

বাবাজী বটকৃষ্ণের নাম রাখলেন কৃষ্ণদাস।

কেটে গেলো আরও কয়েক বৎসর।

বাবাজী মহারাজ দেহরক্ষা করলেন।

বড়ই শোক পেলেন কৃষ্ণদাস। তাঁর ইচ্ছা হোলো, একবার জয়পুর

ঘুরে আসি। সেখানে গোবিন্দজীর বিগ্রহ স্থানান্তরিত হয়েছে। যাই, গোবিন্দজীকে দর্শন ক'রে আসি।

কৃষ্ণদাস জয়পুরে এলেন। দর্শন করলেন গোবিন্দজীকে।

অপূর্ব সুন্দর! নয়নভিরাম রূপ! দেখলেই কৃষ্ণদাস ব্যাকুল, বিহ্বল হ'য়ে পড়েন। চোখ দিয়ে জল ঝরে অঝোরে। ঠাকুর, ওগো ঠাকুর।··

কৃষ্ণদাস দেখেন গোবিন্দজীকে। আবার দেখেন। আবার দেখতে ইচ্ছে করে। সাধ আর মেটে না। ঠাকুর, ঠাকুর!···

কৃষ্ণদাস মন্দির অঙ্গনেই র'য়ে গেলেন।

দিন কাটিতে লাগলো।

যদি ঠাকুরের সেবা করবার সুযোগ পেতাম! প্রভু যদি কৃপা ক'রে অষ্টপ্রহরের জন্যেই সেবার ভার আমায় দিতেন! আহা, সে ভাগ্য কি আমার হবে? ঠাকুর, ঠাকুর!···

জয়পুরের মহারাজা স্থাপন করেছেন এই বিগ্রহ। তিনি ছাড়া, আর কেউ তো এ-ভার তাঁকে দিতে পারবেন না। কৃষ্ণদাস একজন সামান্য কাঙাল বৈষ্ণব। তিনি হলেন মহারাজা। তিনি কেন তাঁকে এই ভার দেবেন? প্রার্থনা করলেও বা শুনবেন কেন?

অধীর হ'য়ে পড়লেন কৃষ্ণদাস।

আহা! যদি সেবার ভার পেতাম! যদি সেবার ভার পেতাম!

ঠাকুর তাঁর প্রার্থনা কানে শুনলেন।

সেদিন মহারাজা এসেছেন গোবিন্দজীকে দর্শন করতে। হঠাৎ দৃষ্টি পড়লো কৃষ্ণদাসের 'পরে।

দীনাতিদীন। সরলতার প্রতিমূর্তি। স্থির অপলক দৃষ্টিতে গোবিন্দজীকে দেখছেন। চোখ দিয়ে জল ঝরছে ধারায় ধারায়। দেহে দেখা দিচ্ছে অষ্ট সাত্ত্বিক বিকার।

কে এই বালক?

মহারাজ ভাবলেন কৃষ্ণদাসকে। ধীরে ধীরে সব জানলেন।

বড় প্রসন্ন হলেন। কৃষ্ণদাসের 'পরেই দিলেন সেবার ভার।

আনন্দে কেঁদে ফেললেন কৃষ্ণদাস।

ঠাকুর, আমার প্রার্থনা তবে তোমার কানে পৌঁছেছে!

কেটে গেলো আরও দশ বছর। একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে, ভক্তির সঙ্গে কৃষ্ণদাস গোবিন্দজীর সেবা ক'রে চলেছেন।

সেদিন গোবিন্দজীর মন্দিরে মহারাজার লোকজন এসেছেন পূজো দিতে। বড় ঘটা ক'রেই পূজো হোলো।

পূজা শেষ হ'লে কৃষ্ণদাস প্রসাদ গ্রহণ করলেন।

এই প্রসাদ গ্রহণের পর থেকেই কৃষ্ণদাসের জীবনে নেমে এলো এক মহা বিপদ।

সেবায় উৎসর্গীকৃত এই পরম ভক্ত তীব্র কামবেগে আক্রান্ত হ'য়ে পড়লেন। প্রভু এ কী করলে!

কৃষ্ণদাসের বয়স এখন বছর ত্রিশেক। মহাভাবনায় পড়লেন তিনি। কৈ, তিনি তো কোনও অনাচার আজ পর্যন্ত করেন নি! একনিষ্ঠ হ'য়েই ভজন-সাধন ক'রে চলেছেন। মন প্রাণ দিয়ে ক'রে চলেছেন গোবিন্দজীর সেবা। কেন, তবে কেন এই অভাবনীয় দুর্বিপাক?

হায়, কেন এমন হোলো? কী করলে পাওয়া যাবে পরিত্রাণ?

কৃষ্ণদাস জয়পুর ত্যাগ করলেন। চ'লে এলেন ব্রজমণ্ডলের কাম্যবনে। শরণাপন্ন হলেন পরম বৈষ্ণব জয়কৃষ্ণদাস বাবাজীর।

জয়কৃষ্ণদাস আশ্রয় দিলেন কৃষ্ণদাসকে।

কৃষ্ণদাস অকপটে তাঁকে সব-ই জানালেন।

প্রভু, জীবনে জ্ঞানত কোনও অন্যায়ই তো আজ পর্যন্ত করিনি! চরণদাস বাবাজী যা যা শিক্ষা দিয়েছেন, বর্ণে বর্ণে, অক্ষরে অক্ষরে তা-ই পালন করবার চেষ্টা করেছি। কায়মনোবাক্যেই এতকাল গোবিন্দজীর সেবা ক'রে এসেছি। তবে কেন গোবিন্দজী আমায় এত কঠোর সাজা দিচ্ছেন, প্রভু?

কৃষ্ণদাস কেঁদে ফেললেন।

অধীর হোয়ো না, বাবা। একটা জীবন্ত গাছ কেটে জলে কিছুকাল ভিজিয়ে রেখে যদি তা' জ্বালাবার চেষ্টা করো, তবে তা কি পারবে? সেই গাছটাতে কি তক্ষুনি আগুন ধরবে? বাবা, গাছটা যতদিন না শুকনো হয় ততদিন যে ঠিকমত জ্বলবে না। তাই না, বাবা?

জীব জন্মাবধি তলিয়ে আছে সংসার-কূপের অথৈ জলে। বিষয়-মোহ ত্যাগ করিয়ে জীবকে তো শুকিয়ে নিতে হবে। তবে-ই তাতে ভক্তির আগুন জ্বলবে, বাবা। যিনি অশেষ কৃপা ক'রে সবাইকে বৈষ্ণব-ভজন শিক্ষা দিলেন, সেই শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং কী কঠোরভাবেই না সাধনা করেছেন! কী তীব্র ছিল তাঁর কৃচ্ছ্রসাধন! প্রচণ্ড শীতের মধ্যেও তিনি দিনে তিনবার স্নান করতেন। শয়ন করতেন ভূমিতে। এ-সবই তো জানো, বাবা।

কিন্তু আমার এই বিপদ হোলো যে মহাপ্রসাদ গ্রহণ করবার পর থেকেই। অথচ আমরা তো জানি, মহাপ্রসাদ চিন্ময় বস্তু। তবে এ দুর্দশা কেন হোলো আমার?

বাবা, এ বিষয়ে মহাপ্রভুর তো সুস্পষ্ট নির্দেশ-ই রয়েছে। বলেছেন, বিষয়ীর অন্নে হয় রাজস নিমন্ত্রণ। শোনো, মহাপ্রসাদ চিন্ময় হয় মহাপ্রভুর নিজের জিহ্বায়। আমরা অজ্ঞান জীব, সাধন-পথে চলবার চেষ্টা করছি মাত্র। আমাদের জিহ্বায় মহাপ্রসাদের স্বরূপ ধরা দেবে কেন? ঠাকুর চিন্ময় বিগ্রহ। তাঁর কাছে তো চিন্ময় ছাড়া আর কিছুই নেই, বাবা। তিনি স্বতন্ত্র পুরুষ। মহাসমর্থ তিনি। অগ্নিদেবের মতো সব কিছুই আত্মসাৎ করতে তিনি সক্ষম। আমরা অত শক্তিমান নই, বাবা। আমাদের ক্ষেত্রে তাই বিচার বিবেচনার প্রয়োজন আছে। ঠাকুরকে যে প্রসাদ নিবেদন করা হয় তা পরম ভক্তির সঙ্গে গ্রহণ করবো-ই। কিন্তু গ্রহণ করবো কণিকামাত্র। কথায় আছে না, প্রসাদ কণিকামাত্র। দেহের প্রয়োজন মিটানোর জন্যে পর্যাপ্ত প্রসাদ গ্রহণ করা উচিত নয়। তাতে বিপদ ঘটে।

প্রভু, আমি এখন কি করবো ?

ভয় নেই। তুমি ভক্ত। ভক্ত মাত্রেই প্রভুর বড় আপন জন। তাঁকে তিনি কখনই ডুবিয়ে, তলিয়ে দেন না। তোমায় স্বয়ং প্রভু-ই উদ্ধার করবেন। আজ থেকে তুমি দোমন বনে গিয়ে সাধন ভজন করতে থাকো। প্রভু কৃপাময়। তিনি অবশ্যই কৃপা করবেন।

কৃষ্ণদাস চ'লে এলেন দোমন বনে।

এখানে শুরু হোলো কৃষ্ণদাসের কঠোর সাধনা। দিনের অধিকাংশ সময় রাধাকৃষ্ণের ধ্যানে ও ভজনে কেটে যায়, খাওয়া দাওয়ার কথা মনেই আসে না।

এইভাবে চলতে চলতে তাঁর দেহ দুর্বল হ'য়ে পড়লো। দৃষ্টিশক্তি একেবারে ক'মে গেলো। অন্ধ হ'য়ে যাবার উপক্রম। ভিক্ষায় তিনি আর বেরোতে পারেন না।

ভজন কুটিরের পাশে ছিল এক কুণ্ড। কোনও রকমে তার জল একটু পান করেন মাত্র। শেষে এত দুর্বল হ'য়ে পড়লেন, সেখানকার জল পান করবার শক্তিও তিনি হারিয়ে ফেললেন।

তবুও কৃষ্ণদাসের সাধন-ভজন চলতে লাগলো। বাইরের আঁখি দুটি কমলাখি কেড়ে নিয়েছেন। কিন্তু ভিতরের আঁখি খুলে দিলেন কই ?

কৃষ্ণদাসের দিন কাটতে লাগলো এইরকম অস্বাভাবিক কৃচ্ছ্র-সাধনের মধ্য দিয়ে।

অবশেষে ব্রজেশ্বরী রাধারাণীর কৃপা হোলো।

সেদিন কৃষ্ণদাস ভাবে বিভোর হ'য়ে ভজন কুটিরে ব'সে রয়েছেন। অকস্মাৎ দিব্যভাবে চারিদিক পরিপূরিত হ'য়ে উঠলো। চারিদিকে আনন্দের প্লাবন। কৃষ্ণদাসের প্রাণেও তার তরঙ্গ এসে দোলা দিলো।

কৃষ্ণদাস শুনতে পেলেন নূপুরের শব্দ। নূপুর পায়ে কে যেন দূর থেকে নিকটে আসছেন। শেষে এসে দাঁড়ালেন তাঁরই সম্মুখে।

বাবাজী, এই প্রসাদ নাও। তোমার দুঃখ দেখে মাইজী পাঠিয়ে দিলেন। নাও, খেয়ে নাও।

কৃষ্ণদাস বুঝলেন এসেছেন এক নারী। না, নারী নয়, দেবী! তা নইলে দিব্যভাবে চারিদিক পরিপ্লাবিত হবে কেন? কথায় অমিয় ঝরবে কেন?

কৃষ্ণদাসের মনে আজ অপার আনন্দ। সে আনন্দ ধ'রে রাখতে পারেন হেন সাধ্য নেই। তিনি আনন্দস্রোতে ভেসে চললেন। ভেসেই চললেন।

নাও, প্রসাদ খাও।

মুখে কথা সরে না। আনন্দ কেড়ে নিয়েছে বাক্য।

কৃষ্ণদাস নিঃশব্দে প্রসাদ গ্রহণ করলেন।

বাবাজী, দিনরাত কেবল ভজন ক'রেই চলেছো। ভজনযন্ত্রটিকে জীইয়ে রাখতে হবে তো। তা না হোলে ভজন করবে কী ক'রে? বলি, গাঁয়ে ভিক্ষে করতে যাও না কেন?

আমি যে অন্ধ। চোখে দেখিনে।

তা বেশ তো। চোখ ভালো হোলে ভিক্ষেয় বেরুবে? বল, কথা দাও।

বেরুবো।

ছাখো, তোমায় অন্ধ দেখে মাইজী তোমার জন্মে আমার হাতে এই নেত্রাঞ্জন দিয়ে দিয়েছেন। তোমার চোখে আমি লাগিয়ে দিচ্ছি। দণ্ড দুই চোখ বুজে ব'সে থাকো। দেখবে, চোখ ভালো হ'য়ে গিয়েছে।

কৃষ্ণদাসের চোখে নেত্রাঞ্জন লাগিয়ে দিয়ে তিনি অন্তর্হিতা হলেন।

দুই দণ্ড পরে আবার নূপুরের শব্দ শোনা গেলো।

আবার এলেন সেই দিব্য-দর্শনা।

বাবাজী, চোখ মেলো। তাকাও। চোখ তোমার ভালো হয়েছে।

কৃষ্ণদাস চোখ মেলে তাকালেন। হ্যাঁ তাইতো! তাইতো! দৃষ্টিশক্তি সম্পূর্ণই ফিরে এসেছে! কিন্তু যিনি চোখ ভালো ক'রে দিলেন, হায়, তিনি কোথায়? তিনি কোথায়?

অকস্মাৎ সারা ভজন কুটির মধুর গন্ধে আমোদিত হ'য়ে উঠলো।

কোথা থেকে এলো এই মধুর গন্ধ ?

কৃষ্ণদাস কেঁদে ফেললেন।

দেখা দাও, দেখা দাও !

না খেয়ে, না ঘুমিয়ে কৃষ্ণদাসের কেটে গেলো তিন দিন। কোথায় সেই দিব্যদর্শনা ?

গভীর রাত্রি। কৃষ্ণদাস দেখলেন, তাঁর সম্মুখে এক আলোকপথ রচিত হ'য়ে গেলো। সেই আলোর পথ বেয়ে নেমে এলেন এক দেবী। তাঁর দিব্য আনন থেকে উৎসারিত হচ্ছে দিব্য আনন্দের স্রোত।

মধুর কণ্ঠে দেবী বললেন,

বৎস কৃষ্ণদাস, দুঃখ কোরো না। এই তো এলাম তোমার কাছে। আজ হ'তে আমি তোমার। তুমিও আমার। সখী ললিতা তাঁর করস্পর্শ দিয়ে তোমার দৃষ্টিশক্তি পুনরুদ্ধার করেছে। সেই সঙ্গে তুমি আমারও শক্তি লাভ করেছো।

বৎস, গোবর্ধনে যাও। প্রেম-সাধনার সহজপথ দেখিয়ে চলো সকল বৈষ্ণবকে। আজ থেকে তুমি সর্বক্ষণই আমার মাধুর্য রস উপভোগ করবে।

শ্রীমতী রাধারাণী এই কথা ব'লে অন্তর্হিতা হলেন।

কৃষ্ণদাস সিদ্ধ বৈষ্ণব হলেন। তাঁর অন্তর প্রেমে ভরপুর হোলো।

প্রেমোন্মত্ত অবস্থায় তিনি চ'লে এলেন গোবর্ধনে।

রাধাকুণ্ড ও গোবর্ধনের আশেপাশে এই সময়ে বহু বৈষ্ণব বাস করতেন। তাঁরা এক একজনে বড় পণ্ডিত। ভজনে সিদ্ধ। তাঁদের মধ্যে অনেকেই বৈষ্ণব শাস্ত্রে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করেছেন। তাঁরা অধিকাংশ সময় শাস্ত্রালোচনা ক'রে দিন কাটান।

কৃষ্ণদাসের ইচ্ছা হোলো, সংস্কৃত শিখবেন। বৈষ্ণবশাস্ত্র অধ্যয়ন করবেন। এক বৃদ্ধ বৈষ্ণবাচার্যের কাছে তিনি সংস্কৃত শিখতে শুরু করলেন।

কিন্তু গোল বাধলো। ব্যাকরণ বেশী পড়লে ভজনে বিঘ্ন ঘটে। ভজন বেশী করলে ব্যাকরণ পড়া হয় না। ব্যাকরণ না পড়লেও নয় ভাল ক'রে।

মহা সমস্যায় পড়লেন কৃষ্ণদাস। পড়লেন মহা দুশ্চিন্তায়। তিনি স্থির করলেন, কাজ কি এত চিন্তায়? যমুনার জলে প্রাণ বিসর্জন দিয়ে সকল দুশ্চিন্তার অবসান করি।

গভীর রাতে ললিতা এলেন।

বৎস কৃষ্ণদাস, কেন বৃথা চিন্তা করছো? কেন তোমার এই অনুতাপ? শাস্ত্রের তত্ত্ব একান্ত গূঢ়, অনন্ত। এ তত্ত্ব ধরা দেয় সিদ্ধ সাধকের অধ্যাত্ম-সত্তায়। এ জন্যে তুমি যমুনার জলে প্রাণ বিসর্জন দেবার মতলব করেছো? আমার আশীর্বাদে আজ থেকে তোমার ভিতরে শাস্ত্রতত্ত্ব স্বতই স্ফুরিত হবে। নিশ্চিন্ত হও। বহু লোকের কল্যাণ হবে তোমার মাধ্যমে। তোমার মাধ্যমেই বৈষ্ণব সাধকদের কাছে নিগূঢ় ভজনমুদ্রা প্রকাশিত হবে।

আশ্বস্ত হলেন কৃষ্ণদাস।

গোবর্ধনের অরণ্যে এক কুটির নির্মাণ ক'রে তিনি বাস করতে লাগলেন।

এই সময়ে একদিন এক দক্ষিণ দেশীয় পণ্ডিত সেখানে উপস্থিত হলেন। তিনি স্থানীয় সকল বৈষ্ণবকে পরাজিত করবেন এই সঙ্কল্প নিয়েই এসেছেন। খোঁজ করতে করতে তিনি এলেন কৃষ্ণদাসের কাছে। তাঁর সঙ্গে তর্ক করতে চান।

বড় বিরক্ত হলেন কৃষ্ণদাস। অনর্থক এ কী উৎপাত!

পণ্ডিত কিছুতেই কৃষ্ণদাসকে ছাড়বেন না।

তিনি সদম্ভে বললেন, শুদ্ধভাবে শ্রুতি উচ্চারণ করতে পারেন এমন পণ্ডিত এখানে কেউ-ই নেই।

হয়ত ঠিকই বলেছেন। তবে অনুগ্রহ ক'রে আপনি যদি সামবেদের কয়েকটি মন্ত্র উচ্চারণ ক'রে শোনান, আমরা কৃতার্থ হবো।

পণ্ডিত তক্ষুনি বেদ-পাঠ শুরু করলেন।

কৃষ্ণদাস বিনীতভাবে উচ্চারণে কয়েকটি অসঙ্গতি দেখালেন।

পণ্ডিত দাম্ভিক। তিনি লজ্জিত না হ'য়ে বললেন,

এর চেয়ে শুদ্ধভাবে আর কেউ উচ্চারণ করতে পারেন, আমার জানা নেই। যদি পারেন আমাকে শোনান।

কৃষ্ণদাস ধ্যানস্থ হলেন। তারপরে সামবেদের ঐ শ্লোকগুলি-ই আবৃত্তি করলেন।

কী অপূর্ব বাচনভঙ্গী! কী শুদ্ধ উচ্চারণ!

পণ্ডিত বিস্মিত হ'য়ে গেলেন। তাঁর মুখ দিয়ে কথা বেরুতে চায় না। তিনি কৃষ্ণদাসকে প্রণাম ক'রে বললেন, আমি বুঝতে পেরেছি, আপনার বিদ্যা অলৌকিক। কিছুতেই এ জাগতিক বিদ্যা নয়। আপনাকে পরাস্ত করা কোনও লৌকিক বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়।

পণ্ডিত বৃন্দাবন ত্যাগ ক'রে চ'লে গেলেন।

কৃষ্ণদাসের কাছে নবীন বৈষ্ণব সাধকরা অধ্যয়ন করতে আসেন। তাঁর লক্ষ্য বস্তু রাধাকৃষ্ণের যুগল-তত্ত্ব। ব্যাকরণের ব্যাখ্যা মানুষের বিশ্লেষণ করেন, তাও প্রত্যেকটি ব্যাখ্যাকে নিয়ে আসেন নিত্যলীলার কোঠায়। সবার কাছে নোতুন নোতুন ভজন-মুদ্রা উদ্‌ঘাটিত করেন। সবাই কৃষ্ণদাসের শাস্ত্র ব্যাখ্যায় মুগ্ধ হন।

রাধাকুঞ্জের জগদানন্দদাস বাবাজী একজন বড় পণ্ডিত। তিনি একদিন কৃষ্ণদাসকে বললেন, কৃষ্ণদাস, আমরা শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করি বুদ্ধির সাহায্যে। তুমি ব্যাখ্যা করো দৈবী বরপ্রভাবে। তুমি নিত্য-লীলা স্বয়ং দর্শন করো। তাই সব সময়েই তোমার ব্যাখ্যায় নিত্য-লীলার প্রভাব পড়ে। সে অলৌকিক রাজ্যে আমাদের মতো অধমের যে প্রবেশাধিকার নেই!

এই সময়ে রাগানুগা ভজনের ক্ষেত্রে কৃষ্ণদাসের সমকক্ষ আর কেউ-ই ব্রজমণ্ডলে ছিলেন না।

ভজন কালে কৃষ্ণদাসের সিদ্ধ দেহে নানা অলৌকিক চিহ্ন প্রকাশ পেতো। সবাই তা দেখে বিস্মিত হতেন।

একদিন ভজন করতে করতে কৃষ্ণদাস ধ্যান-দৃষ্টিতে রাধাকৃষ্ণের হোলিলীলা উপভোগ করছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি হ'য়ে পড়লেন ভাবে ও ভঙ্গীতে রাধারাণীর অনুগতা এক মঞ্জরী। হোলির আনন্দ-রঙ্গ কৃষ্ণদাসের জীবনে এনে দিলো অপার আনন্দ। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সারা দেহে আবীর কুঙ্কুম চন্দন কর্পূর লিপ্ত হ'য়ে গেলো।

ভাবাবিষ্ট অবস্থায় কৃষ্ণদাস ভজন কুটিরের বাইরে এলেন। সমাগত ভক্ত বৈষ্ণবেরা তাঁর চরণ বন্দনা করতে এসেছেন। তাঁরা সবিস্ময়ে দেখলেন, কৃষ্ণদাসের সারা দেহে হোলির রঙ। আর, তাঁর ডোর কৌপীন বহির্বাস—সব-ই সুগন্ধে ভরপুর।

সবাই কৌতূহলী হ'য়ে পড়লেন। ব্যাপার জানতে চাইলেন।

বড়ই সংকুচিত হ'য়ে পড়লেন কৃষ্ণদাস। বারবার অনুরুদ্ধ হ'য়ে সলজ্জে তিনি বললেন,

বাবা, ভজনে ব'সে হোলি-লীলার কথা ভাবছিলাম। এ-সব রাধারাণীর কৃপাচিহ্ন।

সকলেই বুঝলেন, এ-সব চিহ্ন কৃষ্ণদাসের ভজন-সিদ্ধির প্রকাশ বৈ আর কিছুই নয়। তাঁর ভাব দেহের বৃত্তি ও লক্ষণ বাহ্য দেহেও প্রকাশ পেয়েছে।

একদিন ভজন অবস্থায় কৃষ্ণদাসের সূক্ষ্ম সত্তায় অপ্রাকৃত ব্রজের অপূর্ব রমণীয় দৃশ্যগুলি প্রকটিত হ'য়ে পড়লো। তখন দুপুর।

ধ্যানাবস্থায় কৃষ্ণদাস দেখতে পেলেন :—

রাধা ও গোবিন্দ দুজনেই মানসগঙ্গায় নেমে স্নান করছেন। সখী ও মঞ্জরীরা সুন্দর বস্ত্র, অলঙ্কার এই সব নিয়ে তীরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

কৃষ্ণদাস ভাবতে ভাবতে হ'য়ে পড়লেন একজন লীলা-সহচরী। তিনি সুগন্ধ আতরের একটা শিশি নিয়ে তীরে দাঁড়িয়ে আছেন। জল-কেলি শেষ হ'লে রাধা ও গোবিন্দের গায়ে এই আতর মাখিয়ে দেবেন।

রাধা ও গোবিন্দের যুগলরূপ দেখতে দেখতে কৃষ্ণদাসের দেহে দেখা দিল প্রেমবিকার। কাঁপতে লাগলেন।

তাঁর হাত থেকে আতরের শিশি প'ড়ে গেলো। ভেঙ্গে গেলো শিশি।

কেটে গেছে বহুক্ষণ।

বাবাজী এখনও কুটির থেকে বেরিয়ে এলেন না!

সেবক স্নানের জন্যে তাঁকে ডাকতে এলেন।

দরজা খুলে কৃষ্ণদাস বাইরে এলেন। সবাই পেলেন আতরের সুন্দর গন্ধ।

ব্যাপার কি ?—সবাই বিস্মিত হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলেন।

কৃষ্ণদাস বড়ই বিষণ্ণ।

মহা অপরাধী আমি। আমার কি সেবার যোগ্যতা আছে? রাধা গোবিন্দ স্নানলীলায় রত ছিলেন। তাঁদের জন্যে আতরের শিশি নিয়ে অপেক্ষা করছিলাম। স্নান হ'য়ে গেলে মাখিয়ে দেবো। সেবায় ত্রুটি ঘটলো। তাই আতরের শিশি হাত থেকে প'ড়ে ভেঙ্গে গেলো। সেই আতরই ছড়িয়ে পড়েছে আমার গায়ে। তোমরা সেই আতরের গন্ধই পেয়েছো।

মাঝে মাঝে ভক্তেরা কৃষ্ণদাসের অলৌকিক শক্তি দেখে একেবারে বিস্মিত হ'য়ে পড়তেন।

সেদিন তিনি নিজের করোয়া হাতে নিয়ে স্নান করতে গিয়েছেন মানসগঙ্গায়। হঠাৎ ধ্যানাবেশ হোলো। তিনি দেখতে পেলেন রাধাকৃষ্ণের জলকেলির মোহন লীলা। সঙ্গে সঙ্গে বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে কৃষ্ণদাস জলে প'ড়ে গেলেন।

সেদিন কৃষ্ণদাসের সঙ্গে আর কেউ-ই আসেন নি। তাই কারও চোখে তাঁর জলসমাধি ধরা পড়লো না।

বহু সময় কেটে গেলো। সেবকেরা পড়লেন মহাভাবনায়। কোথায় লুকিয়ে রইলেন বাবাজী ?

চারিদিকেই খোঁজাখুঁজি আরম্ভ হ'য়ে গেলো।

সেদিন দুপুরে মানসগঙ্গার তীরে সবাই ব'সে এই বিষয়েই আলোচনা করছিলেন। দুঃখ করছিলেন সবাই। তাঁরা সাত দিন কৃষ্ণদাসকে দেখেন নি।

অকস্মাৎ জলের মধ্যে থেকে কৃষ্ণদাস ভেসে উঠলেন। যেন এই মাত্র স্নান ক'রে এলেন। ধীরে ধীরে এলেন উপরে উঠে। হাতে তখনও সেই করোয়া।

সবাই অবাক!

বাবাজী মহারাজ, এই সাত দিন যাবত আমরা বৃন্দাবনের সর্বত্রই আপনাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। এই সাতদিন কোথায় ছিলেন?

সে কি বাবা! আমি যে একটু আগেই ভজন কুটির থেকে বেরিয়েছি। এই তো স্নান ক'রে এলাম। সাত দিন তোমরা আমাকে দেখতে পাওনি, এ কী কথা!

উপস্থিত যাঁরা ছিলেন, তাঁরা কেউ-ই এ রহস্য ভেদ করতে পারলেন না।

ভরতপুরের মহারাজা বড় ধার্মিক। তিনি সাধ্যমত বৈষ্ণব-সেবা করেন। মঠ মন্দির স্থাপন করেছেন বহু। দান ধ্যানও বিস্তর।

একদিন তিনি এলেন কৃষ্ণদাসের ভজন কুটিরে।

তিনি করজোড়ে নিবেদন করলেন,

বাবাজী মহারাজ, বৃন্দাবনের বহু সাধু কৃপা ক'রে আমার সেবা গ্রহণ করেছেন। আমার একান্ত কামনা আপনার সেবা ক'রে ধন্য হই। আমাকে সে সুযোগ দিয়ে কৃতার্থ করুন।

না বাবা। আমরা দীন বৈষ্ণব। আমাদের জন্যে অর্থ ব্যয় করতে হবে না। আমার কিছুই প্রয়োজন নেই। আপনি দীন দরিদ্র ব্রজবাসীদের সাহায্য করুন। তা হ'লেই রাধা গোবিন্দের সেবা করা হবে।

তিনি কৃষ্ণদাসের উপদেশ মতো বহু দরিদ্রকে সাহায্য করলেন।

আর এক দিন।

মহারাজা বাবাজীর কাছে উপস্থিত হলেন।

বাবাজী মহারাজ, আজ আমার একান্ত ইচ্ছা, আপনি নিজের জন্যে কিছু অঙ্গীকার করুন।

বেশ। আপনার বহু রাণী। তাঁদের মধ্যে যিনি সবচেয়ে আপনার প্রিয় তাঁকে পাঠিয়ে দিন আজই আমার কাছে।

মহারাজা তাঁর প্রিয়তমা মহিষীকে পাঠাতে সম্মত হলেন।

রাণী পরমা সুন্দরী। তরুণী।

তখনই ভজন কুটিরের চারদিক কাপড় দিয়ে ঘিরে দেওয়া হোলো। কৃষ্ণদাসের সঙ্গে এখানেই সাক্ষাৎ হবে। তাঁর কুটির অবধি মহারাণীকে নিয়ে আসা হোলো।

মহারাণী এলেন একাকী। নূপুরের শব্দে কৃষ্ণদাস চমকিত হলেন।

কৃষ্ণদাস মহারাণীকে দেখলেন। নিমেষে জেগে উঠলো রাধারাণীর স্মৃতি।

সঙ্গে সঙ্গেই তিনি ধ্যানে নিমগ্ন হলেন।

তাঁর দেহে ধীরে ধীরে দেখা দিলো অষ্ট সাত্ত্বিক বিকার।

মহারাণী তা দেখে নিজেও ভাবাবিষ্ট হ'য়ে পড়লেন। তাঁরও বাহ্য-জ্ঞান রইলো না।

প্রহরকাল কেটে গেলো। কারও কোনও সাড়া শব্দ নেই।

সবাই উদ্বিগ্ন হ'য়ে পড়েছেন। তাঁরা কাপড় ফাঁক ক'রে দেখলেন বাবাজী ও মহারাণী উভয়েই ধ্যানাবিষ্ট। দিব্যভাবে উভয়েই বিভোর।

ধ্যান ভাঙ্গলে মহারাণী চলে এলেন কৃষ্ণদাসকে প্রণাম ক'রে।

কৃষ্ণদাস এই অবস্থায় তিন দিন রইলেন।

সবাই কৌতূহলী হ'য়ে সব জানতে চাইলেন।

মহারাণীর কাঁকন ও নূপুরের শব্দ শুনেই আমার মনে রাধারাণীর ভাব জেগে উঠলো। মহারাণীর রূপ লাবণ্য মাধুর্য সবই জাগিয়ে তোলে উদ্দীপনা। রাধারাণীর মধুর স্মৃতি ধ্যান করতে করতে আমি সম্বিৎ হারিয়ে ফেললাম।

এদিকে মহারাণীর জীবনেও এলো নোতুন ভাব। তিনি প্রেম ও ভক্তি-সাধনার পথ গ্রহণ করলেন।

একবার মহারাণীর ইচ্ছা হোলো, তিনি কিছু অর্থ দান করবেন। সেই অর্থে কিছু বৈষ্ণব ভোজন হবে।

বৈষ্ণবরা রাজী হলেন না।

মহারাণী কেঁদে ফেললেন। কাঁদতে কাঁদতেই তিনি বললেন, আপনাদের কাছে আজ আমার এই আকুল প্রার্থনা, যদি আমি আবার জন্মগ্রহণ করি, তবে যেন রাজকুলে জন্ম না হয়। দীনাতিদীন হ'য়ে বৈষ্ণব-সেবার অধিকারিণী হ'য়েই যেন জন্মগ্রহণ করি।

বৈষ্ণবরা এই কথা শুনে ব্যথিত হলেন। তাঁরা জানালেন,

মা, এক কাজ কর। তুমি রোজই গোবর সঞ্চিত ক'রে ঘুঁটে তৈরী করবে। সেই ঘুঁটে বেঁচে যে অর্থ পাবে, তাই দিয়ে ঠাকুরের ভোগান্ন নিবেদন ক'রো। এই প্রসাদই আমাদের পরম কাম্য হবে।

মহারাণী তাই-ই করলেন।

কৃষ্ণদাস খুব সুখী হলেন। তিনি মহারাণীকে আশীর্বাদ করলেন।

এরপর এলো জীবনের অন্তিম মুহূর্ত।

রাধাকৃষ্ণের যুগল-ভজনের মধুর পদ গাইতে গাইতে কৃষ্ণদাস প্রবিষ্ট হলেন রাধাকৃষ্ণের নিত্যলীলায়।

রাগানুগা ভজনের একটি স্নিগ্ধ দীপশিখা নির্বাপিত হোলো।

রাধে কৃষ্ণ! রাধে কৃষ্ণ!

মীরাবাঈ ও গিরিধারীলাল

রাজার তুলাল। যৌবনেই সিংহাসনের মোহ কাটিয়ে, স্ত্রীপুত্রের মায়া কাটিয়ে ভিক্ষুর বেশ গ্রহণ করলেন। বোধি বা পরম জ্ঞান লাভ করবেন, জীবের অনাদি দুঃখ দূর করবেন, তাই দুশ্চর তপস্যা শুরু করলেন। আমরণ পথে প্রান্তরে, বনে অরণ্যে, গ্রামে নগরে ভ্রমণ করেই চললেন। ভারতের ইতিহাসে এ জাতীয় দৃষ্টান্তের অভাব নেই।

অসাধারণ পণ্ডিত। খ্যাতি ও সম্মান দেশ-বিস্তৃত। ভুবন-মোহন রূপ। মায়ের স্নেহ, পত্নীর প্রেম, আবালবৃদ্ধ-বনিতার ভালোবাসা সবই বিসর্জন দিলেন। অভীষ্ট লাভ করতে হবে। তাই যৌবনেই হলেন সন্ন্যাসী। 'জীব লাগি করিল সন্ন্যাস'। অভাব নেই এ দৃষ্টান্তের।

তরুণ বয়স। 'ইন্দ্র সম ঐশ্বর্য, স্ত্রী অপ্সরা সম'-এ সব, সবই উপেক্ষা করলেন। ছুটলেন পরমপ্রিয়ের সঙ্গে মিলনের জন্যে। জীবনে আর সংসারে এলেন না। কী কঠোর কৃচ্ছ্র সাধনই না করলেন সারা জীবন। এমন দৃষ্টান্তও-তো রয়েছে ভারতের এখানে ওখানে।

কিন্তু রাজ অন্তঃপুরচারিণী রাজবধূ। রূপের তুলনা নেই। গুণের অবধি নেই। কুল শীল মান, ঐশ্বর্য বিলাস ব্যসন—এ সবই হেলায় তুচ্ছ জ্ঞান ক'রে 'মেরে গিরিধর গোপাল' ব'লে অচেনা অজানা পথে পা বাড়ালেন। অপরিচিত লক্ষজনের কুটিল দৃষ্টি উপেক্ষা করলেন। কেঁদে কেঁদে গান গেয়ে গিরিধারীলালের জন্যেই জীবন কাটিয়ে দিলেন। এ দৃষ্টান্ত বুঝি ভারত ইতিহাসে একটি-ই আছে। তাইতো, কয়েক শতাব্দী পার হ'য়ে গেলো, এখনও তাঁর স্মৃতি অম্লান।

এখনও সারা ভারতের সর্বত্রই মীরার নাম। ধনীর অট্টালিকায় কিংবা দরিদ্রের পর্ণকুটিরে, অভিজাত অভাজন নির্বিশেষে, পণ্ডিত মূর্খ, ব্রাহ্মণ শূদ্র ভেদাভেদে—সর্বত্রই মীরা নামের প্রচলন।

মীরা—মীরাবাঈ।

কিন্তু এই মীরা কে? মীরাবাঈ?

রাজস্থানে মেড়তার অন্তর্গত কুড়কী গ্রামে মীরার জন্ম। জন্ম হয় ১৫০৪ খ্রীষ্টাব্দে। তাঁর বাবার নাম রতন সিংহ। নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব পরিবারে মীরার জন্ম।

মীরা দেখতে পরমা সুন্দরী। তাঁর কণ্ঠস্বরের তুলনা নেই।

একেবারে ছোট্ট মেয়েটি যখন, তখনও মীরার গান শুনে লোকে যেতো মুগ্ধ হ'য়ে।—এযে একেবারে বাঁশীর সুর!—তারা বলতো।

ছেলে বয়সেই ভগবৎ-প্রসঙ্গ, হরিনাম সঙ্কীর্তন—এই সব শুনলে মীরা আত্মহারা হ'য়ে পড়তেন। চ'লে যেতেন যেন আর এক জগতে।

হয়ত সঙ্গিনীদের সঙ্গে খেলতে চলেছেন। অকস্মাৎ কোনও প্রাকৃতিক দৃশ্য মীরার ভালো লাগলো। সঙ্গে সঙ্গে ভাব এলো তাঁর। তন্ময় হ'য়ে গান ধরলেন। কোথায় গেলো খেলাধূলা, আর, কোথায় বা সঙ্গিনীরা? গান শুনে একজন দুজন ক'রে লোক জড়ো হ'য়ে পড়লো।—গাওনা মীরা আর একটা গান। সবাই অনুরোধ করে।

মাঝে মাঝে নিজের হাতে শ্রীকৃষ্ণের মূর্তি তৈরী করেন। আনন্দ করেন সেই মূর্তি নিয়ে। তাঁর পায়ে ফুল দেন। তাকে উদ্দেশ ক'রে গান করেন। সবাই দেখে, মীরা যেন এ জগতের কেউ নয়। তাঁর দৃষ্টি কেমন যেন। উদাস উদাস ভাব। দুচোখ দিয়ে মুক্তোর পর মুক্তো গড়িয়ে পড়ছে।

নির্জনতা ভালো লাগে মীরার। প্রায়ই একেলা থাকেন। কী যেন ভাবেন। মানস চোখে কাকে যেন খুঁজে বেড়ান।

লোকে বলে, বাল্যকালে মীরাদের বাড়ীর পাশ দিয়ে একদিন এক বরযাত্রীদল যাচ্ছিলো। মনোহর সাজে সজ্জিত বর ও আনন্দ-সরব বরযাত্রীদের দেখে, নানা ধরণের বাদ্যি বাজনা শুনে মীরার ভালো লাগলো। উৎসুক হ'য়ে মীরা একান্তে মাকে জিজ্ঞাসা করলেন, মা, আমার স্বামী কে? কার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছে?

মা হেসে বলেন, তোমার স্বামী, পাগলী? তোমার স্বামী—বাড়ীর কৃষ্ণবিগ্রহের দিকে তাকিয়ে—তোমার স্বামী আমাদের ঐ গিরিধারীলাল।

ছোট্ট মেয়েটি সেই দিন থেকে গিরিধারীলালকে—শ্রীকৃষ্ণকে—নিজের স্বামী ব'লে-ই গ্রহণ করলেন।

দু একজনে বললেন, না, তা নয়। ঘটনাটি অন্য।

একদিন একজন সাধু এসেছিলেন মীরাদের বাড়ী। এই সাধুর সঙ্গে ছিল এক বিগ্রহ। তিনি এই বিগ্রহের পূজো করতেন।

মীরা বললেন, বা বেশ ঠাকুর তো। সুন্দর। খুব সুন্দর। এ ঠাকুরের নাম কি?

সাধু বললেন, ইনি হচ্ছেন গিরিধারীলাল।

মীরা বললেন, এঁকে আমায় দেবেন? দিন না।

না, তা' কি ক'রে হয়?

সাধু দিতে চান না। যাঁকে নিত্য পূজো করেন সেই ইষ্ট-দেবতাকে ছেড়ে যাবেন কোন প্রাণে?

মীরা বার বার মিনতি করতে লাগলেন।

সাধুর মন নরম হোলো। এতটুকু মেয়ের ঠাকুরের 'পরে এত টান! এ টান যে আরও জোরের।

সাধু দিলেন তাঁর গিরিধারীলালকে।

মীরার আনন্দ আর ধরে না।

- মেরে গিরিধর গোপাল, মেরে গিরিধর গোপাল!

আনন্দে দুই চোখ দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়তে লাগলো গিরিধারীলালের সর্ব অঙ্গে। তিনি ছিলেন মীরার বুকে।

মীরার চোখের জলে ঠাকুর সেদিন স্নান করলেন। হোলো অভিষেক।

এইদিন থেকে মীরার সব টান, সব আকর্ষণ পড়লো গিরিধারী-লালের উপর।

মীরা গিরিধারীলালকে স্নান করান, খাওয়ান, ঘুম পাড়ান, এমন কি একই সঙ্গে মৃগচর্মে শয়ন করেন। তাঁর পূজো করেন। শুধু কি এই?

গিরিধারীলালের সামনে মীরা নেচে নেচে গান করেন। একটা নয়, দুটো নয়—বহু। বহু প্রেমের গান। ভক্তিমূলক গান।

গিরিধারীলালের মুখখানা বিমর্ষ দেখলেই মীরা কেঁদে আকুল হন। প্রফুল্ল দেখলে মীরার মুখে হাসি ধরে না। আনন্দে নাচতে থাকেন।

বহু লোকই দেখেছেন, শুনেছেন, মীরা গিরিধারীলালের সঙ্গে কত কথা কন! অনেকে মীরার কথার ধরণ দেখে এটাও বুঝেছেন, গিরিধারীলালও মীরার সঙ্গে কথা কন।

যাঁরা গোঁড়া তাঁরা এ-সব মোটেই ভালো চোখে দেখলেন না। তাঁরা মীরাকে নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রূপ করতে লাগলেন। বাজে কথা কইতে লাগলেন। ব'লে দিলেন মীরার বাবাকে, এই মেয়েকে নিয়ে তোমাদের পস্তাতে হবে একদিন! এই মেয়েকে নিয়ে তোমাদের দুর্ভাগ্যের অন্ত থাকবে না।

মীরা এসব কথায় কান দেন না। তিনি তাঁর গিরিধারীলালকে নিয়েই বিভোর থাকেন। আন কথায় কান দেবার সময় কোথায় মীরার?

মীরা গিরিধারীলালকে স্বামী ব'লে চিনেছেন। তাঁকেই পূজো-অর্চনা করেন। আর, এই ধারণাটা রইলো মৃত্যু পর্যন্ত। সঙ্গে পূজো অর্চনাও।

মীরার প্রতি গানেই তাইতো 'মীরাকে প্রভু গিরিধর নাগর', 'মীরাপতি গিরিধারী', এইসব পদ দেখতে পাওয়া যায়।

হ্যাঁ, গিরিধারীলালই মীরার স্বামী। 'জনম-মরণকে সাথী'।

মীরার নাম ছড়িয়ে পড়লো দূর-দূরান্ত পর্যন্ত।

বহু লোক ছুটে আসতো মীরাকে দেখতে, মীরার গান শুনতে। তারা বলতো, এমন প্রাণ-মাতানো, মন-গলানো গান তারা শোনে নি।

শুধু গান তো নয়। গিরিধারীলালের জন্যে মীরার কী করুণ প্রার্থনা! তাঁকে দেখবার জন্যে কী ব্যাকুলতা!

মীরার খ্যাতি চিতোরেও পৌঁছুলো। পৌঁছুলো রাজপ্রাসাদে। শিশোদিয়া রাজবংশের মহারাণা তখন সংগ্রাম সিংহ।

শুধু চিতোর নয়, রাজস্থান নয়। ভারতে এমন কে আছে, তাঁর নাম শোনে নি? সংগ্রামসিংহের নাম?

চিরজীবন তিনি মাথা উঁচু ক'রেই কাটিয়ে গেলেন। একদিনের তরেও নোয়ান নি দীর্ঘদেহ, সমুন্নত মস্তক।—না মোগলদের কাছে, না আত্মীয় স্বজন, অন্য অন্য রাজপুত সর্দারদের কাছে। না, নোয়ান নি চরম বিপর্যয়ের মধ্যেও।

মহারাণা সংগ্রামসিংহের কানেও মীরার খ্যাতি পৌঁছুলো। তিনি আগ্রহের সঙ্গে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র ভোজরাজের সঙ্গে মীরার বিবাহ-প্রস্তাব পাঠালেন।

মীরার বাবা রতনসিংহ হাতে স্বর্গ পেলেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গেই সম্মত হলেন।

মীরা শুনলেন এ কথা। বুঝলেন সব।

মীরার বিবাহ হোলো। বিবাহ হোলো চিতোরের রাজপুত্র ভোজরাজের সঙ্গে। মীরার বয়স তখন মাত্র আট বছর।

ভোজরাজ। তিনি পিতার সব গুণই পেয়েছিলেন। সাহস, বীর্য, দেশ-প্রেম—এই সব। পিতার চাইতে একটি জিনিস অধিক পেয়েছিলেন। রূপ। রূপের তুলনা ছিল না ভোজরাজের।

কিছুতেই কখনও মাথা নোয়াবো না। এ একটা গুণ, মহৎ গুণ। এ থেকে একটা দোষও মাঝে মাঝে এসে পড়ে। অনেকের চরিত্রে

সেটা প্রকট হ'য়ে ওঠে। তখন তাতে বিপদ ঘটে। সেটা একগুয়েমি, দাম্ভিকতা।

ভোজরাজের চরিত্রেও একগুয়েমি দাম্ভিকতা, এ-সব এসে গিয়েছিল। প্রেমের জগতে দাম্ভিকতার স্থান? নৈব নৈব চ। কিন্তু যদি কখনও আসে, সেখানেই দাম্পত্যজীবনে নামে অভিশাপ।

মীরাবাঈ রাজকুলবধূ।

মুক্ত বনবিহঙ্গী স্বর্ণপিঞ্জরে আবদ্ধ হোলো। নিয়ন্ত্রিত হোলো স্বচ্ছন্দ বিহারিণীর অবাধ বিচরণ। অবাধ আচরণ।

মীরা রাজপ্রাসাদে এলেন। সঙ্গে এলেন গিরিধারীলাল।

মীরাকে দেখে রাজপুরীর সবাই মুগ্ধ হ'য়ে গেলো।—মানুষ এত সুন্দর হয়! মানুষের গলা এত মধুর হয়!

সবারই মুখে একই কথা। না, চিতোর রাজপ্রসাদে এমন সুন্দরী বধূ আর কেউ আসেন নি। কখনও আসেন নি।

কেউ কেউ একান্তে বলাবলি করে, রাজবধূ হ'য়ে এসেছো, রাজবধূরই মতো থাকো। থাকো স্ফূর্তিতে আনন্দে, বিলাসে ব্যসনে। তা নয়। সঙ্গে সব সময়ই ঠাকুর। গিরিধারীলাল। তাকেই সাজাবে। খাওয়াবে, ঘুম পাড়াবে। তাকে নিয়েই থাকবে অষ্টপ্রহর। আমাদের যুবরাজের ভালো লাগে এ-সব?—না লাগতে পারে?

রাজবধূ হ'য়েও মীরার জীবনে সুখ হোলো না। মনে শান্তি এলো না। মীরা ভগবদ্ভাবে পাগলিনী। কৃষ্ণপ্রেমে দিবানিশি মাতোয়ারা। তাঁকে রাজপ্রাসাদের সুখ ঐশ্বর্য কি ক'রে সুখ দেবে? শান্তি দেবে? বরং এ-সব বৃশ্চিক দংশন ব'লেই মনে হ'তে লাগলো।

এত বড় রাজপ্রাসাদে গিরিধারীলাল ছাড়া মীরার আপন বলতে আর কেউ রইলো না। 'মেরে তো গিরিধর গোপাল দুসরা ন কোঈ।'

মীরা রাজবধূ। তিনি

মীরা আপ্রাণ চেষ্টা করেন সবাইকে সুখী করতে। স্বামীকে সুখী করতে। শাশুড়ীকে সুখী করতে।

কিন্তু গিরিধারীলাল—মীরার গিরিধারীলালও তো রয়েছেন।

তাঁকেও তো সেবা-যত্ন করতে হবে। তাঁকেও তো সুখী করতে হবে। এত বড়ো রাজপ্রাসাদে তাঁর তো আর কেউ নেই মীরা ছাড়া।

সংসারের কাজ সারা হয়। শাশুড়ী, স্বামী এঁদের প্রতি যা যা করণীয়, সে সব কাজ শেষ হয়। মীরা তখন চ'লে আসেন মন্দিরে। সেখানে রয়েছেন তাঁর গিরিধারীলাল।

আসেন মন্দিরে।

মীরা গিরিধারীলালের সামনে গান করেন। একটি একটি ক'রে বহু গান। ভাব এসে গেলো। তখন নাচতে শুরু করেন। কী মধুর নৃত্য! নয়নবিমোহন!

কত কথা কন মীরা গিরিধারীলালের সঙ্গে!

নাচে গানে, প্রেম-আলাপনে মীরা বিভোর হ'য়ে পড়েন। এই সুযোগে কৃষ্ণ-গিরিধারীলালও চ'লে আসেন মীরার পাশে।

ছোট্ট ঠাকুরটি উঠে আসেন তাঁর রত্নসিংহাসন ত্যাগ ক'রে। বুকে জড়িয়ে ধরেন মীরাকে। তিনি তাঁর 'জনম-জনমকী সাথী'।

আনন্দে কৃষ্ণ বাঁশী বাজাতে শুরু করেন। মীরাও আনন্দে তখন নাচতে থাকেন। বাঁশী ও নাচ চলে এক সঙ্গে। তারপর কৃষ্ণ-গিরিধারীলাল—মীরার সঙ্গে কত কথা কন! মীরাও কথা কইতে থাকেন কৃষ্ণের সঙ্গে।

মীরার জীবনে এইটিই সুখ। মীরার এই-ই জীবন। এর-ই মাঝে মীরা বেঁচে থাকেন।

এত সুখ কি মীরা ছাড়তে পারেন?

মীরা গান ধরেন।—

বসো মোরে নৈনন মেঁ নংদলাল॥
মোহনী মূরতি সাঁবরী সূরত নৈনা বনে বিসাল।
অধর সুধারস মুরলি রাজতি উর বৈজংতী মাল॥

ক্ষুদ্র ঘংটিকা কটিতট সোভিত, নূপুর সবদ রসাল।
মীরা প্রভু সংতন সুখদাঈ, ভগতবসল গোপাল॥

মোর নয়নে বিরাজ হে নন্দদুলাল।
মূরতি মোহন নয়ন সুশোভন
সুবিশাল ভুবন উজালা।
সুধাময় অধরে বাজে মুরলী
কণ্ঠে দুলিছে বনমালা।
রিনি ঝিনি রিনি ঝিনি কটিতটে কিঙ্কিনী
রাঙা পায়ে নূপুরের ধ্বনি।
মীরা প্রভু সাধুভক্ত কল্পতরু
গিরিধারী নন্দগোপাল॥

ইতিমধ্যে মীরার নাম চারদিকে আরও বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়লো। দেশ দেশান্তর থেকে বহু ভক্ত, বহু বৈষ্ণব সাধু সন্ত আসতে লাগলেন মীরাকে দেখতে। মীরার সঙ্গে কথা কইতে। মীরার ভজন গান শুনতে। মীরা এঁদের নিয়ে, গিরিধারীলালকে নিয়ে তখন হ'য়ে পড়েন বিভোর। লোক লজ্জা রইলো না। রইলো না রাজপ্রাসাদের আভিজাত্য, মর্যাদাবোধ। মীরা ভুলে গেলেন, তিনি একজন রমণী।

কৃষ্ণের চরণে যদি হয় অনুরাগ।
কৃষ্ণ বিনু অন্যত্র তার নাহি রহে রাগ॥

মীরা গান ধরেন—

মেরে তো গিরিধর গোপাল দুসরা ন কোঈ।
যাকে সির মোর মুকুট মেরো পতি সোঈ;
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম কণ্ঠমাল হোঈ॥
তাত মাত ভ্রাত বন্ধু আপনা ন কোঈ,
অবতো বাত ফৈল গয়ি জানে সব কোঈ॥

সন্তন সঁগ বৈঠ বৈঠ লোকলাজ খোঈ,
ছোড় দই কুলকী আন ক্যা করেগা কোঈ।
অঁসুবন জল সীঁচ সীঁচ প্রেমবেল বোঈ,
মীরা প্রভু লগন লাগী হোনী হো সো হোঈ ॥

গোপাল গিরিধারী মুকুট মনোহারী,
চূড়ে শোভে ময়ূরের পাখা।
সেই এক মোর পতি অপরেতে নাই মতি,
তার তরে এ জীবন রাখা ॥
সেই প্রাণ-বল্লভ মিছে ভবে আর সব,
রূপে যার ভুবন উজালা।
শঙ্খ-চক্র-গদা পদ্ম-সুশোভিত
গলে যার দোলে বনমালা।
পিতামাতা বন্ধু ভাই ভবে মোর কেহ নাই,
ধরা হ'তে সব গেছে মুছি।
সাধু সঙ্গে বাস করি লাজ ভয় গেছে ছাড়ি,
কুল মান সব গেছে ঘুচি ॥
মনে মনে করি পণ, মোর সে পরম ধন,
যদি খুঁজে তার দেখা পাই।
চরণ ধোয়াবো পেলে দুটি নয়নের জলে
শেষে সেথা মেগে নেবো ঠাঁই।

শাশুড়ী ননদী এঁরা মীরার এমনধারা আচরণ পছন্দ করেন না।

শাশুড়ী মীরাকে বোঝান।

বাইরের লোকজনের সাথে মেলামেশা কোরো না। হোলেন-ই বা তাঁরা সাধু সন্ত। এতে মান যায়। লোকে নিন্দে রটায়। সিংহাসনের ভিত্ টলে। এ সব বন্ধ করো। শেষে বলেন, আমাদের গৃহ-দেবতা দুর্গা। যদি পূজো অর্চনা করতেই চাও, বেশতো, দুর্গাপুজা করো। আমি ঠাকুর গড়িয়ে দিই।

মীরা গিরিধারীলাল ছাড়া, অন্য দেবতা জানেন না। অন্য দেবতার পূজা করেন কি ক'রে?

মীরা করজোড়ে মিনতি করেন।—

এ জাতীয় কথা, দোহাই মা, আর আমায় বলবেন না। এ মাথা আর কোনও দেবতার পায়ে নোয়াতে পারবো না। না, মা, না।

মীরার দুই চোখে অশ্রুর কালিন্দী।

এলেন উদাবাঈ। ভোজরাজের ভগিনী। তিনিও অনেক ক'রে বললেন।

মীরা গান ধরেন,—মেরে তো গিরিধর গোপাল দুসরা ন কোঈ···

উদাবাঈ ফিরে গেলেন। তিনি মীরার নামে কুৎসা রটাতে লাগলেন; ষড়যন্ত্র শুরু করলেন মীরাকে অপদস্থ করতে; তাঁকে তাড়িয়ে দিতে।

উদাবাঈ একদিন রাণাকে বললেন,

প্রতিদিন মধ্যরাত্রে মন্দিরে মীরার কাছে বাইরে থেকে লোক আসে। আসে সাধুর ছদ্মবেশ নিয়ে। মীরা ভ্রষ্টা, চরিত্রহীনা।

উদাবাঈ ব'লে চললেন,

তিনি স্বকর্ণে শুনেছেন, মীরা মধ্যরাত্রে মন্দিরে ব'সে পরপুরুষের সঙ্গে কথা কয়। যদি বিশ্বাস না হয়, রাণা নিজে এটা যাচাই ক'রে দেখতে পারেন। এ কথা তিনি বলতেন না। এখন না ব'লে পারছেন না। চিতোর রাজপ্রাসাদের মর্যাদা যেতে বসেছে।

মহারাণা ভীষণ ক্রুদ্ধ হলেন। মুক্ত তরবারি হাতে তক্ষুনি রওনা হলেন মীরাকে বধ করতে।

ভাগ্যক্রমে মীরা তখন ছিলেন না নিজের ঘরে।

মীরাকে খুঁজে বেড়াতে লাগলেন মহারাণা।

মহারাণার একজন শুভানুধ্যায়ী বললেন,

নিজের চোখে না দেখে, নিজের কানে না শুনে কিছুই করবেন না। আপনি রাত দুপুর পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। নিজে দেখুন। নিজে শুনুন। তারপর যা করণীয় তাই করবেন।

এলো মধ্যরাত্রি।

উদাবাঈ মহারাণাকে ডেকে নিয়ে এলেন মন্দিরে। মন্দিরের দুয়ার তখন বন্ধ।

মহারাণা দুয়ারের বাইরে থেকেই শুনতে পেলেন, মন্দির মধ্যে অপরের সঙ্গে মীরা কথা কইছেন।

মহারাণা উৎকর্ণ হলেন।

মীরা বলছিলেন,

তোমার বিরহ আমি মুহূর্তের জন্তেও আর সইতে পারছিনে। আমাকে ছেড়ে যেও না। জেনো, আমি তোমারই। একান্তভাবে তোমারই। তুমি ছাড়া আর কাউকে আমি জানিনে। আমি চিনিনে। আমাকে তুমি ছেড়ে যেও না।

মহারাণা স্বকর্ণে শুনলেন এই কথা।

তাঁর ধৈর্য রইলো না। লাথি মেরে দুয়ার ভেঙ্গে মন্দিরে ঢুকলেন। দেখলেন, মীরা ছাড়া আর কেউ নেই মন্দিরে। আর, মীরা তাঁর ঠাকুরের সামনে ব'সে রয়েছেন। দুই চোখ দিয়ে জলের ধারা ব'য়ে চলেছে।

মহারাণার কৌতূহল নিবৃত্ত হোলো না। বেড়ে গেলো। তিনি মীরার হাত ধরলেন।

বলো, কার সঙ্গে এতক্ষণ কথা কইছিলে? আমাকে এক্ষুনি দেখিয়ে দাও। তাকে বধ করবো।

মীরা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন গিরিধারীলালকে।

মেরে ফেলো এঁকে। এ শঠ। এ চোর। আগে গোপীদের কত জিনিস চুরি করেছে। চুরি করেছে তাদের মন। এখন এই শঠ, এই চোর আমারও মনের সবটুকু চুরি ক'রে নিয়েছে। সেই মন আর আমাকে ফেরৎ দেয় না। না-ই দিক্। আমি তা চাইনে। হ্যাঁ, এই তো সান্ত্বনা। এই-তো সব।......

ওগো দ্যাখো দ্যাখো—কেমন হাসছে শঠ তার দুষ্কর্মের জন্যে! প্রিয়তম, তুমিও হাসো। আগে যেমনটি হাসতে। তেমনি ক'রেই

হাসো।··· না না। ঐ ছাখো, শঠ ভাবছে, আমি সব তোমাকেই দিলাম নাকি! তাইতো, ছাখো না, তাইতো, ও কেমন মুখ গুমরে রয়েছে। না না। থাকো গিরিধারীলাল। আমার গিরিধারীলাল, তুমি থাকো। কেন তুমি চ'লে যাবে? কেন চ'লে যাবে? ও গে······

মীরা মূর্ছিত হ'য়ে পড়লেন।

এতটা মহারাণা আশা করেন নি। অন্য অন্য মহিলারাও নয়। উদাবাঈ ছুটে গিয়ে মীরাকে আলিঙ্গন করলেন।

মহারাণা বুঝলেন, মীরা উন্মাদিনী।

সেদিন থেকে তিনি মীরাকে উত্যক্ত করা ছেড়ে দিলেন।

কিন্তু বাইরে র'টে গেল মীরা সম্বন্ধে নানা জাতীয় কথা। কুৎসা অপবাদ।

মীরা নির্বিকার।

তিনি গান ধরেন।—

ম্হাঁরে জনম-মরণকে সাথী
থাঁনে নহি বিসরূঁ দিনরাতী।
তুম দেখ্যাঁ বিন কল না পড়ত হৈ
জানত মেরী ছাতী॥

ঊঁচী চঢ় চঢ় পংথ নিহরূ
রোয় রোয় আঁখিয়া রাতী।
মীরাকে প্রভু পরম মনোহর
হরিচরণা চিত্তরাতী।
পল পল তেরা রূপ নিহারূ
নিরখ নিরখ সুখপাতী॥

প্রভু, সাথী হ'য়ে থাকো
জীবনে মরণে মোর।
দূরে চ'লে গেলে কাটেনাকো দিন
রজনী হয় না ভোর॥

না হেরিলে রূপ কেঁদে হই সারা,
হৃদয়ে উথলি ওঠে প্রেম ধারা,
পথ পানে চাই যদি দেখা পাই
দুনয়নে বহে লোর ॥

মীরা কহে, প্রভু, চিরসুন্দর
শ্রীচরণে দেহো ঠাঁই।
যত হেরি তোমা নয়ন ভরি
নিজেরে তত হারাই ॥

বাঁধা হ'য়ে রও প্রাণে প্রাণে মোর
শিথিল কোরো না ডোর।

এখন থেকে মীরা অবাধে সাধুসন্তদের সাথে মিশতে লাগলেন। মহারাণা এখন আর কঠোর নন।

মীরা দিবানিশি তাঁর গিরিধারীলাল আর সাধুসন্তদের নিয়েই থাকেন। চলে নাচ গান। চলে ভজন কীর্তন। চলে পূজা অর্চনা।

মীরার এই কৃষ্ণপ্রেমের কথা দিকে দিকে প্রচারিত হ'য়ে পড়লো। শুনলেন দিল্লীর বাদশাহ আকবর।

তিনি একদিন সাধুর ছদ্মবেশে বন্ধু তানসেনকে সঙ্গে নিয়ে মীরাকে দেখতে, তাঁর গান শুনতে, তাঁর কৃষ্ণ অনুরাগ আস্বাদন করতে চিতোর রাজপ্রাসাদের মন্দিরে এলেন।

সেদিন মীরা কত গান-ই না গাইলেন! কত নাচ-ই নাচলেন! যে যা বললেন, তার জবাব দিলেন। সেদিন মীরার নয়নে আননে স্বর্গীয় জ্যোতি, দিব্য বিভা।

নাচতে নাচতে মীরা সেদিন মূর্ছিত হ'য়ে পড়লেন।

মূর্ছা ভাঙ্গলে ছদ্মবেশী বাদশাহ মীরাকে কিছু উপহার দিতে চাইলেন। এমনটি তো তিনি জীবনে দেখেন নি।

কোনও উপঢৌকন নিতে মীরা সম্মত হলেন না। জীবনে নিজের জন্যে কোনও লোকের কাছ থেকে তিনি কিছু গ্রহণ করেন নি।

বাদশাহ অনুরোধ করলেন, না, এ উপহার, সামান্য উপহার, আপনাকে নয়, স্বয়ং গিরিধারীলালের উদ্দেশেই নিবেদিত হোলো।

মীরা আর কি বলবেন ?

বাদশাহের গোপনে আগমন সংবাদ চতুর্দিকে রাষ্ট্র হ'য়ে পড়লো।

নিজের বহুমূল্য হার মীরার পদপ্রান্তে ছুড়ে ফেলে বাদশাহ দ্রুত পালিয়ে গেলেন।

নিমেষে এই কথাও ছড়িয়ে পড়লো।

শুনলেন এই কথা প্রাসাদের সবাই। শুনলেন মহারাণা।

তিনি তক্ষুনি চ'লে এলেন মীরার কাছে। ক্রোধে যেন অগ্নিশর্মা।

না না। তোমার কোনও কথা আর শুনবো না। একটি কথা-ও নয়। এখনই, এই মুহূর্তেই, নদীর জলে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করো।

তাই হবে। মীরা নদীর জলেই ডুবে আত্মহত্যা করবেন। মীরা স্বামীর আদেশ পালন করবেন।

শিশুকাল থেকেই রাজপুত রমণীদের জহরব্রতের কথা মীরা শুনে এসেছেন। নিজেদের মান, রাজপুতদের মর্যাদা, চিতোরের সম্মান রাখতে তাঁরা হাসিমুখে অনলে ঝাঁপ দিতেন।

মীরা ভাবলেন, এই যদি সত্যি হয়, স্বামী যদি বুঝেই থাকেন, তাঁর জন্যে চিতোরের মান নষ্ট হয়েছে, রাজপুতদের সম্মান হানি হয়েছে, সম্ভ্রম গিয়েছে স্বামীবংশের, তিনি হাসি মুখে নদীর জলে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণত্যাগ করবেন। এ আর বেশী কথা কি!

সূর্য অস্ত গেলো।

মীরা যাবেন নদীর দিকে। আত্মহত্যাই করবেন।

তার পূর্বে মন্দিরে গিয়ে প্রাণপ্রিয় গিরিধারীলালকে শেষ প্রণাম জানিয়ে যাবেন। শেষ গান গেয়ে। শেষ নাচ নেচে।

এলেন মন্দিরে। লুটিয়ে পড়লেন গিরিধারীলালের পায়ে।

মেরে গিরিধর গোপাল! মেরে গিরিধর গোপাল!!

মনের আবেগে একটি একটি ক'রে প্রিয় গানগুলি গাইলেন। নাচলেন।

আবার প্রণাম ক'রে গিরিধারীলালকে বুকে জড়িয়ে ধ'রে অঝোরে কাঁদলেন।

মেরে গিরিধর গোপাল দুসরা ন কোঈ! মেরে গিরিধর গোপাল দুসরা ন কোঈ!···

ধীরে ধীরে চললেন নদীর দিকে।

মেরে গিরিধর গোপাল, মেরে গিরিধর গোপাল!···

নদীর জলে ঝাঁপ্ দিতে উদ্যত হলেন মীরা। এমন সময়ে মন্দিরে শাঁখ বাজলো, বাজলো কাঁসর ঘণ্টা।

এই তো আমার প্রভুর পূজার সময়।

মীরা থামলেন। কিছুক্ষণ চুপ ক'রে রইলেন।

একটু বসি।

কিন্তু কোথায়? কোথায় বসবেন?

তাঁর স্থান তো আর কোথাও নেই। শুধু আছে প্রিয়তম গিরিধারীলালের স্নিগ্ধ মধুর অঙ্ক।

কিন্তু কোথায় কৃষ্ণ? কোথায়?

মীরা আবার গান ধরলেন।

না। চোখে আর জল নেই। মুখে এসেছে প্রশান্তি।

এই উপযুক্ত সময়। এইবার জলে ঝাঁপ দিই।

জলে ঝাঁপ দিতে যাবেন, এমন সময়ে শ্রীকৃষ্ণ পিছন হ'তে দু'হাত বাড়িয়ে মীরাকে ধ'রে ফেললেন।

কে তাকে ধরলো? কে তাকে নিবৃত্ত করলো? মীরা তাকালেন পিছন দিকে।

প্রভু, তুমি! গিরিধর গোপাল, তুমি! তুমি!

মীরা মূর্ছিত হ'য়ে পড়লেন।

কেটে গেলো কিছুক্ষণ।

জ্ঞান এলো ফিরে।

মীরা দেখলেন, তিনি ব'সে রয়েছেন প্রেমসুন্দর শ্রীকৃষ্ণের কোলে।

মুরলীধর হাসছেন।

সে হাসির হিল্লোলে মীরার সব দুঃখ, কষ্ট, গ্লানির অবসান হোলো।

মীরা, আজ থেকে তোমার লৌকিক জীবনে ছেদ পড়লো। এখন থেকে তুমি শুধু আমার। আমার।

বৃন্দাবনে যাও, মীরা। বৃন্দাবনই তোমার আমার মিলনের সর্বোত্তম ক্ষেত্র। তুমি বৃন্দাবনে যাও।

মীরা বৃন্দাবনে চলেছেন।

গাইতে গাইতেই চলেছেন। গানের আর শেষ নেই। মাঝে মাঝে প্রেমে আত্মহারা হ'য়ে পড়েন। পথের মাঝেই নাচতে শুরু করেন।

যে দেখে, যে শোনে, সেই-ই মুগ্ধ হয়।

রাজস্থানের মরু-বালু-পথ। সেদিকে মীরার খেয়ালই নেই। মীরা চলেছেন।

মীরা গান করেন, ওগো প্রভু, তুমি ছাড়া মীরার আর কেউ নেই, কিছু নেই। আমার নয়নে নয়নে সর্বক্ষণ তুমি বিরাজ করো।

মীরা গেয়ে চলেন,—

তুম্হরে কারণ সব সুখ ছোড়্যা
অব মোহে কূঁ্য তরসাও।
অব ছোড়্যা নহি বনৈ প্রভুজী
চরণ কে পাশ বুলাও।
বিরহ বিথা লাগী উর অংদর
(প্রভুজী) সো তুম্ আয় বুঝাও।
মীরা দাসী জনম-জনম কী
মম অঙ্গ সুঁ অঙ্গ লগাও।
(প্রভুজী) মম চিত্ত সুঁ চিত্ত লগাও ॥

আমি সব সুখ ভুলি সঁপি মনঃ কায়,
তৃষিত প্রাণের যাতনা জুড়াও।
সাজেনা তো, সখা, দূরে থাকা আর।
ঠাঁই দাও প্রভু চরণে তোমার ॥

(দরদিয়া—) দরদিয়া বুঝি বিরহের ব্যথা
প্রাণে প্রাণে বাঁধা রও।
ডাকে অনুরাগে রাঙি মীরা সঙ্গিনী
অঙ্গের পরশ দাও ॥

দরিদ্র গ্রামবাসীরা সহানুভূতিতে ভ'রে উঠলো। তারাই মীরার সাচ্ছন্দ্যের দিকে নজর রাখে। তারাই নিয়ে যায় মীরাকে তাদের ঘরে মায়ের কাছে। তারাই খাওয়ায়।

আশে-পাশে, সামনে পিছনে যেখানে যত রাখাল বালক সবাই মীরার কাছে এক একজন কৃষ্ণ।

তাঁর কৃষ্ণ বহু কৃষ্ণ হ'য়ে তাঁর সঙ্গে সঙ্গেই রয়েছেন। এমনি ভাবে ক্লেশকে ক্লেশ মনে না ক'রে মীরা এলেন বৃন্দাবনে।

ক্লেশহরণ শ্রীকৃষ্ণ রয়েছেন সর্বদা সর্বক্ষণ মীরার সঙ্গে সঙ্গেই। ক্লেশের লেশও থাকতে পারে ?

মীরার মুখের দীপ্তি লাখ গুণ বেড়ে গিয়েছে।

যে দেখে, সেই-ই প্রণাম করে।

প্রণাম, মা, প্রণাম।

বৃন্দাবনের রাখাল বালকদের আনন্দ ধরে না।

তারা ভাবলো, গোপিনী এসেছেন।

শুধু তারা ?

যে দেখে, সেই-ই মনে করে, দীর্ঘকাল পরে আবার ব্রজে এসেছেন ব্রজের গোপিনী।

সবাইকে দেখে মীরারও অপার আনন্দ। সবাই তাঁর কাছে ব্রজবালক।

আনন্দে মীরা নাচেন। গান করেন।

বালকেরা দুধ এনে দেয়। তারা মীরার পা ধুইয়ে দেয়।

মীরা রাতে থাকেন মন্দিরে। সারারাত ধ্যানে কাটান। কৃষ্ণ থাকেন সর্বক্ষণ পাশটিতে। সারারাত জেগে থাকেন।

বৃন্দাবনে র'টে গেলো, মীরার সঙ্গে সর্বক্ষণই কৃষ্ণ থাকেন। মীরার সঙ্গে কথা কন। মীরাও কৃষ্ণের সঙ্গে কথা কন।

মীরা কৃষ্ণ প্রেমে বিভোর। কৃষ্ণও মীরার প্রেমে।

মীরা যখন গান করেন, কৃষ্ণ বাঁশী বাজান। বহু লোক স্বকর্ণে শুনেছেন। না। অবিশ্বাসের লেশ নেই।

মীরার অনুগামী হাজার হাজার হ'য়ে পড়লো।

এদিকে মীরা চিতোর ছেড়ে এলে চিতোরে বহু দুর্বিপাক দেখা দিতে লাগলো। দেখা দিতে লাগলো বহু গোলযোগ।

বহু লোক মনে করলো, মীরার চিতোর-ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই চিতোর-ভাগ্যলক্ষ্মীও চিতোর ত্যাগ করেছেন।

মহারাণা ভোজরাজ ইতিমধ্যে নিজের ভুল বুঝতে পেরেছেন। অনুতাপে তিনি জর্জরিত।

একদিন মহারাণা সাধুর ছদ্মবেশে বৃন্দাবনে এলেন। এলেন মীরার কাছে। ভিক্ষা চাইলেন।

মীরা বললেন, সামান্য একজন ভিখারিণী কি ভিক্ষা দিতে পারে?

আমি যা চাইবো, তা' সব-ই তুমি দিতে পারো।

বেশ, তবে বলুন।

মহারাণা নিজের ছদ্মবেশ খুলে ফেললেন। ক্ষমা চাইলেন মীরার কাছে।

চলো, চিতোরে যাই।

মীরা লুটিয়ে পড়লেন স্বামীর পদতলে।

চিতোরে ফিরে এলেন মীরা স্বামীর সঙ্গে।

দিন কাটতে লাগলো।

মীরা সাধু সন্তদের নিয়েই থাকেন। থাকেন গিরিধারীলালকে নিয়ে।

কাটলো কিছুকাল।

হঠাৎ মহারাণা মারা গেলেন।

মীরার বয়স তখন মাত্র তেইশ।

মীরা স্বামীহীনা হয়েছেন।

বিরাট রাজপ্রাসাদের মধ্যে স্বামী ভোজরাজ-ই যা একটু মীরাকে ভালোবাসতেন। তিনিই গত হলেন।

মীরার এখন একমাত্র অবলম্বন গিরিধারীলাল। আশ্রয় মন্দির। সঙ্গী সাধু সন্তরা।

মীরা দিবানিশি নাম-গানেই বিভোর থাকেন।

এদিকে রাজপ্রাসাদের পরিস্থিতি অন্যরকম হ'য়ে পড়লো।

নোতুন মহারাণা হলেন মীরার দেবর রতন সিংহ। তিনি মীরার আচরণ আদৌ পছন্দ করলেন না।

মহারাণা নানাভাবে মীরাকে নির্যাতন করতে লাগলেন।

মীরা গিরিধারীলালের দিকে চেয়ে হাসিমুখে সবই সহ্য করেন।

একদিন উদাবাঈ এলেন মীরাকে বুঝোতে।

উদাবাঈ বললেন, তুমি সাধুসঙ্গ ছাড়, মীরা। সারা সহরে তোমার নিন্দে রটেছে। তুমি তা বোঝো না?

মীরা বললেন, ওদের নিন্দে করতে দাও। দুদিন পরে ওরা সবাই ক্লান্ত হ'য়ে পড়বে।

—জানো মীরা, মহারাণা তোমার উপর ভীষণ রেগে গিয়েছেন। তিনি বিষ এনে রেখেছেন। তোমাকে খাইয়ে মেরে ফেলবেন।

—ভালোই হোলো। সেই বিষ আমি চরণামৃত ব'লে পান করবো।

—বুঝতে পারছো না, মীরা, মহারাণা রাগলে তোমার আর কোনও আশ্রয় থাকবে না। গিয়ে দাঁড়াবে কোথায় ?

—গিরিধারীলাল আমার বিপদে সহায় হবেন। সব বিপদ থেকে তিনি আমায় রক্ষা করবেন। তিনি যে বিপদভঞ্জন!

এতক্ষণে উদাবাঈ ক্ষান্ত হলেন।

কিন্তু ক্ষান্ত হলেন না মহারাণা। তাঁর ক্রোধ আরও বেড়ে গেলো।

একদিন মহারাণা মীরাকে সতর্ক ক'রে দিলেন।

মীরা যেন বাইরের লোকজনের সাথে মেলামেশা না করেন। রাজপুরীর মর্যাদাহানি চিতোর কিছুতেই সইবে না।

মীরা জানালেন, প্রভু ছাড়া, তাঁর নামগান ছাড়া, এ সংসার আমার কাছে অসার। প্রভুর জন্যে আমি উন্মাদিনী।

খুবই বিরক্ত হলেন মহারাণা। মীরার 'পরে লক্ষ্য রাখতে তিনি প্রহরী নিযুক্ত করলেন।

মীরা রাজপ্রাসাদে বন্দিনীর মতো রইলেন।

নদীর স্রোত বাধা পেলে দমিত হয় না। জল ফুলে ফুলে উথ্‌লে ওঠে।

মীরার 'পরে বাধা নিষেধ যত চাপতে লাগলো, তত বাড়তে লাগলো গিরিধারীলালের 'পরে টান।

মীরা একদিন মহারাণাকে স্পষ্টই বললেন।—

মহারাণা, আপনার শত বাধা নিষেধ, শাসন, নির্যাতন আমাকে আর বিচলিত নিরস্ত করতে পারবে না। লোকলজ্জা আমার চ'লে গেছে। আমার অন্তরে বাইরে সব সময়েই গিরিধারীলাল বিরাজ করছেন। তাঁর ধ্যানে, তাঁর সেবা পূজায় আমি দিন কাটাবো। আমি হাততালি দিয়ে নাচবো আর গাইবো তাঁরই নামগান। আমি তাঁর প্রেমে বিভোর। তাঁরই প্রেমে এতটা তন্ময় হ'য়ে থাকি যে আমার বাইরের কোন কিছুতেই হুঁশ থাকে না। মাথার কেশ লুটিয়ে

পড়ে তাও টের পাইনে। আমার ধ্যান জ্ঞান সবই গিরিধারীলাল। সব সময়েই তিনি আমার চোখে চোখে থাকুন। এ ছাড়া আমার আর কোনো কামনা নেই।

মহারাণা বললেন, বটে! দেখা যাক।

মীরা ভক্ত সঙ্গে হরি নামে মাতোয়ারা। দিবানিশি থাকেন ভক্ত সঙ্গে। সব সময়েই হরিকথা ভজন কীর্তন। নাম গান।

সবাইকে বলেন মীরা,

তোমরাও নাম গান কর। শ্রীকৃষ্ণের নাম গান। নাম গানেই সব হবে। সব পাবে। নাম গানই কর।

দিন যায়। মাস যায়।

মীরা গিরিধারীলালের চিন্তায় উন্মত্তের মতো হলেন। কখনও হাসেন। কখনও কাঁদেন। কখনও নাচেন। কখনও ভজন গান করেন।

—দেখা দাও, প্রভু, দেখা দাও। তোমায় না দেখে থাকতে পারছি নে। তুমি দেখা দাও।

মীরা গান ধরেন—

প্যারে দরসণ দীজ্যো আয়,
তুম বিন রহ্যো ন জায়॥

জল বিন কঁবল, চংদ বিন রজনী,
ঐঁসে তুম দেখ্যাঁ বিন সজনী।
আকুল ব্যাকুল ফিরূঁ রৈণ দিন,
বিরহ কলেজো খায়॥

দিবস ন ভুখ নীদঁ নহি রৈণা,
মুখ সূঁ কথন ন আবৈ্ বৈণা।
কহ কহূঁ কুছ কহত ন আবে্
মিলকর তপত বুঝায়॥

কূঁ্য তরসাবো অংতর জামী,
আয় মিলো কিরপা কর স্বামী।
মীরা দাসী জনম জনমকী
পরী তুম্‌হারে পায়

দেখা দিয়ে হরি বাঁচাও আমায়।
তুমি ছাড়া বুঝি জীবন যায় ॥
আমি কমলিনী বিনা যেন সরোবর,
আঁধার রজনী বিনা শশধর,
প্রাণ বিষাদে মলিন খুঁজি নিশিদিন
ধ'রে তারে আর রাখা না যায় ॥
নাই ক্ষুধা-তৃষ্ণা সারা দিনমান

নিদ্‌ হীনা কাটে রাতি।
চির সুন্দর বসো হৃদি মাঝে,
রেখেছি আসন পাতি ॥
বলো হৃদয়ের কথা কাহারে শুধাবো
কি হ'লে আমার যাতনা জুড়ায় ॥

স্বামী অন্তরযামী এ ব্যথা ঘুচাও,
দেখা দিয়ে মোর জীবন বাঁচাও,
জনমে জনমে মীরা তব দাসী।
ঠাঁই মাগে রাঙা পায় ॥

সাধনের সাধ আর মেটে না। নিজেকে সব সময়েই মনে করেন ব্রজগোপী। গোপীরা যেমন কৃষ্ণকে পাবার জন্যে পাগলিনী হয়েছিলেন, লোক লজ্জা সবই বিসর্জন দিয়েছিলেন, মীরাও তেমনি গিরিধারীলালের জন্যে উন্মাদিনী হলেন। বিসর্জন দিলেন আহার-বিহার, সুখসাচ্ছন্দ্য, মানসম্ভ্রম, লোক লজ্জা।

প্রেমের দুকুলপ্লাবী স্রোতে মীরা ভেসে চললেন। গিরিধারীলাল সে প্রেমকল্লোল দেখে চঞ্চল হ'য়ে উঠলেন। স্থির থাকতে পারলেন না। প্রায়ই এসে দেখা দেন।

কৃষ্ণেরে নাচায় প্রেম ভক্তেরে নাচায়।

দিন যায়।

মীরার প্রেমোন্মত্ততা আরও বৃদ্ধি পেলো। জগৎ ভুল হ'য়ে যেতে লাগলো। এই ভাবের মাত্রা দিন দিন আরও, আরও বৃদ্ধি পেতে লাগলো।

মীরা বলেন, প্রভু, যখনই বাইরে কোনও শব্দ শুনি, মনে করি, তুমি এলে বুঝি! বুক আশা নিরাশায় দুলতে থাকে। তোমার জন্যে সর্বক্ষণই পথ পানে চেয়ে থাকি, তুমি এলে নাকি! এলে নাকি! প্রভু, এক রাত্রি ছয় মাস ব'লে মনে হয়। দেরী কোরো না। এসো। তুমি তো জানো, প্রভু, আমার এই দেহ মন প্রাণ সবই তোমার পায়ে সঁপে দিয়েছি। আমার তো আর কিছুই নেই।

বধূ হে, তুমি যে আমারি প্রাণ।
দেহ মন আদি তোমারে সঁপেছি
কুল শীল জাতি মান॥

পিয়া বিন রহ্যো ন জাঈ।
তন মন মেরো পিয়া পর বারূ,
বার বার বলি জাঈ।
নিস দিন জোউঁ বাট পিয়াকো,
কব রে মিলোগে আঈ
মীরাকে প্রভু আস তুমারী
আজ্যো কণ্ঠ লগাই॥

সখি, বিনে প্রিয়তম এ জীবন মম
কেমনে ধরিব রাখি।

পদে করি সমর্পণ দেহ প্রাণ মন
সকাতরে ব'সে ডাকি ॥

নিশি হয় ভোর আসে দিনমণি।
পথ চেয়ে চেয়ে বসে দিন গণি ॥
(পিয়া) কবে পাশে বসি বাজাইবে বাঁশী,
সে দিনের কত বাকী।

মীরা কহে কবে পাব দরশন,
কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাব দুজন,
সখা সহ হবে মধুর মিলন,
সে আশায় বসে থাকি ॥

আর দেরী সয় না। প্রভু, দেখা দাও। দেখা দাও।

সব সময়েই থাকেন উৎকর্ণ হ'য়ে। ঐ আসছেন! ঐ যে তাঁর পায়ের শব্দ শুনতে পাই!

আসছেন। আসছেন আমার গিরিধারীলাল। আমি শুনি।··· আমি শুনতে পাই তাঁর পায়ের শব্দ। নূপুরের গুঞ্জন। প্রভু আসছেন। প্রভু আসছেন।······

এসো, ওগো, এসো আমার হৃদয়েশ্বর! এসো আমার জীবনস্বামী!

মীরা দ্রুত প্রাসাদের ছাদে গিয়ে ওঠেন। পথ দিয়ে আসছেন যে! দাদুরী ডাকে। ডাকে ময়ূর পাপিয়া। নব সাজে সেজেছে কোয়েল। মেঘ গর্জন করে। চমকায় বিদ্যুৎ। মোহন সাজে সেজেছে ধরণী।—এ সব, প্রভু, এ সব, শুধু তুমি আসবে ব'লে। প্রাণ আর ধৈর্য মানছে না। তুমি এসো।

সুনী মৈঁ হরি আবনকী আয়ায়জ।
মহল চঢ়ি জোঁউ মোরী সজনী
কব আবে মহারাজ।

দাদুর মোর পপীহা বোলে
কোইল মধুরে সাজ।
গরজে বদরা মেঘা বোলে
দামিনী ছোড়ী লাজ।
ধরতী রূপ নবা নবা ধরিয়া
কংত মিলনকে কাজ।
মীরা কো চিত ধীরা ন মানে
বেগ মিলো মহারাজ॥

বুঝি আসে মোর হরি, নাম ধ্বনি তারি
শ্রবণে জুড়ায়ে বাজে।
তাই সখি আজ, মোর মহারাজে
খুঁজি রাজপুরী মাঝে।

ধরেছে দাদুরী অদূরে তান,
পিক কুহরে শিহরে প্রাণ,
পুলকে পাপিয়া ডাকে পিয়া পিয়া,
শিখি সুন্দর সাজে॥

মেঘের আননে চমকে দামিনী,
থমকে মধুরে লাজে।
মীরা, বিরহ-বিধুরা ধরণী মধুরা
তাই চাহে মহারাজে॥

প্রভু, এসো। দেখা দাও। দেরী কোরো না। ক্ষণার্ধ সময়ও যেন যুগ ব'লে মনে হয়। 'ত্রুটি যুগায়তে ত্বামপশ্যতাম্'।

স্বাভাবিক অবস্থায় মীরা যখন থাকেন, গোবিন্দের সেবা-পূজা নিয়েই দিন কাটান। নিজের হাতে রেঁধে গোবিন্দের ভোগ দেন।

তাঁকে খাওয়ান। তার আগে নিজে পরীক্ষা ক'রে দেখেন কোন্ খাবার ভালো হয়েছে, কোন্ খাবার হয়নি। যা ভালো হয় নি, তা' গোবিন্দকে দেন না।

বেড়েই চলে প্রেমোন্মত্ততা। মীরা যে একজন রাজমহিষী, সে কথা ভুলেই গেলেন। ভোর হবার আগেই ছাদে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন, প্রিয়তম আসছেন নাকি। চেয়ে থাকেন পথ পানে। বেলা বেড়ে চলে।

হায়রে! সখীরা আমায় সান্ত্বনা দেয়। বলে, পাগলিনী হ'লে নাকি! মন যে কোনও সান্ত্বনাই মানে না, সই। আমার ঘুম নেই। খেতে ভালো লাগে না। তুমি কি বোঝ না, প্রিয়তম বিনা আমি থাকতে পারছিনে একদণ্ডও।

সখী মেরী নীঁদ নসানী হো।
পিয় কো পংথ নিহারত,
সিগরী রৈণ বিহানী হো॥

সব সখিয়ন মিলি সীথ দঈ
মন এক ন মানী হো
বিন দেখ্যাঁ কল নাহিঁ পড়ত,
জীয় ঐসী ঠানী হো॥
অংগি অংগি ব্যাকুল ভঈ,
মুখ পিয় পিয় বানী হো।
অংতর বেদন বিরহকী;
বহ পীড় ন জানী হো॥

জ্যোঁ চাতক ঘন কূঁ রটে,
মছরী জিমি পানী হো।
মীরা ব্যাকুল বিরহনী
সুধ-বুধ বিসরাণী হো॥

সখি আঁখিপাতে নিদ নাহি মোর,
প্রিয় পথ পানে চেয়ে নিশি হোলো ভোর।

সুধাইছে মোরে প্রবোধ বচনে
মিলি সব সখীগণে।
দিন কাটে নাতো হায় প্রাণ রাখা দায়,
বিনা প্রভু দরশনে।

প্রভু, আকুল করেছ প্রাণ, তাই গাহি তব গান,
হিয়ায় ধৈরয নাহি মানে।
বিরহ বেদনা ভার সহিতে না পারি আর,
জানো, তবু ভুলে কোন প্রাণে।

চাতকিনী বাঁচে মেঘ বরিষণে,
মীন বাঁচে জলাধারে।
ঘুচাইতে তৃষা জুড়াইতে প্রাণ,
মীরা আছে দেহ ধ'রে॥
এসো প্রিয়তম বসো মোর পাশে
মুছাইতে আঁখি লোর॥

মহারাণা মীরার 'পরে দারুণ বিরক্ত হলেন। তিনি মন্ত্রীদের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে নানাভাবে নির্যাতন করতে লাগলেন মীরাকে।

নিত্য নোতুন ধরণের অত্যাচার চলতে লাগলো মীরার 'পরে। তা চলুক।

মীরা গাইলেন—

রাণা উপহার পাঠালেন সাপের একটা চুপড়ি। মীরা পূজো ক'রে হাত রাখলো তাতে। ছাখো, ছাখো, সাপটি হ'য়ে গেলো প্রিয়তমের এক মোহন মধুর ছবি। রাণা পাঠালেন, বিষের একটি

পাত্র। মীরা প্রার্থনা করলো, পান করলো বিষ। সে বিষ হোলো অমৃত। রাণা পাঠালেন মীরার শয়নের জন্য কণ্টকের এক শয্যা। সন্ধ্যা হোলো। মীরা সেই শয্যায় শয়ন করলো। ছাখো ছাখো। শয্যা হ'য়ে গেলো গোলাপে গোলাপে পূর্ণ। মীরার প্রভু এখন থেকে মীরাকে সকল বিপদ থেকে রক্ষা করছেন। মীরা গিরিধারীলালের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। গভীর প্রেমে বিভোর হ'য়ে মীরা এখানে ওখানে ঘুরে বেড়ায়।

মীরা অত্যাচারে ভীত নন। কিন্তু বিপদ হোলো, সাধন ভজনে বিঘ্ন ঘটছে। মীরা তাইতে ব্যতিব্যস্ত হ'য়ে পড়লেন। উপায়ান্তর না দেখে তিনি মহাত্মা তুলসীদাসকে একখানি পত্র লিখে পাঠালেন। তিনি ছিলেন তখন কাশীতে।

ঘরকে স্বজন হামারে যেতে সবন
উপাধি পরহাইয়ী।
সাধু সং আরু ভজন করত্ মোহে
দেত কলেস আধায়ী ॥

বাল্পণে সে মীরা কি নি
গিরধারলাল মিতায়ী।
সো তাউ অব্ ছুটে নহিঁ কিয়োঁ হো
লগি লগন বরিয়ায়ী।

চলায়, পথের কাঁটা তারাই হোলো
ঘরের যারা আপন জন।
হায় অভাগিনী—কেউ আর বুঝলো না তোর মন ॥

কোথাও সাধু সঙ্গে গেলে চলে
তারা আগুন হ'য়ে ওঠে জ্বলে,
আমাব সাধুভক্তি নামাসক্তি
(হয়) বিরক্ত সব এ কারণ ॥

আমি আশৈশব সেই গিরিধারী
ভক্তিভরে পূজা করি।
গেছি প্রাণে প্রাণে বাঁধা পড়ি,
(আর) ছিড়তে নারি সে বাঁধন ॥

তুলসীদাস বুঝেছিলেন মীরার যাতনা। সঙ্গে সঙ্গেই জবাব দিলেন। তিনি উদ্ধারের পথ দেখালেন।

জা কে প্রিয়ে ন রাম বৈদেহী,
ত্যাজ্যো তাহি কোত বৈরী সম
যদপি পরম সনেহী ॥
ত্যাজো পিতা প্রহ্লাদ, বিভীষণ বন্ধু,
ভরত মাতারি।
বলি গুরু ত্যাজো. কান্ত ব্রিজ বনিতাঁ
ভায়ে মুদ মঙ্গলকরী ॥
নাতে নে রাম সো মানিয়ত
সুহ্রদ সুয়েবা জাহাঁ লঁউ
অঞ্জন কাঁহা আঁখ যেহি ফুটে ॥
বহুতক কহোঁ কহুঁ লঁউ ॥
'তুলসী' সো ভান্ত পরম হিত
পূজ্য প্রাণ তে পিয়ারো।
যাতে হোঈ সনেহা রাম পদ
এ্যাসে 'মত' হামারো।

যারা রাম ও সীতাকে প্রিয় মনে না করে, তারা যতই নিকট আত্মীয় হোন না কেন, তাদের পরম শত্রু ব'লে ত্যাগ করো। প্রহ্লাদ তাঁর বাপকে অমান্য করেছিলেন। বিভীষণ তাঁর ভাইকে ত্যাগ করেছিলেন। ভরত ত্যাগ করেছিলেন তাঁর মাতাকে। শুধু তাই নয়। বলি তাঁর গুরুদেবকে ত্যাগ করেছিলেন। আর, গোপীরা,

শুধু তাদের প্রভুকে দেখবার জন্যেই, তাঁদের স্বামীকে ত্যাগ করেছিলেন। এদের সবারই আচরণ সারা জগতের সকলেরই কাছে সুখ ও আশীর্বাদ স্বরূপ। একমাত্র ভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধ বিচারে সব আত্মীয় স্বজন ভালোবাসার যোগ্য। অঞ্জনের সার্থকতা কোথায়?—যদি তা চোখ অন্ধই করে। এই থেকে সব বুঝে নাও। আর কিছুই বলবার নেই। তিনি সকল দিক দিয়ে একমাত্র মহান বন্ধু। তিনি তোমার সম্মানের যোগ্য, তিনিই তোমার প্রাণাধিক প্রিয়, যিনি তোমার প্রভুর জন্যে প্রেমের আগ্রহ বাড়িয়ে তুলতে পারেন। এই-ই হোলো তুলসী দাসের অভিমত।

মীরা সংকেত গ্রহণ করলেন।

মহারাণাও এই সময়ে মীরাকে আদেশ করলেন,

চিতোর ত্যাগ করে চ'লে যাও। এই মুহূর্তেই।

গোবিন্দের জন্যে মীরা সর্বস্ব পণ করেছেন। মীরার আবার কিসের ভাবনা?

মীরা মন্দিরে গেলেন। প্রণাম করলেন ঠাকুরকে। গাইলেন গান। নাচলেন। আবার গাইলেন।

চোখের জল অঝোরে ঝরলো।

প্রভু, ওগো অন্তরবিহারী, বাইরে আর তোমার প্রয়োজন নেই। এখন থেকে তুমি আমার অন্তরেই বিরাজ করো। বিরাজ করো অন্তরতম হ'য়ে। প্রেমময়, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।—মেরে তো গিরিধর গোপাল দুসরা ন কোঈ।

মীরা চিতোর ত্যাগ করলেন।

চিতোর ছেড়ে মীরা রাজস্থানের সর্বত্র ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। পথে প্রান্তরে, বনে উপবনে, গ্রামে নগরে। চলে দিবানিশি ভজন গান। চলে দিবানিশি গোবিন্দের নাম কীর্তন।

সারা দেশ উদ্বেল হ'য়ে উঠলো। হাজার হাজার লোক মীরার অনুগামী হোলো।

প্রভু, তোমারই জন্যে সব সুখ ছেড়ে বেরিয়েছি। আমাকে আর বিরহের মধ্যে রেখো না। আমি যে তোমাকে না দেখে এত কষ্ট পাচ্ছি, অন্তরবিহারী তুমি, তুমি কি তা বোঝো না? তুমি কি বোঝো না?—

ছটফট করে প্রাণ রহিতে না পারি।
খেণে খেণে জীয়ে প্রাণ খেণে খেণে মরি॥

তুমি এসো। তুমি এসো। শুধু আসা নয়। দরশন নয়। আমার দেহে দেহে পরশন দাও। 'প্রাণে প্রাণে মিলনে মিলাও'।

আশ্রয় নেই। বাসস্থান নেই। মীরা ভিখারিণী। গোবিন্দজীর উপর নির্ভরতা তাই বাড়লো। খুবই বাড়লো।

মীরার কাছে আজ সবই কৃষ্ণময়।

'তাত মাত ভ্রাত বন্ধু আপনা ন কোঈ।' কেউ আপনার নয়। কেউ আপনার নয়। সব-ই তিনি। সব-ই গিরিধারীলাল।

মীরা গিরিধারীলালের উপর সব ভার ছেড়ে রাজস্থানে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন।

তুম্‌হারে কারণ সব সুখ ছোড়্যা
অব মোহে ক্যুঁ তরসাও।

প্রভু, আমি যে তোমার জন্যেই সব ছেড়েছি।

'মীরার সকলই তুমি আর কেউ নাই স্বামী
রাখ মান রাখ তার লাজ।'

ব্রজগোপীরা কৃষ্ণবিরহে কাতর হ'য়ে যেভাবে দিন কাটাতেন, মীরার ব্যাকুলতাও সেই রকম হোলো। ঠিক সেই রকমই মীরার অবস্থা হোলো। মীরা আজ ভাবে পাগলিনী।

ওগো, প্রাণ থাকতে যেন দরশন পাই। তোমার চরণে আমার প্রাণ রেখো।

প্রাণ রহত মোকো দরশন দীজ্যো
প্রাণ রখো চরণাঈ।

মাঝে মাঝে বিপুল বিরহভারে ভেঙ্গে পড়েন মীরা। ঝাঁপ দেন অশ্রুর স্রোতস্বিনীতে। আবার কখনও বা মিলনের গভীর আনন্দে 'প্রেম থেহ নাহি পায়'। প্রিয় মিলনের সুখে আনন্দ-কল্লোল দৃষ্টির দুকূল ছাপিয়ে উথ্‌লে উথ্‌লে ওঠে।

কেউ ভাবলো মীরা পাগলিনী।—আহা! কেউ বা করুণার চোখে চেয়ে দেখলো।—আহা! যারা কিছু বুঝলো, তারা মীরার পিছু পিছু চললো।

চলো চলো, সঙ্গে যাই। সঙ্গে যাই।

কখনও কখনও গোবিন্দ দেখা দিতেন। যাবার সময় মীরাকে ব'লে যেতেন আবার আসবো। আবার দেখা হবে।

কিন্তু সে তো কত সময় হ'য়ে গেলো! এক যুগ কেটে গেলো বোধ হয়। ওগো, তুমি কি বোঝো না, আমি তোমার বিরহ আর সইতে পারছিনে! কী কঠিন তোমার হৃদয়!

দেখো সইয়াঁ হরি মন কাঠ কিয়ো।
আবন কহিঁ গয়ো অজহুঁ ন আয়ো,
করি করি বচন গয়ো।
খান পান সুধ-বুধ সব বিসরী
কৈসে করী মৈঁ জিয়ো॥
বচন তুম্‌হারে তুমহিঁ বিসারে,
মন মেরো হর লিয়ো॥
মীরা কহে প্রভু গিরিধর নাগর,
তুম বিন ফাটত হিয়ো॥

মোর দুঃখের কাহিনী শোনোগো সজনী
পাষাণে গড়া ও শ্যাম।
এই আসি বলে কোথা গেল চলে
কি তার কথার দাম?
সখি জীবনে আমার ক্ষুধাতৃষ্ণার
চেতনা নাহিক আর।
না হেরি নয়নে সে রূপ-রতনে
প্রাণ রাখা হোলো ভার॥

মীরা কহে হরি এসো ত্বরা করি
দেখা দিয়ে প্রাণ রাখো।
অনল দহন না যায় সহন
কোন প্রাণে ভুলে থাকো?

দিন যায়।

গিরিধারীলালের কৃপা অঝোরে ঝ'রে পড়তে লাগলো মীরার উপর।

মীরা যখনই গিরিধারীলালকে দেখতে চাইতেন, তিনি তাঁকে দেখা দিতেন। সুস্মিতবদন মীরার সঙ্গে কথা কইতেন।

মীরা দেখতেন, তাঁরই সম্মুখে রয়েছেন তাঁর গিরিধর গোপাল। শিরে তাঁর ময়ূর মুকুট। তাঁর চারি হাতে শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম। গলায় বনফুলের মোহন মালা।

মীরা দেখতেন।

অস্ফুটে তাঁর মুখ হ'তে বেরুতো, মেরে গিরিধর গোপাল, মেরে গিরিধর গোপাল।

আনন্দে দুই চোখ দিয়ে অশ্রুর কালিন্দী প্রবাহিত হোতো।

প্রেমময় তখন যেন বলতেন, মীরা, তুমি কি জান না, আমি

তোমার প্রেমে তোমার কাছে বাঁধা রয়েছি। কী সাধ্য আমার যে তোমাকে ছেড়ে থাকি?

না, এতেও মীরার তৃপ্তি নেই!

মীরা চান, তাঁর গিরিধারীলাল তাঁর চোখের সামনে অহরহ বিরাজ করেন। ক্ষণকালের জন্যেও যেন চোখের আঁড়াল না হন। সে দর্শনে যেন ছেদ না পড়ে। 'ঠারি রহ মেরি আখনক আগে'।

মীরার বৃন্দাবনে যাবার বাসনা হোলো।

ভাবনা কি? চলো।

ভয় কি? চলো, চলো।

কৃপার বাতাস বইছে। অনুকূল বায়ুতরঙ্গে অনায়াসেই তোমাকে পৌঁছে দেবে কৃপাময় প্রেমসুন্দরের বন্দরে।

তুমি চলো, চলো, চলো।
কিনা ব্রজ, ব্রজ, ব্রজ।
চলো, চলো। ব্রজ, ব্রজ।

মীরা গাইতে গাইতে চললেন।—

গো জী মহারাজ ছোড় মত জাজ্যো।
—মোরে ছাড়িয়া যেওনা মহারাজ।

মীরা বৃন্দাবনে চলেছেন।

কৃষ্ণ রাখাল বালক সেজে সব সময়েই সঙ্গে সঙ্গে রয়েছেন।

মীরা তা বুঝতে পারেন। বেশ বুঝতে পারেন।

এই হাসছেন। এই বাঁশী বাজাচ্ছেন। এই অদৃশ্য হলেন।

লুকোচুরি খেলা চলে।

বৃন্দাবনে এসে মীরা আত্মহারা হ'য়ে পড়লেন।

যেখানেই যান মীরার ভাব-সমাধি হ'তে লাগলো।

মীরা দেখেন, কৃষ্ণ রাখাল বালকদের সাথে খেলা করছেন। কখনও দেখেন, ব্রজগোপীদের সঙ্গে বনে বনে আনন্দে বিহার করছেন।

মীরা দেখেন। চোখ দিয়ে জল ঝরে।

মীরার আগমনে বৃন্দাবন নবরূপ ধারণ করলো।

মীরারও আনন্দ ধরে না।

বৃন্দাবনের স্মৃতি তাঁকে মুগ্ধ করে। মনে আসে সেই অতীত দিনের কথা।

তাঁর মনের অভিলাষ. এখানেই থেকে গিরিধারীলালের লীলা-বিলাস উপভোগ ক'রে দিন কাটান।

মীরা গান করেন—

মৃহঁনে চাকর রাখো জী—
চাকর রহসূ বাগ লগাসূঁ
নিত উঠ দরসন পাসূঁ।
বৃন্দাবন কী কুঞ্জ গলিন মে
তেরী লীলা গাসু,
চাকরীমেঁ দরসন পাউঁ,
সুমিরণ পাউঁ খরচী,
ভাবভগতি জাগীরী পাউঁ
তিনো বাতাঁ সরসী।
হরে হরে সব বাগ লগাউ
বিচ বিচ রাখুঁ বারী,
সাঁবলিয়া কা দরসন পাউঁ
পহির কুসুম্মী সারী।
জোগী আয়া জোগ করণ কূ
তপ করণে সন্ন্যাসী।
হরী ভজন কূ সাধু আয়ে
বৃন্দাবনকে বাসী।

মীরাকে প্রভু গহির গঁভীরা
হৃদয় রহোজী ধীরা।
আধীরাত প্রভু দর্সন দেহেঁ
প্রেমনদীকা তীরা।

রাখ দাসী ক'রে প্রভুজী আমায়
ফুল বাগিচার কাজে।
গাঁথি ফুলে ফুলে মালা সাজাব তোমায়
সারাটি সকাল সাঁঝে।

পরাব মালিকা করিয়া যতন,
নিরখিবে রূপ এ দুটি নয়ন,
(তব) লীলা কীর্তনে মাতাব ব্রজের
সারা বন উপবন।

আমি ফুলের বসনে ফুলের ভূষণে
ভ্রমিব সে মধুকুঞ্জে।
বৃন্দাবনের কালো এ ভ্রমরা
মধু লোভে যেথা গুঞ্জে।
সেথা হৃদয় কুসুমে পুঁজিয়া চরণ
উসুল করিব কাজের বেতন।
আমি শ্যামল শোভার কুঞ্জ রচিব
বনরাজি যেথা রাজে॥

যেথায় প্রভুর রাজে শ্রীচরণ,
সেথাই জগতে মধু বৃন্দাবন,
সেথা ব'সে যোগাসনে যোগী করে ধ্যান
খোল কীর্তন মাতাইছে প্রাণ।

মীরার প্রভুজী ধীর গম্ভীর
সাজি ল'য়ে পীতবাসে,
আধেক রজনী হলে অবসান
যমুনার তীরে আসে।
গিয়ে বাঁধি প্রেম ডোরে বসাব নাগরে
হৃদি নিকুঞ্জ মাঝে ॥

শ্রীপাদ রূপ গোস্বামী একজন বড় সাধক। বৃন্দাবনের ছয় গোস্বামীর একজন। বৃন্দাবনে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের মধ্যমণি।

মীরা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাইলেন।

শ্রীপাদ রূপ স্ত্রীলোকের মুখ দেখেন না। তিনি সম্মত হলেন না।

মীরা জানালেন, শ্রীপাদ, আজও আপনার স্ত্রী পুরুষে ভেদ যায় নি! আমি তো জানি, বৃন্দাবনে মাত্র একজনই পুরুষ আছেন। আর সবাই প্রকৃতি। যদি, গোস্বামীজী, নিজেকে গোপী না ভেবে পুরুষ জ্ঞান করেন, তবে শ্রীকৃষ্ণের লীলাক্ষেত্র বৃন্দাবন ত্যাগ ক'রে অন্য কোথাও অবিলম্বে গমন করুন।

শ্রীপাদ রূপ নিজের ভুল বুঝতে পারলেন।

অবিলম্বে ছুটে এলেন মীরার কাছে। তিনি এসে দেখলেন, মীরা একজন উচ্চস্তরের সাধিকা। বুঝলেন, মীরা প্রকৃতই একজন ব্রজগোপী। কৃষ্ণ প্রেম বিলোবার জন্যেই ধরায় অবতীর্ণ হয়েছেন।

মীরা ও শ্রীপাদ রূপ উভয়েই উভয়কে গুরু ব'লে মনে ক'রে কিছু কাল সাধনভজনে নিরত রইলেন।

মীরা বৃন্দাবনে রয়েছেন। রয়েছেন প্রেমের রাজ্যে, এখানে শুধু প্রেম, শুধু ভালোবাসা।

মীরা গান করেন। সে গান উৎসারিত হয় হৃদয়কন্দর থেকে। সে গান শুনে সবাই ওঠে মেতে।

মীরা নিত্যই দরশন পান কৃষ্ণের।

মীরা যান বৃন্দাবনের বর্ষাণায়, যান মথুরায়। এখানে ওখানে ঘুরে বেড়ান। সব জায়গায় পূর্বতন দৃশ্যগুলি দেখতে লাগলেন স্বচক্ষে।

মীরা এলেন দ্বারকায়।

এলেন সারাটি পথ হরিনাম করতে করতে।

এখন তিনি এমনই স্তরে উপনীত হয়েছেন, যখনই তাঁর ইচ্ছা হোতো দেখা পেতেন গোবিন্দের। গোবিন্দ যেন মীরার আজ্ঞাবহ।

এতেও মীরার মন মানে না।

মীরা গোবিন্দের বিরহ এক মুহূর্তের জন্যেও সইতে পারেন না। গোবিন্দকে আর এতটুকু দূরে রাখতে তাঁর সহ্য হয় না। তিনি চান সদা সর্বক্ষণই গোবিন্দ তাঁর সঙ্গে সঙ্গে থাকেন। হন তাঁর সহচর।

তোমাতে আমি তন্ময় হ তে চাইনে। আমি তোমাকে দেখতে চাই। ধরতে চাই। শুনতে চাই অহর্নিশ তোমার কথা। তুমি এসো। এসো আমার সকল অনুভব-গণ্ডীর মধ্যে। প্রাণের সাধনায় পাওয়া সুন্দর আনন্দ-ঘন একটি যথার্থ কলেবরের মধ্যে। আমার অল্পে সুখ নেই। অস্পষ্টে সুখ নেই। অগোচরে সুখ নেই। আমি চাই অনাবৃত দর্শন। সর্বক্ষণের দর্শন। এই কথা কয়টি বলেছিলেন বালক ধ্রুব শ্রীহরির দর্শন পেয়ে।

মীরার মনের কথাও এই।

মীরা দাসী জনম জনমকী
মম অঙ্গসুঁ অঙ্গ লগাও।
(প্রভুজী) মম চিত্তসুঁ চিত্ত লগাও ॥

মীরা মাঝে একবার বৃন্দাবনে এলেন।

কিছুকাল বৃন্দাবনে থেকে আবার চ'লে এলেন দ্বারকায়

সেদিন মীরা রয়েছেন দ্বারকায় প্রভুর মন্দিরে।

আগে থেকেই তিনি বুঝেছেন, আজই তাঁর পরম মিলনের লগ্ন।

মীরা ডাকলেন সবাইকে। ভজন আরম্ভ করলেন।

বয়স হয়েছে তেষট্টি। তা হোক।

মীরা শিশুর মতো নাচতে লাগলেন।

আজ মীরার দৃষ্টি সমাগত সকলের 'পরে।

যিনি যা বলছেন তার জবাব দিচ্ছেন। যিনি যে গান শুনতে চাইছেন, মীরা সেই গান-ই গাইছেন।

আজ যে মীরার পরম মিলনের লগ্ন।

সবাই স্তব্ধ হ'য়ে রয়েছেন।

মীরার সর্বাঙ্গে স্বর্গীয় দীপ্তি! আননে দিব্য বিভা।

যত লোক রয়েছেন মন্দিরে, সবাই দেখছেন—

এই রয়েছেন মীরা, এই আবার কৃষ্ণ মীরার শরীরে প্রবেশ ক'রে সবাইকে দেখা দিলেন।......

এ এক অপূর্ব দৃশ্য!

সবারই নিরুদ্ধ দৃষ্টি মীরার দিকে।

মীরা গান গাইছেন। একটির পর একটি। অবিরাম।

মীরা গাইছেন।

মীরা আজ ভাবে প্রমত্ত।

মীরা গাইছেন।

অকস্মাৎ সারা মন্দির দিব্য জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠলো। দিব্য ভাবে সারা মন্দির পরিপূরিত হোলো।

সকলে সচকিত বিস্ময়ে দেখলেন, বিগ্রহ উন্মুক্ত হ'য়ে পড়লো।

সেই বিগ্রহের অভ্যন্তর থেকে আবির্ভূত হলেন গোবিন্দ স্বয়ং।

দুই হাত বাড়িয়ে গোবিন্দ বুকে টেনে নিলেন মীরাকে।

গোবিন্দ ও মীরা আবার বিগ্রহের মধ্যে প্রবেশ করলেন।

বিগ্রহ যেমনটি ছিল ঠিক তেমনটিই হোলো।

কেউ আর মীরাকে দেখতে পেলেন না।

সমাগত ভক্তজন নাম-গান শুরু করলেন।

ভজন ভরোসে অবিনাশী,
ম্যাঁয় তো ভজন ভরোসে অবিনাশী।
জপতপ তীরথ কচ্ছ এ ন জানুঁ
বেদ পাঢ়য়ো ন গা কাশী।
মীরা কে প্রভু গিরিধর নাগর
চরণ কমল কৌ হুঁ দাসী॥

শুধু ভরসা জীবনে তোমার ভজন,
হে ভব-করুণাসিন্ধু!

না ঘটেছে মোর তীর্থ পর্যটন,
কাশী গিয়ে বেদ হয়নি পঠন,
তপ-জপ-ধ্যানে উদাসী এ মন
পেলো তবু কৃপাবিন্দু।

তবু যা জানার জানালে এবার,
(মীরা) চরণ-কমলে দাসী হে তোমার,
গিরিধারী প্রভু সংসারের সার,
হেরিনু সে মুখ ইন্দু!

তাই নিয়ত এ চিত বন্দনারত
বিশ্ব-নিখিল-বন্ধু!

শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব, স্যার জন উড্রফ ও দেবী সর্বমঙ্গলা

'এখনও লক্ষ লক্ষ তান্ত্রিক সিদ্ধ-সাধক মহাপুরুষগণ নিজ নিজ তপঃপ্রভাবে ভারতের দিগ-দিগন্ত উজ্জ্বলিত করিয়া রহিয়াছেন। এখনও ভারতের শ্মশানে শ্মশানে প্রতি অমাবস্যার ঘোর মহানিশায় প্রজ্জ্বলিত চিতাগ্নির সঙ্গে সঙ্গে ভৈরব ভৈরবীগণের জ্বলন্ত দিব্য-জ্যোতি নৈশ তমস্তরঙ্গ বিদীর্ণ করিয়া গগনাঙ্গন আলোকিত করে। এখনও শ্মশানের জলমগ্ন মৃত ও পর্য্যষিত শবদেহ সাধকের মন্ত্রশক্তি প্রভাবে পুনর্জাগ্রত হইয়া সিদ্ধি সাধনার সাহায্য করে। এখনও তান্ত্রিক যোগিগণ দৈবদৃষ্টি প্রভাবে এই মর্ত্যলোকে বাস করিয়া দেবলোকের অতীন্দ্রিয় কার্যসকল প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। এখনও ভবভয়ভীত প্রণত শরণাগত ভক্ত সাধককে মুক্ত করিবার জন্য ভক্তভয়ভঞ্জিনী মুক্তকেশী মহাশ্মশানে দর্শন দিয়া থাকেন। এখনও ব্রহ্মময়ীর সেই ব্রহ্মাদিবন্দিত পদাম্বুজে ব্রহ্মরন্ধ্র স্থাপন করিয়া সাধক ব্রহ্মস্বরূপে মিশিয়া যান। এখনও মন্ত্রশক্তির অদ্ভুত আকর্ষণে পর্বতনন্দিনীর সিংহাসন টলিয়া থাকে। মুক্তিপুরীর অশ্রান্ত যাত্রী সাধকের পক্ষে ইহাই চিরপ্রশস্ত রাজপথ। শয্যাশায়ী মুমূর্ষু অন্ধের পক্ষে হয়ত ইহা অন্ধকার বই আর কিছুই নহে; কিন্তু অন্ধ, নিশ্চয় জানিও— এ অন্ধকার তোমারই নয়নপথে।'

না, এই কথা কয়টি কেবলমাত্র মৌখিক ঘোষণা নয়। নিছক ভাষণ নয়। নিজের ব্যক্তিগত জীবনে উপরিউক্ত প্রতিটি ক্রিয়াকলাপ সার্থকভাবে আচরণ ক'রে যিনি পূর্ণ সফলকাম হয়েছিলেন, যিনি এই কথাগুলি বলবার যথার্থ অধিকারী ছিলেন, তিনি হলেন অসাধারণ শক্তিধর মহাপুরুষ তন্ত্রাচার্য শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব।

তন্ত্রশাস্ত্র আর তার ধারক ও বাহক তান্ত্রিকদের সম্বন্ধে বেশ কিছুকাল ধ'রে আমাদের দেশে বিকৃত ব্যাখ্যা ও ভাষণ চলে আসছিল।

ফলে বহু ধর্মপ্রাণ মানুষ বিভ্রান্ত হ'য়ে সুমহান এই তন্ত্রশাস্ত্র ও অতীব শ্রদ্ধেয় অসামান্য ক্ষমতার অধিকারী তান্ত্রিকদের সম্বন্ধে শ্রদ্ধাহীন হ'য়ে পড়লেন। যে সকল মহাত্মা তন্ত্রশাস্ত্রের অন্তর্নিহিত তত্ত্বগুলি সকলের সামনে স্বচ্ছভাবে তুলে ধ'রে তন্ত্রশাস্ত্র ও তান্ত্রিকদের সম্বন্ধে সবাইকে আবার শ্রদ্ধাশীল ক'রে তুললেন, তাঁদের মধ্যে মহাত্মা শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব একজন পুরোধা। তিনি বর্তমান ভারতের একজন অদ্বিতীয় পণ্ডিত। তন্ত্রসাধনা ও তার প্রচারে একজন মহাসাধক ও শ্রেষ্ঠ আচার্য।

এই শিবচন্দ্রের জন্ম হয় ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে নদীয়া জেলার কুমারখালি গ্রামে।

শিবচন্দ্রের পিতার নাম চন্দ্রকুমার তর্কবাগীশ। পিতামহ হলেন কৃষ্ণসুন্দর ভট্টাচার্য। কৃষ্ণসুন্দর একজন খ্যাতনামা পণ্ডিত ও মহাতান্ত্রিক ছিলেন।

শৈশবে শিবচন্দ্রের বিদ্যারম্ভ হোলো খ্যাতনামা সাধক কাঙাল হরিনাথের কাছে। এরপর শিবচন্দ্র নবদ্বীপের এক চতুষ্পাঠীতে পড়াশুনা করেন। সেখানে পড়েন কাব্য ব্যাকরণ ও অলঙ্কার।

নবদ্বীপে থাকাকালে কৈশোরেই মৈথিলী পণ্ডিতদের সঙ্গে বিচারে পাণ্ডিত্য দেখিয়ে শিবচন্দ্র কবিরত্ন উপাধি লাভ করলেন। নেহাৎ সঙ্কোচবশত তিনি এ উপাধি কখনো ব্যবহার করেন নি।

এরপর কলকাতায় এসে শিবচন্দ্র বিদ্যাসাগর উপাধি পরীক্ষা দিলেন। কৃতিত্বের সঙ্গে পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হলেন। কিন্তু তাঁর গুরুস্থানীয় জীবনানন্দ বিদ্যাসাগর উক্ত উপাধি পেয়েছেন জেনে তিনি এ উপাধি গ্রহণ করলেন না।

শিবচন্দ্র নিজে বলেছেন, ভেবে দেখলাম, আমার গুরুস্থানীয় জীবনানন্দ বিদ্যাসাগর মহাশয় বেঁচে থাকতে 'বিদ্যাসাগর' উপাধি ব্যবহার করা আমার পক্ষে সমীচীন হবে না। এতে তাঁর অসম্মান করা হবে। কাজেই এ উপাধি আমি বর্জন করেছি।

এরপর শিবচন্দ্র কাশীধামে গেলেন। প্রসিদ্ধ বৈদান্তিক পণ্ডিত

রামরাম স্বামীর কাছে তিনি বেদান্ত অধ্যয়ন করলেন। অল্প সময়ের মধ্যেই আয়ত্ত করলেন ষড়্দর্শন।

কাশী থেকে ফিরে এসে পিতামহ কৃষ্ণসুন্দরের কাছে শিবচন্দ্র দীক্ষা নিলেন ও তন্ত্রশাস্ত্র অধ্যয়ন করলেন। এই সময় থেকে তিনি তান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপ আচরণ করতে শুরু করেন।

শিবচন্দ্র সাধনপথে দ্রুত এগুতে লাগলেন। কিছুকালের মধ্যেই তাঁর জীবনে দিব্যদর্শন লাভ হ'তে থাকে। শিবচন্দ্রের আরাধ্য দেবতা ছিলেন দেবী সর্বমঙ্গলা। দেবী সর্বমঙ্গলা শিবচন্দ্রকে নানারূপে দেখা দিতে লাগলেন। শিবচন্দ্র নিজে এই অবস্থার বর্ণনা দিচ্ছেন অনবদ্য ভাষায়।—

এই দেখছি শ্যামাঙ্গিনী হচ্ছে আবার হেমাঙ্গিনী।
এই দেখছি মা রক্ত-বস্ত্রা, অমনি দেখি উলঙ্গিনী।
এই যে মা তোর বেণীবন্ধ আবার দেখি মুক্তকেশে।
এই দেখি ভ্রূকুটিভঙ্গী, আবার দেখি আসছে হেসে।
এই দেখি মা তীক্ষ্ণ অসি, শোভিছে বাম করোপরে।
এই দেখি মা জপের মালা ঘুরিছে ঐ দক্ষিণ করে।
এই দেখি মা সিংহাসনে, আবার দেখি পদ্মাসনে।
আবার দেখি ঘোর শ্মশানে, নাচছ শব শিবাসনে।
এই দেখি কিশোরী, মাগো, হচ্ছ আবার ষোড়শী।
অমনি ভীমা ধূমাবতী, অমনি রমা রূপসী।
এই দেখি মা দৈত্যের জিহ্বা, ধরেছ ঐ বাম করে।
আবার দেখি দক্ষিণ হস্তে, অভয় দিচ্ছ অমরে।
এই দেখি মেতেছো, মাগো, শত্রুর সনে সমরে।
আবার দেখি পুত্রস্নেহে ঝরছে দুধ ঐ পয়োধরে।
এই দেখি মা ত্রিনয়নে চন্দ্র সূর্য অগ্নি জ্বলে।
আবার দেখি সেই নয়নে করুণা কটাক্ষ গলে।

এমনি ভাবেই দেবী সর্বমঙ্গলা তাঁর স্নেহের দুলালকে ভোলাতে দোলাতে মাতাতে রাঙাতে লাগলেন।

শিবচন্দ্র নিত্য আরাধনা করতেন দেবী সর্বমঙ্গলার। তাঁর নামে তিনি বিভোর হ'য়ে থাকতেন। অথচ দিনভর কত কাজ-ই না করতেন! কত গ্রন্থ রচনা করেছেন! কত গান লিখেছেন! রচনা করেছেন কত কবিতা! এদিকে তন্ত্রোক্ত ক্রিয়াকলাপ, পূজা অর্চনা সবই তো রয়েছে। পূজা অর্চনায় তিনি সামান্যতম ত্রুটিও সইতে পারতেন না।

তাই শিবচন্দ্রের আর্থিক অনটন লেগেই থাকতো। এই নিদারুণ আর্থিক দুর্গতির মধ্যে অপূর্ব একটা অলৌকিক ঘটনা ঘ'টে গেলো।

সেটা ১২৮২ সালের বৈশাখ মাসের এক দিনকার ঘটনা।

সে সময়ে শিবচন্দ্র কুমারখালির নির্জন গৃহে বাস করছেন।

নিত্যকার মতো সেদিনও দেবী সর্বমঙ্গলার সম্মুখে একটি ত্রিকোণ অগ্নিকুণ্ড প্রজ্জ্বলিত ক'রে শিবচন্দ্র ধ্যানে নিমগ্ন রয়েছেন। সংসারের ভাবনা আদৌ নেই। অন্য কোনও দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। দেবী সর্বমঙ্গলাই তাঁর ধ্যানজ্ঞান জপ তপস্যা।

কিছুদিন থাকতেই তীব্র অর্থকষ্ট চলছে।

শিবচন্দ্রের কন্যা কালী তখন কোলের মেয়ে। তার দুধের পয়সাও জুটছে না। সপরিবারে শিবচন্দ্র দুইদিন উপবাসী রয়েছেন।

লক্ষ্মীরূপা গৃহিণী ওষ্ঠাগতপ্রাণ কালীকে কোলে নিয়ে বিষণ্ণ মুখে শিবচন্দ্রের পাশে ব'সে রয়েছেন।

চোখের সামনে দুধের বাছা না খেয়ে মরতে চলেছে, মা-নামে তন্ময় সাধক সেদিকে ভুলেও দৃষ্টি দিচ্ছেন না।

শিবচন্দ্র দেবী সর্বমঙ্গলার সর্বমঙ্গলময় বিধান চিন্তাতেই ধ্যানমগ্ন।

বেলা প্রায় এগারোটা বেজে গেলো।

এমন সময়ে স্থানীয় পোস্ট মাস্টার শশধর চক্রবর্তী আর স্টেশন মাস্টার চন্দ্রকান্ত বসু একখানা টেলিগ্রাম মনি অর্ডার নিয়ে শিবচন্দ্রের সামনে এলেন।

উভয়েই শিবচন্দ্রকে প্রণাম করলেন।

পোস্ট মাস্টার তখন শিবচন্দ্র-গৃহিণীকে বললেন, মা, গোরক্ষপুর থেকে একজন ভক্ত একশো টাকা প্রণামী পাঠিয়েছেন।

বীর সাধক তখন চোখ বুজে দেবী সর্বমঙ্গলার ধ্যানে বিভোর। ক্ষুধাতৃষ্ণার কথা, অভাব-অনটনের কথা, স্ত্রীপুত্রের কথা এসব কিছুই তাঁর মনে ছিল না।

টেলিগ্রাম মনি অর্ডারের কথা শুনে গৃহিণী রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠলেন। আনন্দে তিনি কেঁদে ফেললেন।

কেটে গেলো বেশ কিছু সময়।

ধীরে ধীরে চোখ মেললেন শিবচন্দ্র।

চন্দ্রকান্ত বসু মশাই তখন টেলিগ্রামখানি প'ড়ে তাঁকে শোনালেন।

টেলিগ্রামে লেখা ছিল—আপনি উপোস করবেন না। একশো পাঠালাম। চিঠি যাচ্ছে।

পরে চিঠিখানা এলো।

আমি গত রাতে স্বপ্নে দেখলাম, জগদ্ধাত্রী জগজ্জননী আমার শিয়রে আবির্ভূত হ'য়ে দেহ-লাবণ্যে দশদিক উদ্ভাসিত ক'রে আমায় আদেশ করলেন, কুমারখালি গ্রামে আমার ভক্ত শিবচন্দ্রকে এক্ষুনি একশো টাকা পাঠিয়ে দাও। সে ছুদিন অনাহারে রয়েছে।

দেব! ভোর হ'লে শরৎ বাবুর কাছে আপনার পরিচয় জানতে পারলাম। এই মাসের শেষ নাগাদ আমি আপনার শ্রীচরণ দর্শনে যাবো।

করুণাময়ীর আদেশ পেয়ে আমি কৃতার্থ। সামান্য কিছু পাঠিয়েছি। গ্রহণ ক'রে অনুগৃহীত করবেন।

এই ঘটনার পরে শিবচন্দ্রের আর উপবাস কষ্ট পেতে হয়নি। লোকের দৃষ্টি তাঁর উপরে পড়লো। বহু লোক তাঁর অনুরক্ত ভক্ত হ'য়ে পড়েন।

আর এক ঘটনা।

তখন শিবচন্দ্র কাশীধামে রয়েছেন।

মহামহোপাধ্যায় বামাচরণ ন্যায়াচার্য বিদ্যার্ণবের অন্তরঙ্গ হ'য়ে পড়েছেন। তাঁর ভাই হলেন তারাচরণ সাহিত্যাচার্য।

একদিন দুপুরবেলায় সাহিত্যাচার্য বিদ্যার্ণবের বাসায় গিয়ে দেখতে পেলেন, বিদ্যার্ণব মায়ের পূজায় নিমগ্ন রয়েছেন। এমন সময়ে বাড়ীর ভিতর থেকে বিদ্যার্ণবের গৃহিণী সংবাদ পাঠালেন, এখনও পর্যন্ত মায়ের ভোগরাগের কোনও ব্যবস্থা হয় নি।

এই কথা শুনে সাহিত্যাচার্য উদ্বিগ্ন হ'য়ে পড়লেন। বিদ্যার্ণব কিন্তু রইলেন নির্বিকার। তিনি কোনও উচ্চবাচ্য করলেন না।

কিছুক্ষণ বাদে আবার অনুরূপ সংবাদ এলো।

বিদ্যার্ণব পূজা ক'রেই চলেছেন। তাঁর কোনও চিন্তা-ভাবনা নেই। তিনি কারও সঙ্গে কথাটি পর্যন্ত কইছেন না।

সাহিত্যাচার্য আর স্থির থাকতে পারলেন না। ভোগের ব্যবস্থা করতে বাইরে যাবার জন্যে উঠলেন।

ইসারায় বিদ্যার্ণব তাঁকে কোথাও যেতে নিষেধ করলেন।

সাহিত্যাচার্য কিছু বুঝতে না পেরে চুপ ক'রে রইলেন।

কেটে গেলো খানিকক্ষণ। সাহিত্যাচার্য আর অপেক্ষা করা সমীচীন মনে করলেন না। কিছু বিরক্তির সঙ্গেই তিনি বললেন,

পূজো তো করছেন! মায়ের ভোগের কোনও ব্যবস্থাই এখন পর্যন্ত হয় নি—জানেন?

পূজারী পূজো ক'রেই চলেছেন। জবাব দিলেন না এই কথার।

এমন সময়ে বাইরে কে যেন দরজায় আঘাত করলো।

সাহিত্যাচার্য দরজা খুললেন। দেখা গেলো ডাক পিওন কয়েকখানা মনি-অর্ডার ফরম এনে বিদ্যার্ণবকে দিলেন। সবগুলিই এসেছে ভক্তদের কাছে থেকে।

সাহিত্যাচার্য এবার ব্যাপার বুঝতে পেরে লজ্জিত ও বিস্মিত হলেন।

শিবচন্দ্র তীর্থভ্রমণে বেরিয়ে পড়লেন।

তিনি কৈলাস ও মানস সরোবর গেলেন। রইলেন সেখানে প্রায় এক বছর। সেখানে থেকে কঠোর তপস্যা করলেন। পরে সারা ভারতের অধিকাংশ তীর্থ পরিভ্রমণ ক'রে ফিরে এলেন নিজ গ্রাম কুমারখালিতে।

বিদ্যার্ণব মা সর্বমঙ্গলা ছাড়া বাণলিঙ্গ শিবেরও নিত্য পূজো করতেন।

এই শিবের আবির্ভাব ঘটে এক অলৌকিক উপায়ে।

একদিন জটাজুটধারী এক সাধু বিদ্যার্ণবের কাছে হঠাৎ এসে উপস্থিত হলেন। তাঁর পরনে গেরুয়া কাপড়, হাতে ও গলায় রুদ্রাক্ষের মালা।

বিদ্যার্ণব এর পূর্বে কখনও এই সাধুকে দেখেন নি।

এই সাধুই এতকাল এই শিবের পূজো ক'রে আসছিলেন। একদিন তিনি দেবাদিদেবের কাছ থেকে আদেশ পেলেন,—অচিরে আমায় কুমারখালি শিবচন্দ্রের নিকটে রেখে এসো।

সাধু কালবিলম্ব করলেন না। বাণলিঙ্গ শিবকে বিদ্যার্ণবের হাতে সমর্পণ করলেন।

যতদিন বেঁচে ছিলেন, বিদ্যার্ণব নিত্য এই শিবের পূজো ক'রে গিয়েছেন।

এই বাণলিঙ্গ শিবকে বুকে ক'রেই তিনি মৃত্যুবরণ করেছিলেন।

বাহ্যপূজার প্রয়োজনের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দিতেন শিবচন্দ্র। দেবী-পূজায় তন্ত্রশাস্ত্রোক্ত কোনও খুঁটিনাটি অনুষ্ঠান ও উপচার বাদ দেবার কথা ভাবতেও পারতেন না। তিনি বলতেন, শাস্ত্রোক্ত আরাধনায় জনমানসে দেবী স্ফুরিতা হ'য়ে ওঠেন। মৃন্ময়ী চিন্ময়ীরূপ পরিগ্রহ করেন।

শিবচন্দ্র নিত্য আরাধনা করতেন দেবী সর্বমঙ্গলার। সেই সঙ্গে

তন্ত্রমতে কুলকুণ্ডলিনী শক্তিরও পূজো করতেন ও ভোগ দিতেন। এর উপচার ছিল কাঁচা দুধ, পাকা কলা, পরমান্ন, এই সব। পূজা অনুষ্ঠিত হোতো শিবমন্দিরে শিবেরই পাশে।

ভোগ নিবেদন করা হ'লে শিবচন্দ্র চোখ বুজে ধ্যান করতে বসতেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই কোথা হ'তে কুলকুণ্ডলিনী-স্বরূপিণী প্রায় সাড়ে চার পাঁচ ফুট লম্বা একটা বিরাট গোখ্রো সাপ এসে সেই দুধ, পরমান্ন ও নৈবেদ্য খেতে শুরু করতো। কখনও এর সঙ্গে আর একটা সাদা সাপও আসতো। অবশ্য সাদা সাপটা রোজ আসতো না। তৃপ্তির সঙ্গে ভোগ প্রসাদ খেয়ে সাপটা ফণা বিস্তার ক'রে ধ্যানে উপবিষ্ট শিবচন্দ্রের মাথার সমান উঁচুতে উঠে দাঁড়ানো অবস্থায় ফোঁস ফোঁস করে দুলতে থাকতো।

আয় মা, আয় মা; এলি মা! আয় ব্রহ্মময়ী তারা মা আমার! আয় আয়!—এইসব কথা ব'লে শিবচন্দ্র তখন হাত বাড়িয়ে সাপটার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতেন। সাপটা তখন শিবচন্দ্রের কোলে উঠে কুণ্ডলী পাকিয়ে বিরাট ফণা বিস্তার ক'রে হিস্ হিস্ করতে করতে ডাইনে বামে দুলতে থাকতো। কিছুক্ষণ বাদে শিবচন্দ্রের কখনো ডান হাত কখনো বা বাঁ হাত জড়িয়ে ধ'রে ক্রমে উপরে উঠে তাঁর কণ্ঠসংলগ্ন হোতো। আবার ফণা বিস্তার ক'রে তাঁর বুকের সঙ্গে মাথাটা লাগিয়ে যেন কান পেতে থাকতো।

ভাবে বিভোর হ'য়ে শিবচন্দ্র তারা, তারা বলতে থাকতেন। বার কয়েক ধ্বনি দেবার পর সাপটার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলে সাপটা শিবচন্দ্রের গলা থেকে মাথায় উঠে দু-চার বার ফণায় দোল দিয়ে ধীরে ধীরে সামনের শিবলিঙ্গের মাথায় উঠতো। ফণা বিস্তার করতো। তারপর অদৃশ্য হ'য়ে যেতো।

সাপটা চ'লে গেলে শিবচন্দ্র ভোগের ভুক্তাবশিষ্ট থেকে প্রসাদ নিয়ে তারা, তারা করতে করতে সজল চোখে সেই ভোগ খেতেন।

প্রথম প্রথম অনেকেই এই ভোগ খেতে শিবচন্দ্রকে নিষেধ

করতেন। আকুতি জানাতেন। শিবচন্দ্র নির্ভয়ে সেই প্রসাদ খেতেন। কারও নিষেধ কোনও দিন শোনেন নি।

সর্বমঙ্গলা মা-র নিত্য পূজার পর অন্যূন একটি ক'রে বালক ও কুমারী পূজা, এদের ভালো ক'রে খাওয়ানো; আর শিবা ভোগ ছিল তাঁর অবশ্য প্রতিপালনীয় অনুষ্ঠান। বিদ্যার্ণবের বাড়ীতে নিয়মিত শিবা ভোগের রীতি প্রচলত ছিল। নিত্য দুপুর ও সন্ধ্যায় আরতির পর শঙ্খ ঘণ্টা-ধ্বনি শোনামাত্র কয়েকটা শেয়াল পাশের গৌরীচাঁপা গাছের তলায় নির্দিষ্ট জায়গায় এসে উপস্থিত হোতো। নিত্যই শুদ্ধাচারে পরিষ্কার থালায় বিশেষ পরিপাটি ক'রে ভোগ পরিবেশন করা হোতো। কোনও দিন শেয়ালদের আসতে দেরী দেখলে শিবচন্দ্র নিজে বাইরে গিয়ে আয় আয় ব'লে ডাক দিতেন। সে ডাক শুনেই তারা ছুটে আসতো। ভোগ খেয়ে চ'লে যেতো।

জীবনের শেষ তিনটি বছর কুমারখালি ছেড়ে শিবচন্দ্র বাইরে কোথাও যেতে চাইতেন না। দেবী সর্বমঙ্গলার পুজো ও ধ্যানেই কাটাতেন দিনের বেশীক্ষণ। মাঝে মাঝে সারা রাত কেটে যেতো। তখন যেন শিবচন্দ্র হ'য়ে পড়তেন একটি শিশু—মায়ের আদরের দুলাল।

অনেকেই দেখেছেন, ভাবাবিষ্ট অবস্থায় শিবচন্দ্র মা সর্বমঙ্গলার সঙ্গে কত কথা কইছেন, কত আদর আবদার করছেন!

মায়ের দুলাল মন খুলে মা-কে ডেকে বলতেন,—

আয় দেখি মা! কোলে করি,
মা, তোরে আজ মেয়ে সাজাই।
আমার চঞ্চল হৃদয় দোলায়,
চঞ্চলা সাজায়ে নাচাই।

কখনও বা বলতেন—
চুল বেঁধে কি দেয় নি মা তোর
কোথা যাবি এমন বেশে?

সাধের বেণী দিই মা বেঁধে,
একটু দাঁড়া, ও মা, এসে।
নলিনী প্রফুল্লমুখী,
আয় মা! তোরে হৃদে রাখি।
সত্যই কি মা! এমনি যাবি,
কাঁদিয়ে যাবি অবশেষে!
সে যে কালসিন্ধু পারে মা!
পায়ে মা তোর লাগবে ব্যথা
এত ত্বরা কার উদ্দেশে?

কখনও মা-র সাক্ষাৎ পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হ'য়ে পড়তেন। পাশের ভক্তদের বলতেন—

ঐ ছাখো, মা আমার জ্যোতির ছটায় সারা মণ্ডপ আলো ক'রে সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। ঐ ছাখো, মা হাসছেন! আমাকে দেখে কত হাসছেন! নাও, দেখে নাও। প্রাণ ভ'রে তোমরা মা-কে দেখে নাও।

শিবচন্দ্রের ডাকে মা জাগ্রত হ'য়ে উঠতেন। ভক্তদের ডেকে এনে তিনি তা' দেখাতেন। ভক্তরা কৃতার্থ হতেন।

সংসারে কাজকর্মের মধ্যেও যখন কোনও সমাধানের প্রার্থী হ'য়ে শিবচন্দ্র অপেক্ষা করতেন, মা-র শ্রীমুখের মধুর বাণীতেই তিনি তার মীমাংসা ক'রে নিতেন।

বিদ্যার্ণব মায়ের সাথে মুখোমুখী হ'য়ে কথা কইতেন। ভক্তের কাতর প্রার্থনা শুনবার আগেই মা তার সদুত্তর দিতেন। পূজোয় কেউ কোনও ভুলচুক করলে মা তাঁর ছেলেকে জানিয়ে দিতেন, তাঁর কাছে নালিশ করতেন।

শিবচন্দ্র-গৃহিণীর বয়স যখন ষোলো সতেরো, সেই সময় একবার তাঁর উপর দেবী সর্বমঙ্গলার সেবার ভার দিয়ে দিন কয়েকের জন্যে বিদ্যার্ণব পাবনায় যান।

দেবীর নিত্য পূজা ভোগরাগাদি শেষ ক'রে গৃহিণী একদিন ভুল ক'রে দেবীর বৈকালিক ভোগ দেন নি।

পরদিনই হঠাৎ বিদ্যার্ণব বাড়ী চ'লে এলেন। উঠানে পা দিয়েই গৃহিণীকে বিদ্যার্ণব জিজ্ঞাসা করলেন,

তুমি কাল রাতে মা-কে খেতে দাও নি?

গৃহিণীতো শুনে অবাক!

বিদ্যার্ণব বললেন, মা যে কাল রাতে সেই কথাই বলেছেন। তাই ছুটে চ'লে এলাম।

গৃহিণী ত্রুটি স্বীকার করলেন।

শিবচন্দ্র-গৃহিণীও ছিলেন স্বামীর মত।

কোনও শিষ্য বস্ত্র অলঙ্কার এই সব তাঁকে দিলে, তিনি বলতেন, তোদের মায়ের জন্যে অর্থ ব্যয় না ক'রে আমার মা-কে সাজালে কেমন সুন্দর মানাতো!

শিবচন্দ্র অট্টহাসি সমন্বিতা নৃত্যপরা ভগবতী কালীর সঙ্গে মা ও ছেলের মধুর সম্পর্কে আবদ্ধ ছিলেন। তিনি স্থির অনুভব করতেন, মুক্তকেশী জননী সারাটি ক্ষণ তাঁর সম্মুখেই বিরাজ করছেন। এই বিশ্বের কেউ-ই সেই অনন্তলোচনার লোচনপথের বাইরে থাকতে পারে না।

শিবচন্দ্রের এই মাতৃসাধনা শুধু ধর্মীয় তত্ত্বগত তন্ত্রতত্ত্বের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। তিনি প্রত্যক্ষ তন্ত্রতত্ত্ব বা মাতৃসাধনা প্রচারও করেছেন। তিনি দেশমাতাকে জগন্মাতারূপেই দেখতেন। তিনি প্রণিধান করতেন, ধরিত্রী মাতা ও তার অংশ, আমাদের এই ভারতবর্ষ অখিল বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড-ব্যাপিনী পরব্রহ্মময়ী বিশ্বজননী বিশ্বাতীতা এবং বিশ্বগতাও—একাধারে দুই-ই তিনি। তাই দেশমাতা ও সাধনতন্ত্রের ব্রহ্মময়ী মাতা এক ও অভিন্ন। তাইতো তিনি দেশমাতার মধ্যে ধ্যান-দৃষ্টিতে চৈতন্যরূপা ব্রহ্মময়ী জননীকে প্রত্যক্ষ ক'রে গিয়েছেন। এর স্ফুরণ ও বাস্তব প্রকাশ দেখতে পাই বঙ্গভঙ্গরদ আন্দোলনের সময়ে।

বঙ্গভঙ্গরদ আন্দোলন শুরু হোলো।

এই উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ, অক্ষয় মৈত্রেয়, অম্বিকা মজুমদার প্রমুখ নেতারা একদিন কুষ্টিয়ায় এলেন বক্তৃতা করতে। সেই সভায় ভাষণ দিলেন শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব।

শিবচন্দ্র সেদিন বললেন, দেশমাতায় আর জগন্মাতায় কোনও ভেদ নেই। অখিল ব্রহ্মাণ্ড-ব্যাপিনী হ'য়ে রয়েছেন মা ব্রহ্মময়ী। এই ধরিত্রী ও তার অংশ ভারতবর্ষ সেই ব্রহ্মময়ীরই অংশ ছাড়া আর কিছুই নয়। জগজ্জননী মহামায়া যেমন বিশ্বাতীতা, তেমনি আবার বিশ্বগতাও বটেন। তাই ধ্যানদৃষ্টিতে দেখা যায়, দেশমাতার ভিতরেই রয়েছেন চৈতন্যরূপা ব্রহ্মময়ী।

এই আমাদের 'মা'-টি, ইনি কিন্তু শুধু মাটি নন,—ইনি হলেন প্রকৃত 'মা'-টি। এই 'মা'-টিকে খাঁটি করিয়া ধরিতে হইবে। নান্য পন্থা বিদ্যতে অয়নায়। এই 'মা'-টিকে এতদিন আমরা চিনিতে পারি নাই। এঁকে ছাড়িয়া দিয়াই আমরা মাটি হইতে বসিয়াছি। শিবহীন দক্ষযজ্ঞ বিনাশের পর এমন করিয়াই মায়ের অঙ্গচ্ছেদ হইয়াছিল।

জগন্মাতা সতীর মধ্যেও শিবচন্দ্র দেখতেন অখণ্ড ভারতভূমির রূপ।

এইভাবে শিবচন্দ্র তন্ত্রধর্মকে এক অভিনব মহিমায় মহনীয় ক'রে তুললেন।

দেশমাতার মধ্যে মহাশক্তি মহামায়ার চৈতন্য-সত্তাকে অনুভব ও উপলব্ধি, দেশমাতা ও জগন্মাতার মধ্যে অভিন্নতা ও ঐক্য অনুভূতি নব্য বাঙ্গলার তন্ত্র-ধর্মের নব আবিষ্কার। এই ভাব এ যুগের বাঙলার নোতুন তন্ত্রধর্ম। নব্য বাঙ্গালীর চির অবিস্মরণীয় অবদান।

শ্রীঅরবিন্দও বলতেন, অন্য লোকে স্বদেশকে একটা জড় পদার্থ, কতগুলো মাঠক্ষেত্র বন পর্বতনদী বলিয়া জানে; আমি স্বদেশকে মা বলিয়া জানি, ভক্তি করি, পূজা করি।

বঙ্কিমচন্দ্র তো দেশজননীকে বন্দনা করতেই দেশবাসীকে বন্দেমাতরম্ মন্ত্র দান করলেন।

কিছুটা অপ্রাসঙ্গিক হ'লেও তন্ত্র সম্বন্ধে মোহিতলাল মজুমদার যা বলেছেন, তার কিছুটা এখানে তুলে ধরি।—

এই তন্ত্র বলিতে যাহা বুঝায় তাহা বহু দেশের বহু কালের সাধন পদ্ধতির অঙ্গীভূত হইয়াছিল। প্রাক ঐতিহাসিক যুগেও ইহার প্রচার ছিল, উহা প্রাক বৈদিক তো বটেই। উহারই নানা রূপভেদ, নানা জাতির সাধনায় ঘটিয়াছে; এককালে জগতের সকল সুপ্রাচীন সমাজে উহা প্রচলিত ছিল। সেই মূলতত্ত্বকে বাহন করিয়া অতঃপর নানা যুগের নানা ধর্ম অল্পবিস্তর তান্ত্রিকতা আশ্রয় করিয়াছে। একথা সত্য হইলেও, বাংলার সম্বন্ধে দুইটি বিশেষ কথা অনুধাবন করিবার আছে। প্রথমতঃ এই বাংলার ভূমিতে উহা একটি নিরবচ্ছিন্ন ধারায় বহিয়া আসিয়াছে এবং এই বাংলাতেই ঐ সাধনার চরমোৎকর্ষ ঘটিয়াছে! দ্বিতীয়তঃ তন্ত্র অর্থে যে সাধনতত্ত্ব বা পদ্ধতিই বুঝাক না কেন এবং যে কালে যে ধর্মের সহিত যুক্ত হইয়া উহা একটি বিশিষ্ট রূপ ধারণ করুক না কেন, সেই সকল মত ও সাধনপন্থা এই বাংলায় একটি বিশিষ্ট বাঙালী পন্থায় রূপান্তরিত হইয়াছে। তেমন আর কোথাও হয় নাই। অতএব এমন কথা বলা যাইতে পারে যে, ঐ তন্ত্রও এই বাংলাদেশে একটা বিশেষ ভাববীজকে আশ্রয় করিয়াছে। এক কথায়, শৈবতান্ত্রিক বা বৌদ্ধতান্ত্রিক বা তিব্বতীয়, চীনা তান্ত্রিক অথবা আর কোন আদিম অসংস্কৃত তান্ত্রিক সাধনা কোন এককালে বাংলায় প্রবেশ করিয়া থাকিলেও, বাঙ্গালীর নিজের একটা তন্ত্র ছিল—সেই তন্ত্রে সকল তন্ত্রই বাঙ্গালী তন্ত্র হইয়া উঠিয়াছে। এই বাঙালী তন্ত্রের সর্বশেষ জয় ঘোষণা আমরা দেখিয়াছি বাংলার শাক্ত ও বৈষ্ণব সাধনার অভ্যুদয়ে, বাংলার সহস্র বার্ষিক সাধনার যে একটি বিশেষ সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহার পূর্ণ পুষ্পিতরূপ উহাই।'—বাংলা ও বাঙ্গালী —মোহিতলাল মজুমদার।

বলা বাহুল্য এই তন্ত্রশাস্ত্রের প্রচার ও তত্ত্ব-ব্যাখ্যায় জীবনব্যাপী কঠোর সাধনায় যিনি এদেশে চিরস্মরণীয় হ'য়ে রয়েছেন, তিনি হলেন স্বনামধন্য শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব।

শাক্ত শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব সমস্ত শক্তির সমষ্টি-স্বরূপিণী জগৎ-জননীর আরাধনায় সারাটি ক্ষণ বিভোর থাকতেন। যে শক্তির প্রভাবে প্রতিনিয়ত সৃষ্টি স্থিতি লয় ঘটছে, সেই শক্তির উৎস, সেই ব্রহ্মময়ী মা তাঁর আরাধ্যা।

শক্তির বিচার-আলোচনা প্রসঙ্গে বিদ্যার্ণব লিখলেন।

ভিতরে বাহিরে যখন যেখানে চাই, তখনই সেইখানে দেখিতে পাই—হয় ভগবান নয় ভগবতী, ইচ্ছাময়ীর যখন যেরূপ ইচ্ছা, সেইরূপেই এলোমেলো পাগলী মা আমার অসিটি ছাড়িয়া বাঁশীটি ধরিয়া, বাঁশীটি ছাড়িয়া অসিটি ধরিয়া, কখনও আবার অসিটি বাঁশীটি একত্র করিয়া হাসিটি তাহাতে মিশাইয়া চুলটি ছড়াইয়া চূড়াটি বাঁধিয়া হেলিয়া দুলিয়া নাচিতে থাকে, ঘুমাইয়া থাকিলে আপনি আসিয়া বাঁশীটি বাজাইয়া দেয়, আবার অপরাধ করিলে অসিটি তুলিয়া হাসিয়া হাসিয়া ভয় দেখায়।

শিবচন্দ্রের 'মা' কখনও অসি হাতে ক'রে কলুষ-কালিমা-মলিন বিপথগামী সন্তানকে ভয় দেখিয়ে ঠিক পথে নিয়ে আসেন। আবার কখনও বা বাঁশী হাতে নিয়ে সুর সেধে ভক্তকে মোহনিদ্রা থেকে জাগিয়ে তোলেন। প্রয়োজন-বোধে তিনি অসিও নাচান, বাঁশীও বাজান। কখনও চুলগুলি ছড়িয়ে এলোকেশী হন। আবার কখনও বা চূড়াটি বেঁধে শ্যামসুন্দর মদনমোহন রূপ ধরেন :

বিদ্যার্ণব বলেন,

বাহিরের ভক্তের নয়ন-সম্মুখে তুমি যে মূর্তি প্রত্যক্ষ করিতেছ, উহা তো কোনও বাহিরের বস্তু নহে। ভক্তবক্ষ-বিহারিণী ভক্ত-হৃদয়-চারিণীর যে মূর্তি ভক্তের হৃদয়-আকাশে উদিত হইয়াছে—ভক্তের প্রেমময় নয়ন-নদীর নির্মল তরঙ্গলীলায় ভাবের হিল্লোলে ব্রহ্মজ্যোতি বিকীর্ণ করিয়া ব্রহ্মময়ীর যে মূর্তি ভক্তের অন্তরতলে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে, তিনি একেশ্বরী হইলেও অনন্ত ভক্তের নয়নে অনন্ত তরঙ্গে তাঁহার যে অনন্ত মূর্তি সমুদিত হইয়াছে তাহাও কেবল বাহিরের নহে।

বিদ্যার্ণব যাঁর আরাধনা করতেন তিনি ব্রহ্মময়ী। অনন্ত ভক্তের নয়নে অনন্ত তরঙ্গে অনন্ত মূর্তিতে তিনি সমুদিত।

বিদ্যার্ণব তাই বলেন,—

শ্যাম ভজ আর শ্যামা ভজ, আপনাকে দাও তাঁরই কাছে।
ওরে, দাস হয়ে যাও প্রভুর পাছে, ছেলে হয়ে রও মায়ের কাছে॥
যার শ্যামের বাঁশী বাজল প্রাণে, তার কি আবার দুকুল আছে?
নাচছে শ্যামার অসি অট্টহাসি, ভাঙ্গল কুল সে কুলের মাঝে॥
কুলের মাঝে কুলের মা যে, কুল কুল-কুণ্ডলিনী সাজে।
সে কুলের কাণ্ডারী হতে, ঐ যে কুলের বাঁশী বাজে॥
যে জন দুকুল ছেড়ে, ঐ কুলে কুল মজায়েছে।
তার যে দুকুল ছাড়া দুকুল বেড়া, দুই-ই তখন এক হয়েছে॥
শিবচন্দ্র বলে কুলের পাড় ভাঙ্গে নাই, হাড় ভেঙ্গেছে।
তাই না কুলের মাটী কপালে তুলে মায়ের কোলে নাচিতেছে॥

বৈকুণ্ঠ আর কৈলাস শিবচন্দ্রের কাছে একাকার। কৈলাসে যিনি উমা, গোলোকে তিনিই রাসেশ্বরী। এই ই তো হোলো খাঁটি বাঙ্গালী সংস্কৃতি। আর, এই সংস্কৃতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধারক ও বাহক হলেন শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব। তিনি লিখলেন—

দ্বিভুজা আর দশভুজা, চতুর্ভুজা আমারই মা।
যে দিকে চাই, আমারই মা, আমারই মা—আমারই মা॥
আমারই মা, আমারই মা। আ মরি মা, আ মরি মা!
জলে স্থলে অন্তরীক্ষে আমারই মায়ের গরিমা॥
তপনে মার প্রভাশক্তি গগনে মায়ের মহিমা।
চন্দ্রমায় চন্দ্রিকা মা মোর, অণুতে মা অনিমা॥
পবনে মা বেগশক্তি, দহনে মোর দাহিকা মা।
জলে মায়ের শীতলতা, মধুরে মার মধুরিমা॥
ধরিত্রীর ধারণাশক্তি, জগদ্ধাত্রী আমারই মা।
বিধাতার বিধাত্রীশক্তি, বিষ্ণুর স্থিতি-শক্তি মা॥

মহারুদ্রের মহারৌদ্রী মহাশক্তি সেই আমার মা।
ব্রহ্মলোকে সাবিত্রী মা, বৈকুণ্ঠবাসিনী রমা॥
কৈলাস ধামে বাবার বামে আমার মা ই সেই গৌরী উমা।
আবার সেই—গোলোক-ধামে শ্যামের বামে রাসেশ্বরী
আমারই মা॥

মাকে দর্শন করতে বিদ্যার্ণবের প্রাণ যখন যে ভাবে উতলা হোতো তখন তিনি সেই ভাবে দেখা দিতেন।

একজন মহাসাধকই গেয়েছিলেন না?

হৃদয় রাস-মন্দিরে দাঁড়া মা ত্রিভঙ্গ হ'য়ে।
হ'য়ে বাঁকা, দে মা দেখা, শ্রীরাধারে বামে ল'য়ে॥

—মা, শ্রীরাধাকে বাঁয়ে নিয়ে ত্রিভঙ্গ ঠামে দাঁড়িয়ে একবার যুগলরূপে দেখা দাও।

আর একটা এ-জাতীয় গানও বহু লোককে আনন্দ দিয়ে থাকে।

যশোদা নাচাতো তোরে ব'লে নীলমণি।
সে রূপ লুকোলি কোথা করালবদনী? (শ্যামা)
(একবার নাচ দেখি মা।
অসি ত্যাজি বাঁশী ধরি নাচ দেখি মা।) .....

সাধনার যে স্তরে উঠলে করালবদনী শ্যামার অসির ঝঙ্কার আর বনমালী বংশীধারীর বাঁশীর সুর—এই দুই-এর মধ্যে কোনও পার্থক্যই থাকে না, শিবচন্দ্র সেই স্তরেই উঠেছিলেন।

শিবচন্দ্র তান্ত্রিক সাধক হ'লেও বৈষ্ণবীয় সাধনার প্রতি তিনি সমভাবেই শ্রদ্ধাবান ছিলেন। তিনি কালী ও কৃষ্ণকে এক ও অভেদ-জ্ঞানে দেখতেন। তিনি বৈষ্ণবদের মতোই সবমঙ্গলার ঝুলন, রাস, দোলযাত্রা প্রভৃতি বৈষ্ণব পর্বগুলি পালন করতেন।

এই দোলযাত্রায় ভক্তদের যে মধুর ভাষায় আমন্ত্রণ জানাতেন তা পড়লে সত্যই আনন্দ হয়।

শ্রীশ্রীজগদীশ্বরী সর্বমঙ্গলার দোলযাত্রা,

(২৮শে ফাল্গুন বৃহস্পতিবার পূর্ণিমা হইতে ৩০শে ফাল্গুন শনিবার সংক্রান্তি পর্যন্ত)

মহাত্মন, মহাপ্রলয়ের কালানল প্রজ্জ্বলিত করিয়া যাঁহার দোলের বহ্ন্যুৎসব, মহাকালের হৃৎকমলে শ্রীচরণ বিন্যাস করিয়া যাঁহার দোলারোহণ মহোৎসব, বিশ্বময় মহাশ্মশানের ভস্মরাশি পরমাণুতে পরিণত এবং পুনঃসৃষ্টির রজোগুণে সেই পরমাণু রঞ্জিত করিয়া যাঁহার ফল্গু উৎসব, আবার সৃষ্টির পরে অনন্ত কোটি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড কোলে করিয়া কোলে তুলিয়া সদাশিব হিন্দোলে যাঁহার চিরন্তন আনন্দোৎসব, সেই সর্বোৎসবের অধীশ্বরী, সেই সর্বানন্দময়ী মা সর্বমঙ্গলার দোলে, ভাই সাধক, তোমাকে দোলাইবার নিমন্ত্রণ, দুলিবারও নিমন্ত্রণ। নিবেদনমিতি ৺মায়ের বাটি, কুমারখালি পোঃ, নদীয়া, সন ১৩২০, ১৮ই ফাল্গুন।

সাধককুল-চরণাম্বুজ শরণাগতি সম্পদঃ শ্রীশিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব ভট্টাচার্য।

একবার কৃষ্ণলীলা যাত্রার সময় একজন শিবচন্দ্রকে বললেন, শিব, শক্তির আঙিনায় আজ যে বিপুল হরিধ্বনি !

মায়ের দুলাল শিবচন্দ্র হেসে জবাব দিলেন, হ্যাঁ কাকা, আপনি ঠিকই বলেছেন। মায়ের নিকট শক্তি সঞ্চয় ক'রে তারপর হরিকে ডাকি।

বঙ্কিমচন্দ্র কৃষ্ণচরিত্র রচনা করলেন। সেই রচনা পাঠ ক'রে, বিশেষ ক'রে বঙ্কিমচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ চরিত্র যেভাবে চিত্রিত করেছেন তা দেখে বৈষ্ণব সমাজে তুমুল আলোড়ন উপস্থিত হোলো।

স্বামী বিবেকানন্দ গোপীপ্রেম সম্বন্ধে লিখলেন—

প্রথমে এই কাঞ্চন, নাম, যশ, এই ক্ষুদ্র মিথ্যা সংসারের প্রতি আসক্তি ছাড় দেখি। তখনই, কেবল তখনই তোমরা গোপীপ্রেম কি

তাহা বুঝিবে। উহা এত বিশুদ্ধ জিনিস যে, সর্বত্যাগ না হইলে উহা বুঝিবার চেষ্টা করাই উচিত নয়। যতদিন পর্যন্ত না আত্মা সম্পূর্ণ পবিত্র হয়, ততদিন উহা বুঝিবার চেষ্টা বৃথা। প্রতি মুহূর্তে যাহাদের হৃদয়ে কাম কাঞ্চন যশোলিপ্সার বুদ্বুদ উঠিতেছে, তাহারাই আবার গোপীপ্রেম বুঝিতে ও উহার সমালোচনা করিতে যায়! কৃষ্ণ অবতারের মুখ্য উদ্দেশ্যই গোপীপ্রেম শিক্ষা। এমন কি দর্শনশাস্ত্র-শিরোমণি গীতা পর্যন্ত সেই অপূর্ব প্রেমোন্মত্ততার নিকট দাঁড়াইতে পারে না। কারণ গীতায় সাধককে ধীরে ধীরে সেই চরম লক্ষ্য মুক্তি সাধনের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু এই গোপীপ্রেমে ঈশ্বর রসাস্বাদের উন্মত্ততা, ঘোর প্রেমোন্মত্ততা মাত্র বিদ্যমান।...যখন সমস্ত জগৎ তোমাদের দৃষ্টিপথ হইতে অন্তর্হিত হইবে, যখন তোমাদের হৃদয়ে অন্য কোনও কামনা থাকিবে না, যখন তোমাদের সম্পূর্ণ চিত্তশুদ্ধি হইবে, তখনই তোমাদের হৃদয়ে সেই প্রেমোন্মত্ততার আবির্ভাব হইবে, তখনই তোমরা গোপীদের অহৈতুকী প্রেমের শক্তি বুঝিবে। যখন এই প্রেম পাইবে, তখন সব পাইবে।

বিদ্যার্ণবও কৃষ্ণচরিত্রের সমালোচনা লিখলেন। লেখাটা দেখালেন কাঙাল হরিনাথকে। হরিনাথ এই জাতীয় সমালোচনা না লিখে শ্রীকৃষ্ণলীলা মাধুর্যের প্রকৃত রস পরিবেশন ক'রে যোগ্য প্রত্যুত্তর দিতে পরামর্শ দিলেন।

বিদ্যার্ণব পরামর্শ গ্রহণ ক'রে রাসলীলা লিখলেন। কৃষ্ণ-ভক্তগণ উপলব্ধি করলেন, সাহিত্যিকের লেখা কৃষ্ণ থেকে সাধকের ধ্যেয় কৃষ্ণ কত বিভিন্ন!

বিদ্যার্ণব এক স্থানে লিখলেন—

গোপীগণ নিজ নিজ হৃদয়কুম্ভ লইয়া প্রেমের জল আনিতে শ্যাম সরোবরের অভিমুখে ধাবিত হইয়াছেন। যেই অগাধ প্রেমের জলে কামের কুম্ভ ডুবাইয়াছেন, দেখিতেছেন—তাহাতে একা গোপী কেন? অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের সুরাসুর নরনারী ঐ ত্রিতাপহরণ বারিদবরণ

বারি সঞ্চয়ের জন্য তাঁহার কূলে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন, কেহ ডুবাইয়াছেন, কেহ ডুবাইতেছেন, কেহ ডুবিতেছেন, কেহ ডুবিবেন। যিনি একবার আসিয়াছেন তিনি আর ফিরিয়া যাইবেন না। যদিও কেহ ফিরিয়া যান, যেমন আসিয়াছিলেন, তেমন আর ফিরিয়া যাইবেন না।

শ্যাম সাগরের অগাধ জলে কামের কান্তি ধুইয়া গিয়া প্রেমিকের প্রেমময় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে শ্যামকান্তি ছড়াইয়া পড়িবে. তখন কি সাগরে কি নগরে, কি গহনে কি পবনে, কি ভুবনে কি ভবনে, শ্যামময় নয়ন হইয়াছে, অথবা নয়নময় শ্যাম হইয়াছেন, বাঁশী বাজাইয়া মন হরণ করিয়া মনের অধীশ্বর আপনি আসিয়া মনের স্থান পূরণ করিয়াছেন, মনের সঙ্গে প্রাণকেও আকর্ষণ করিয়াছেন, এখন অবশিষ্ট বহির্মুখ দেহবৃত্তি অন্তর্মুখ হইতে পারে না ; হইলেও অন্তস্তাড়িত বহির্নির্বাসিত কামকে বহিঃ প্রেমতরঙ্গের প্রতিঘাতে লাঞ্ছিত মূর্ছিত করা যায় না ; তাই সে বহির্মুখ দেহবৃত্তি বাহিরে আকর্ষণ করিয়া যোগীন্দ্রগণের অন্তরের নিধি বৃন্দাবনের নিকুঞ্জকাননে প্রেমমন্থর নটবর ত্রিভঙ্গ মধুর শ্যামসুন্দর সাজিয়া দাঁড়াইয়াছেন ; তাই গৃহপিঞ্জর ভগ্ন করিয়া কুলবিহঙ্গী গোপিনীকুলকে কুলনাথ আজ প্রেম সাগরের অকুল কূলে আকর্ষণ করিয়াছেন ; কাহার সাধ্য তাহার জলে আত্ম-অস্তিত্ব রাখিতে পারে ?

এই ভাব-মাধুর্য কোনও জাতি শ্রেণী বা সম্প্রদায় বিশেষের জন্য নয়। যিনি বৃন্দাবন-বিহারী গোবিন্দ-সুন্দরের প্রেম মন্দাকিনী-ধারায় অবগাহন করতে সক্ষম হয়েছেন, কেবল তার পক্ষেই এটা হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব।

মায়ের কথা বলতে গিয়ে শিবচন্দ্র এক জায়গায় লিখেছেন

কৈবল্যের সেই নিত্য লীলায় লীলাময়ী আমারই মা।
মহাকালের হৃৎকমলে তালে তালে নাচছে শ্যামা॥
শিবের বামে, জীবের বামে, আমারই সেই একই মা।
সর্বত্র সমদক্ষিণা, বামা হয়েও নন মা বামা॥

শক্তি-স্বরূপিণী মা মোর, জীবেরও মা, শিবেরও মা।
কি জীব, কি শিব, দুই-ই হন শব, কোলে যদি না করেন মা॥
জননে জননী মা মোর, ধারণে হন ধরিত্রী মা।
কারণে ক্রিয়া শক্তি, কার্যে ফলবিধাত্রী মা॥
জীবনে জীবনীশক্তি, মৃত্যুরূপা মরণে মা।
সাধনায় সাধনা, মুক্তি দানে মুক্তকেশী মা।
কোলের ছেলে কোলে ক'রে, দোলে মা মোর কি সুষমা!
আপন কোলে, আপনি দোলে, আনন্দ-হিল্লোলে মা॥
আপন মুখে আপন নাম ঐ গেয়ে বেড়ায় আমারই মা।
মায়ের, কেবা আপন, কেবা হয় পর, আর কিছু নাই, সবই যে মা॥
কোন মা তুমি, কে মা তুমি, সে কথায় আর কাজ কি মা?
যে মা, সে মা, হও মা! তুমি, বলতে দাও মা, জয় মা শ্যামা॥

শিবচন্দ্র মায়ের দুলাল। তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন, জগতের প্রতিটি মানুষই মায়ের সন্তান। তাই সন্তানে সন্তানে তিনি প্রভেদ দেখতেন না।

আমাদের দেশে মহাত্মা লালন ফকির সাধকরূপে সকলের কাছে সুপরিচিত। রবীন্দ্রনাথ মহাত্মা লালন ফকিরকে অশেষ শ্রদ্ধা করতেন।

কাঙাল হরিনাথের গানের আখড়ায় তাঁর সঙ্গে বিদ্যার্ণবের প্রথম পরিচয়। এর পর বহুবার উভয়ের মধ্যে দেখা সাক্ষাৎ হয়। ভাবের আদান প্রদান হয়। ফকির বিদ্যার্ণবকে দাদাঠাকুর ব'লে ডাকতেন।

একদিন ফকির বিদ্যার্ণবের বাড়ী এলেন। বিদ্যার্ণব মহাসমাদরে তাঁকে অভ্যর্থনা করলেন। বিদ্যার্ণব সে সময়ে ফকিরকে একটি গান গাইতে অনুরোধ করেছিলেন।

ফকির সেদিন গাইলেন :—

আমি একদিনও না দেখলাম তারে।
আমার বাড়ীর কাছে আরশীনগর পড়শী বসত করে॥

গ্রাম বেড়ে তার অগাধ পানি,
ও তার নাই কিনারা, নাই তরণী পারের।
মনে বাঞ্ছা করি দেখবো তারি
কেমনে সে গাঁ'য় যাইরে।
কি কব পড়শীর কথা, ও তার হস্তপদ
স্কন্ধ মাথা নাইরে।
ও সে, ক্ষণেক ভাসে শূন্যের উপর
ক্ষণেক ভাসে নীরে।
পড়শী যদি আমায় ছুঁত, ও মোর যম যাতনা
সকল যেতো দূরে—
সে আর লালন একখানে রয়
তবু লক্ষ যোজন ফাঁক রে॥

বিদ্যার্ণব মুগ্ধ হলেন গান শুনে। এদিকে এলে তাঁর গৃহে যেন অনুগ্রহ ক'রে আসেন, এই অনুরোধ জানালেন ফকিরকে।

একদিন ফকির বিদ্যার্ণবের বাড়ী আসছিলেন। পথে বিশ্রাম করতে ঐ গ্রামেরই সীতানাথ স্মৃতিরত্নের বারান্দায় বসলেন।

জনৈক পণ্ডিত ফকিরকে বারান্দায় বসতে দেখে হুকার জল ফেলে দিলেন।

ফকির ব্যথা পেলেন। বিদ্যার্ণবের গৃহে গেলেও কি এমন ধারা আচরণ দেখবেন? মনে সংশয় এলো।

এলেন বিদ্যার্ণবের বাড়ী। তিনি ছিলেন মায়ের মণ্ডপের বারান্দায়। ফকিরকে দেখে সেখানেই তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। ফকির যুক্তকরে বিদ্যার্ণবকে নমস্কার করতে গেলে বিদ্যার্ণব তাঁর হাত দুখানি নিজের বুকের কাছে রাখলেন। বিদ্যার্ণবের বুকের উপর নিজের মাথা রেখে ফকির হেলে পড়লেন। এই অবস্থায় ফকির গান ধরলেন।—

সবে বলে লালন ফকির, হিন্দু কি যবান।
লালন বলে, আমার আমি না জানি সন্ধান।
এক ঘাটেতে আসা যাওয়া,
একই পাটনী দিচ্ছে খেওয়া,
তবে কেউ খায় না কারও ছোঁয়া,
ভিন্ন জল কোথাতে পান?
বিবিদের নাই মুসলমানী
পৈতে যার নাই সে-ও তো বাম্‌নী
দেখবে ভাই দিব্যজ্ঞানী
দুইরূপ সৃষ্টি করলেন কিরূপ প্রমাণ।

* * *

ভক্ত কবীর জেতে জোলা,
প্রেম ভক্তিতে মাতোয়ালা,
ধরেছে সে ব্রজের কালা
দিয়ে সর্বস্ব ধন তার।
এক চাঁদে হয় জগৎ আলো,
এক বীজে সব জন্ম হোলো,
ফকির লালন কয়, মিছে হল্লা—
কেন করিস্‌ সদাই।

* * *

ধন্য-প্রভু জগন্নাথ,
চায় না রে সে জাত-অজাত,
ভক্তের অধীন সে।
যত জাত-বিচারী দুরাচারী
যায় তারা সব দূর হ'য়ে।
লালন কয়, জাত হাতে পেলে
পুড়াতাম আগুন দিয়ে।

বহু লোক ছুটে এলেন গান শুনে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে।

বিদ্যার্ণব সবাইকে বললেন, ধর্মের মূলতত্ত্ব ধর্মীয় সঙ্কীর্ণতা ও আনুষ্ঠানিক সংস্কারের বহু ঊর্ধ্বে। মানুষে মানুষে অভিন্নতা অনুভব ও উপলব্ধি, সমদৃষ্টি, সর্বজনীন ও সর্বকালীন ঈশ্বরবোধ, জাতি ধর্ম ও সম্প্রদায় গণ্ডীর উর্ধ্বে বিশ্বমানবিকতা বোধ, প্রকৃত জীবন দর্শন, জীবন-কেন্দ্রিক মানবতাবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত। এতে সঙ্কীর্ণতা ও ভেদ-কোনও স্থান নেই।

শিবচন্দ্র সাধারণত সংসারে থেকেই সাধন করতে বলতেন সবাইকে। একদিন এক শিষ্য সন্ন্যাসী হবার জন্যে ব্যগ্র হ'য়ে পড়লেন। তিনি সেদিন শিষ্যকে বলেছিলেন—

দেবাদিদেব স্বয়ং বলেছেন, গৃহস্থ আশ্রমে থেকেও ভক্ত সাধকেরা সিদ্ধিলাভ করতে পারে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, ঘর সংসারে জড়িয়ে থেকে কেবলই ধনবৃদ্ধি ক'রে যেতে হবে। সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী সাধন ও গুরু-কৃপা-বলে ব্রহ্মলাভ ক'রে থাকে, আবার সংসার-আশ্রমী সাধকের হৃদয়ে ব্রহ্মতত্ত্বের স্ফুরণ হ'লে গোটা সংসারটাই হ'য়ে পড়ে ব্রহ্মময়।

সংসার ছেড়ে অত দূরের পথ পর্যটন করা কলিযুগের মানুষের পক্ষে সহজসাধ্য নয়। তাই তন্ত্রশাস্ত্র বলেছেন, সংসারে বাস করেই বাড়িয়ে তোলো ব্রহ্ম-দৃষ্টি। যে সব সাধক গৃহী হয়েও বৈরাগ্যবান এবং কায়মনোবাক্যে সন্ন্যাসী, তাঁরাই তো সত্যকার শ্মশানবাসী। শব আর কঙ্কালে পূর্ণ পূতিগন্ধময় মহাশ্মশানে তাঁরাই তো চৈতন্যরূপী মহাশিব।

জগজ্জননী মহামায়া অনাদি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে তাঁর মায়ারূপী কেশপাশ এলিয়ে দিয়েছেন, সবাইকে ভোলাচ্ছেন তাঁর মায়ায়। আবার ত্থাখো, ঐ কেশপাশ ছুঁয়ে আছে তাঁর চরণ দুটি। ঐ চরণে রয়েছে যে তাঁর কৃপা, যে কৃপায় হয় সিদ্ধি আর মুক্তি। সংসারে থেকে ক্রিয়াবান সার্থক তান্ত্রিক হও। মহামায়ার চরণ ধ'রে প'ড়ে থাকো। মায়ার কেশ-পাশে আর জড়িয়ে পড়তে হবে না।

প্রৌঢ়কালে শিবচন্দ্র আচার্যের জীবন-যাপন করতে শুরু করেন। তিনি ছিলেন একাধারে সিদ্ধপুরুষ. শাস্ত্রবিদ, কবি, তত্ত্বদর্শী ও বাগ্মী। জনজীবনে তাঁর বাগ্মিতার প্রভাব ছিল অসাধারণ। বাংলা, সংস্কৃত ও হিন্দীতে তিনি অপূর্ব বক্তৃতা করতেন।

তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। এর মধ্যে কয়েকখানি গ্রন্থ অমূল্য। বইগুলির মধ্যে তন্ত্রতত্ত্ব (১ম ও ২য় খণ্ড), গঙ্গেশ (নাটক), দুর্গোৎসব, মা, কর্তা ও মন. রাসলীলা, গীতাঞ্জলি, শৈব গীতাবলি, ভাগবতী তত্ত্ব, স্বভাব ও অভাব, পীঠমালা, স্তোত্রমালা, দশমহাবিদ্যা (স্তোত্র) বিখ্যাত।

শিবচন্দ্রের ভক্ত ছিলেন অনেকে। এঁদের মধ্যে স্যার জন উড্রফ তাঁর দীক্ষিত ও বিশেষ কৃপাপাত্র শিষ্য ছিলেন। উড্রফ সাহেব কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি ছিলেন। কিছুকাল অস্থায়ী প্রধান বিচারপতিও হয়েছিলেন। উড্রফ সাহেব-ই তন্ত্রতত্ত্বের ইংরেজীতে অনুবাদ করেছিলেন। বইখানা খুবই সমাদর লাভ করে। সারা পৃথিবীতেই এই বইখানির সমাদর।

ভারতে তন্ত্রসাধনা ও তন্ত্রতত্ত্ব প্রচারে শিবচন্দ্র ও উড্রফ-এর যুগ্ম প্রয়াসকে অন্যক্ষেত্রে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের যুগ্ম প্রয়াসকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

স্যার জন উড্রফ শুধু নিজেই দীক্ষিত শিষ্য ছিলেন না। তাঁর স্ত্রীও শিবচন্দ্রের কাছে স্বামীর সঙ্গে একত্রে দীক্ষা নিয়েছিলেন।

বিচারপতি উড্রফ এক বিশেষ ক্ষেত্রে হিন্দুশাস্ত্রের বিধান জানতে আগ্রহী হন। হাইকোর্টের দোভাষী তখন সুপণ্ডিত হরিদেব শাস্ত্রী। তিনি পরামর্শ দিলেন, শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণবই এ বিষয়ে যোগ্যতম ব্যক্তি।

বিদ্যার্ণব তখন কাশী থাকেন। সসম্মানে তাঁকে কাশী থেকে আনা হোলো।

বিদ্যার্ণবের শাস্ত্র-মীমাংসায় সাহেব বিস্মিত ও মুগ্ধ হলেন। এই সময়ে সাহেব জানতে পারলেন, বিদ্যার্ণব তন্ত্রশাস্ত্রে একজন অসাধারণ

পণ্ডিত ও একজন উচ্চস্তরের সাধক। এই সময় থেকেই সাহেব তন্ত্রশাস্ত্রে আকৃষ্ট হ'তে লাগলেন।

কিছুদিন পরে শাস্ত্রী মশায়কে সঙ্গে নিয়ে একদিন সাহেব কাশীধামে উপস্থিত হলেন। তাঁরা সোজা গেলেন বিদ্যার্ণবের বাস-ভবনে। বিদ্যার্ণব তখন পূজা করছিলেন। উভয়ে সেখানে বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করেন।

পূজা শেষ হ'লে বিদ্যার্ণব উড্রফ সাহেবের সঙ্গে দেখা করেন। উভয়ের মধ্যে সংস্কৃতে কথাবার্তা হয়।

বিদ্যার্ণব সাহেবকে বললেন,

জগন্মাতা আপনার কল্যাণ করুন। আপনি যে বিষয়ে আজ আমাকে কিছু বলতে অনুরোধ করলেন, সে বিষয়ে জগন্মাতা আমাকে যা বলাবেন, তাই-ই বলবো। আপনি ভারতের মাতৃসাধনার বিষয়ে তত্ত্ব বুঝতে ও মন্ত্র উপলব্ধি করতে আগ্রহী। এ আনন্দের কথা। ভারতীয় অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান অতি দুরূহ। এই তত্ত্ববিদ্যা গুরুমুখী। শ্রদ্ধার সঙ্গে জিজ্ঞাসু মনোভাব নিয়ে সদগুরুর আশ্রয়েই এ শুধু লাভ করা যায়। নান্য পন্থা বিদ্যতে অয়নায়। এই তন্ত্রশাস্ত্র মাতৃতত্ত্ব-বিষয়ক অনন্ত জ্ঞানভাণ্ডার। এতে উক্ত তত্ত্ব-সাধনার বিভিন্ন ধারা উপধারার সাধন-পদ্ধতি বিবৃত রয়েছে। এই তন্ত্রশাস্ত্র অতলস্পর্শ সীমাহীন সাগরের মতো। এমন কি ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর পর্যন্ত যে বিশ্বজননীর সাধনার কূলকিনারা ক'রে উঠতে পারেন নি, সেই মাতৃতত্ত্ব সম্বন্ধে আমার মত মানুষ কতটুকু জানতে বা বলতে পারে? এই বিশাল শক্তিতত্ত্বের মহাসাগর-তীরে দাঁড়িয়ে মানুষের পক্ষে কিছু উপলখণ্ড সংগ্রহ করাও সহজসাধ্য নয়। সুতরাং এ গভীর তত্ত্বের কোন দিকটি আপনি জানতে চান অনুগ্রহ ক'রে বলুন। আমি সেই বিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ বলতে প্রয়াসী হবো।

উড্রফ বললেন, আপনি দয়া ক'রে যা বললেন তা তো কিছুই স্থির ক'রে উঠতে পারছিনে। যে তত্ত্ব সম্বন্ধে আজ আপনাকে বলতে

অনুরোধ করছি, সে সম্বন্ধে আমি তো আপনার কাছে একেবারে অবোধ শিশু। ভূমিষ্ঠ হবার পর শিশুর চোখে প্রথমে মায়ের মুখচ্ছবি আর সীমাহীন অনন্ত আকাশের রূপটিই ধরা পড়ে। আজ যে তত্ত্ব উপলব্ধি করবার জন্যে আপনার দ্বারস্থ হয়েছি, তা হোলো মাতৃতত্ত্ব বা শক্তিসাধনতত্ত্ব সুতরাং মা ও ছেলে সম্বন্ধীয় যে মধুর তত্ত্ব এবং মা ও ছেলের মধ্যে যে আনন্দপ্রদ মধুর সম্বন্ধ বিদ্যমান, সেই সম্পর্কে আমাকে কিছু প্রাথমিক জ্ঞাতব্য তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করুন।

বিদ্যার্ণব বললেন, আপনার সঙ্গী পণ্ডিত শাস্ত্রীজীর কাছ থেকে জেনেছি, আপনি বিদ্বান, সুপণ্ডিত ও জ্ঞানী এবং ভারতীয় ধর্মীয় সংস্কৃতির অনুরাগী, তত্ত্বান্বেষী ও গুণগ্রাহী। কাজেই আপনাকে একটি বিশেষ কাজ করতে নির্দেশ করছি। বিবিধ কাজ-কর্মের মধ্যেও আপনি সুযোগ ক'রে ভারতের সমগ্র হিমালয় খণ্ড, বিশেষ ক'রে উত্তরাখণ্ড থেকে কন্যা কুমারিকা পর্যন্ত আর গুজরাট থেকে বাঙ্গলার মধ্যবর্তী বিভিন্ন অরণ্য, সমতল ও উপত্যকা এবং গিরিগুহাবাসী যোগ ও ধ্যানরত মহাত্মাদের দর্শন ও সেবা করুন এবং শ্রদ্ধাবান ও জিজ্ঞাসু হ'য়ে তাঁদের উপদেশ প্রার্থী হোন। কারণ, শ্রদ্ধাবান লভতে জ্ঞানম্। এইসব যোগ এবং জপতপসিদ্ধ ও তত্ত্বোপলব্ধ মহাত্মাদের মুখনিঃসৃত তত্ত্বকথা আপনাকে অধ্যাত্মবিজ্ঞান রাজ্যে প্রবেশের পথ সুগম ক'রে দেবে। আপনি এত বছর চেষ্টা করেও এই পথে যতটা অগ্রসর হ'তে পারেন নি, এই সব যোগিগণের ব্যাখ্যাত তত্ত্ববাণী ও তাঁদের পবিত্র সান্নিধ্যে অতি অল্প দিনে তার চেয়ে অধিক অগ্রসর হ'তে পারবেন।

জেনে রাখুন, লোকোত্তর চরিত্র মহাসাধকের শ্রীমুখ-ভাষিত একটা বাণী হাজার ধর্মপ্রচারক অপেক্ষাও অধিক কাজ করতে সক্ষম। মহাত্মাদের এক একটি কাজ, এক একটি বিভূতি, সহস্র বক্তৃতার চেয়েও অধিক কল্যাণকর ও প্রচুর শাস্ত্রালোচনা হতেও শ্রেয়স্কর। এক কথায়, সাধুবাক্যে আস্থা রেখে, তাঁদের উপদেশ অনুযায়ী কাজ করলে জীবনের বহু আকাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্য ও বাসনা পূর্ণ হয়।

বিদ্যার্ণবের সঙ্গে এই সাক্ষাৎকালীন অভিজ্ঞতার এক অতি আশ্চর্য কাহিনী উড্রফ সাহেব নিজেই পরে বলেছেন—

বিদ্যার্ণব মহাশয়ের বাসস্থানে পদার্পণ করবামাত্র আমি যেন হঠাৎ বিদ্যুৎ-স্পৃষ্টের মত কিছু অনুভব করলাম। কি এক তীব্র প্রবাহ দেহমধ্যে প্রবেশ ক'রে আমার সর্বাঙ্গে পরিব্যাপ্ত হ'য়ে পড়লো। বোধ হোলো যেন সমগ্র বিশ্ব চক্রাকারে ঘুরতে ও আবর্তিত হ'তে হ'তে ক্রমশ দূরে স'রে যাচ্ছে। মনের ক্রিয়া স্তব্ধ হ'য়ে যাচ্ছে। বহির্বিশ্ব সম্বন্ধে বাহ্যজ্ঞান লোপ পেলো। কিছুক্ষণ প'রে সাদা এক বিদ্যুৎবর্ণ রেখাঙ্কিত প্রণব মধ্যে মায়াবীজ সমন্বিত মাতৃবীজ মন্ত্রগুলি চোখের সামনে ফুটে উঠে চারিদিকে ভেসে বেড়াতে লাগলো। বাক ও চলচ্ছক্তিহীন হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। পরে বিদ্যার্ণব মহাশয়ের ইঙ্গিতে শাস্ত্রী মহাশয় আমাকে ধ'রে আসনে বসিয়ে দিলেন।

শিবচন্দ্রের পরামর্শ মত উড্রফ হিমালয় ও অন্যান্য স্থানের সাধু মহাত্মাদের দর্শন ও সঙ্গ ক'রে বেড়াতে লাগলেন। এঁদের মধ্যে অনেকেই অতি উচ্চস্তরের সিদ্ধসাধক। কারও বয়স আড়াইশ, তিন শ, কারও বা আরও অনেক বেশী। তাঁদের সঙ্গ-লাভে কৃতার্থ হ'য়ে, তাঁদের উপদেশে মুগ্ধ হ'য়ে, তাঁদের শিষ্যত্ব গ্রহণে উৎসুক হ'লে, তাঁরা সবাই উড্রফকে বলেন, আপনার গুরুদেব তো নির্দিষ্ট হ'য়েই রয়েছেন। তিনি মহাত্মা শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব। তাঁর মতো সিদ্ধসাধক বিরল। তাঁদের সকলের কথায় নিঃসংশয় হ'য়ে উড্রফ ফিরে এলেন শিবচন্দ্রের কাছে।

উড্রফকে দেখেই বিদ্যার্ণব হেসে জিজ্ঞাসা করলেন, কি সাহেব, পরীক্ষা নিরীক্ষা সব শেষ হোলো? মহাপুরুষ মহর্ষিগণের আলাপ আলোচনায় মনের সংশয় ও দ্বন্দ্ব ঘুচলো তো?

উড্রফ তো একথা শুনে অবাক!

বিদ্যার্ণব বললেন, এতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। আমি সবই জ্ঞাত আছি।

উড্রফ শিবচন্দ্রের পায়ে লুটিয়ে পড়লেন।

পরিবর্তিত মনোভাবে এক শুভ দিনে উড্রফ ও তাঁর পত্নী অ্যালেন উড্রফ বিদ্যার্ণবের কাছে তন্ত্রোক্ত বিধান ও পদ্ধতি অনুযায়ী শাক্তধর্মে দীক্ষা নিলেন।

দীক্ষা অন্তে উড্রফ বিদ্যার্ণবকে দক্ষিণা দিতে চাইলেন।

উড্রফ বললেন, অর্থ ছাড়া, আপনার মনোমত এমন কোনও জিনিসের নাম করুন, যা পেলে আপনার আনন্দ হবে। আমি তা-ই দক্ষিণা দিয়ে কৃতার্থ হই।

বিদ্যার্ণব বললেন, যদি আমার প্রিয় বস্তু দ্বারা দক্ষিণান্ত ক'রে আমাকে সন্তুষ্ট করবার বাসনা অন্তরে জন্মে থাকে, তবে আমার ইচ্ছা, তুমি যতদিন বাঁচবে, বিশ্বে মাতৃতত্ত্ব ও মাতৃনাম ব্যাখ্যা ও প্রচার ক'রে চলো। এ থেকে কাম্যবস্তু আমার জীবনে আর কিছুই নেই। এই তারক মন্ত্র বিশ্বমানবের কল্যাণে ও মুক্তির জন্যে প্রচারই আমার জীবনে একমাত্র প্রিয় ও কাম্যবস্তু।

উড্রফ বললেন, গুরুদেব, আশীর্বাদ করুন, আমা দ্বারা আপনার ঈপ্সিত এই কাজ যেন সম্পন্ন হয়।

উড্রফ হিন্দুদের মতোই বিদ্যার্ণব ও তাঁর স্ত্রীকে পাদস্পর্শ ক'রে প্রণাম করতেন। তিনি বিদ্যার্ণবের বাড়ীতে যতক্ষণ থাকতেন গৈরিক বসন প'রে, রুদ্রাক্ষমালা গলায়, নগ্নপদেই থাকতেন। কোনও সভায় বক্তৃতা করতে উঠলে প্রথমেই শিবচন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতেন।

এক সময়ে উড্রফ শিবচন্দ্রের জীবনী লিখতে আগ্রহী হলেন।

বিদ্যার্ণব বললেন, আমি এতদিন ধ'রে শুধু মায়ের জীবনীই সন্ধান ক'রে ফিরছি। আর, তুমি সেই মহামায়ার জীবনী বাদ দিয়ে আমার জীবনী নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছ? কোনও প্রয়োজন নেই। মায়ের জীবনী নিয়েই মত্ত থাকো। আমার জীবনী দিয়ে কি হবে?

এর পর থেকে উড্রফ তন্ত্রতত্ত্বের ইংরেজী অনুবাদ করতে শুরু করেন। তিনি তন্ত্র সম্বন্ধে বহু বই লিখেছেন।

বড় ব্যারিস্টার বা বিখ্যাত জজ হিসাবে উড্রফ সাহেবকে এদেশের লোকেরা বিচার করবে না। তিনি ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতির গৌরব উপলব্ধি ক'রে তার অনুরাগী হয়েছিলেন, ভারতীয় সভ্যতার স্বরূপ ব্যাখ্যা করেছিলেন। তিনিই ইংরেজী শিক্ষিত ভদ্রমহোদয়দের মধ্যে তন্ত্রের অনুরাগ বাড়িয়ে তুলেছেন। তাঁর অক্ষয় কীর্তি তন্ত্রের ব্যাখ্যা। এ-সব জন্যেই উড্রফ আমাদের নিত্য স্মরণীয়।

বিদ্যার্ণবের মাধ্যমে শক্তিসাধনার মাধুর্যরস আস্বাদে সক্ষম হ'য়ে উড্রফ ভারতীয় কৃষ্টির প্রতি অনুরক্ত হ'য়ে পড়েন। গৃহে যখন জননী জগদম্বার অর্চনা করতেন, তখন তাঁকে কাষায় বস্ত্র প'রে বৈদান্তিক বেশেই দেখা যেতো। গলায় ঝুলতো রুদ্রাক্ষের মালা। মাথায় লাল জবা। তিনি যে মূর্তিতে মার সাধনা করতেন তা হোলো স্বর্ণনির্মিত সিংহবাহিনী দশভুজা মহিষমর্দিনী। ইংল্যাণ্ডে গিয়েও মৃত্যু পর্যন্ত এই মূর্তিরই নিত্য পূজা ক'রে গিয়েছেন।

কুমারখালির অন্তঃপাতী তেবাড়িয়া পল্লীর নীরদ সাহা এক সময় ঘোরতর অসুস্থ হ'য়ে পড়লেন। কোনও উপায় না দেখে সবাই গিয়ে ধরলেন বিদ্যার্ণবকে।

আপনাকে এর ব্যবস্থা করতেই হবে।

সমস্ত শুনে বিদ্যার্ণব বললেন,

তান্ত্রিক অভিচার দ্বারা সব কিছুই সম্ভবপর। কিন্তু সমূহ হানি হবার সম্ভাবনা। সুতরাং আপনারা আমায় ক্ষমা করবেন।

তিন চার বার এইভাবে ফিরিয়ে দিলেন। শেষে নীরদের পিতা বিদ্যার্ণবের পা জড়িয়ে প'ড়ে রইলেন। কাঁদতে লাগলেন।

বিদ্যার্ণব আর উপেক্ষা করতে পারলেন না।

তিনি যথারীতি অভিচার ক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হলেন।

পূজা হোলো। পরে ঘরের দরজা বন্ধ করলেন। শুধু সেখানে

ভক্ত দানবারি ও নীরদ রইলেন। হোম আহুতি ও এই বিষয়ের অনুষ্ঠানাদি বন্ধ ঘরেই অনুষ্ঠিত হোলো।

কিছুক্ষণ পরে বিদ্যার্ণব নীরদের আত্মীয়-স্বজনকে ডেকে বললেন,

যাও। এখন নীরদকে ঘরে নিয়ে যাও। সে এখন রোগমুক্ত। আর কোনও ভয় নেই। এখন সে সংসার ধর্ম করুক।

অভিচারের প্রতিক্রিয়া দুর্লভ। শিবচন্দ্রের জীবনে তার প্রভাব যে ভাবে নেমে আসলো, তা মর্মান্তিক।

১৩২০ সন শেষ হ'তে চললো। চৈত্র মাস সমাগত। রাজমিস্ত্রীরা মায়ের বাড়ী সংস্কার করছে। ভুল ক'রে তারা একখানা বাঁশের বাকারী পথে ফেলে রেখে গিয়েছিল। বিদ্যার্ণব খড়ম পায়ে বাইরে আসছিলেন। এই বাকারীর আঘাতে আহত হলেন তিনি। পায়ের এক জায়গা থেকে রক্ত বেরুলো। পরদিনই সেই ক্ষত তীব্র আকার ধারণ করলো। স্থানীয় ডাক্তাররা কিছুই করতে পারলেন না। উড্রফ কলকাতায় নিয়ে যেতে চাইলেন। বিদ্যার্ণব কিছুতেই যেতে রাজী হলেন না। তার একই কথা। অন্তিম সময়ে মায়ের মন্দির ছেড়ে কোথাও যাবো না। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, মায়ের কোলে ফিরে যাবার সময় এসে গিয়েছে। দুদিন আগে লিখেছেন—

মা, আমি খেলা ভঙ্গে আবার
ঘরে ফিরে এলাম।
কোলের ছেলে কোলে করো মা,
অন্ধকারে ভয়ে মলাম ॥
শিবচন্দ্র বলে ও ভাই, খেলা আজো
কিছু হয় নাই।
(এর পরে) যার খেলা তার সঙ্গে খেলতে
এইত ভবে বিদায় নিলাম ॥

অভিজ্ঞ চিকিৎসকরা 'মেজর অপারেশন' করা সাব্যস্ত করলেন। ডঃ রজনী কুণ্ডু জিজ্ঞাসা করলেন,

কি দাদা, আপনাকে কি ক্লোরোফরম করতে হবে ?

কি দরকার ? অমনই অপারেশন কর।

ঘণ্টাখানেক ধ'রে অপারেশন, ধোওয়া-মোছা, ব্যাণ্ডেজ বাঁধা চললো। বিদ্যার্ণবের মুখ দিয়ে একটা উঁহু শব্দ বেরুলো না। তাঁর যেন নিজের দেহ নয়, অপরের দেহ।

এর পর আরও কয়েকদিন ধোওয়া-মোছা চললো। সবই তিনি নীরবে সহ্য করছেন।

বিদ্যার্ণব বুঝতে পেরেছিলেন, তাঁর রথযাত্রার পর্ব সম্পূর্ণ হবার সময় এসে গিয়েছে : রথী জননী জগদম্বা একবার আদেশ দিলেই তাঁর সমস্ত অভিলাষ পূর্ণ হয়।

তিনি বলেছিলেন—

মা, তোমার এ কি লীলা! সারথির বলবুদ্ধি তোমার তো কিছুই অবিদিত নয়! তবে জানিয়া শুনিয়া এমন অকর্মণ্য সারথির হস্তে এ রথের ভার কেন দিলে মা ? সত্য, আমি ঘোর অপরাধী, মহাপাপী ; কিন্তু তাই বলিয়া তুমি ত্যাগ করিতে পার না। এ ঘোর সংকটে রথী সারথি কেহই আত্মরক্ষায় সমর্থ নহে। জানি আমি—নিজকৃত কর্মফল আমাকে অবশ্য ভোগ করিতে হইবে। তথাপি এ ভগ্নরথে মা! তোমাকে একবার দেখিতে চাই। রাবণের সেই শেষ রথ-যাত্রার ন্যায় এ অন্তিম রথ-যাত্রায় মা, তুমি একবার সেই উন্মাদিনী মা সাজিয়া মাভৈ মাভৈ রবে আমায় কোলে করিয়া রথে দাঁড়াও। মুহূর্তের জন্যে অন্তর্হিতা না হইয়া একবার অন্তর্নিহিতা হও। আমি নয়ন ভরিয়া মন ভরিয়া প্রাণ ভরিয়া সেই ভুবন-ভরা রূপের ছটা একবার দেখিয়া লই। মা, তোমার এই কোটি চন্দ্র বিনিন্দিত কালবিজয়ী কাল-কান্তি-কিরণে আমার মরণ ভয়-অন্ধকার ঘুচিয়া যাক। মা, আমি মায়ের কোলে উঠিয়া মায়ের হইয়া সেই মরণ মরিয়া যাই। অমরগণ অমরপদ পরিত্যাগ করিয়াও যে মরণের জন্য লালায়িত। তাই বলি, আয় মা! আজ মায়ে পোয়ে মিলিয়া আমরা রথ যাত্রার

যাত্রী হই। আমার দেহ-রথে নয়ন রথে মনোরথে প্রাণরথে, মা, তোমার রথযাত্রা একবার দেখিয়া লই। শুনিয়াছি তোমার রথে আর নাকি পুনর্যাত্রা নাই। তাই এত সাধ মা।

বিদ্যার্ণবের অন্তিমকাল সমাগত জেনে তাঁর ভক্তদের মধ্যে একজন অন্যভাবে ঘুরিয়ে একদিন একটি প্রশ্ন করলেন।

দেহরক্ষার পর কোনও শক্তি সাধকের শবদেহ শ্মশানে নিয়ে যাবার সময় কোন ধ্বনি দিয়ে নিয়ে যাওয়া সঙ্গত। আসল উদ্দেশ্য ছিল, বিদ্যার্ণবের শবদেহ কোন ধ্বনি দিয়ে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হবে।

বিদ্যার্ণব বললেন, এতদিন আমার সঙ্গ-লাভ ক'রেও দেখছি তোমাদের মনের ভ্রান্তি দূর হয় নি। তোমাদের ভ্রান্তি-প্রসূত শাক্ত বৈষ্ণবের ভ্রান্ত দ্বন্দ্বভাব মনের কোণ থেকে অপসৃত হয় নি!

সঙ্গে সঙ্গেই তিনি এই গানটি লিখে দিলেন।—

চল ভাই হরি ব'লে, বাহু তুলে
নেচে মায়ের কোলে যাই।
মায়ের ছেলের হরি বলতে কোনও
শাস্ত্রে নিষেধ নাই।
মায়ের কোলে যেতে হ'লে আগেই তো
দেয় হরিবোল।
হরি বোল না বললে ভবে কেবা
পায়রে মায়ের কোল।
মা তখন হরি রূপে হরণ ক'রে মা-
রূপে কোলে লন সবাই।
এ ঘর বাড়ী ছেড়ে যখন, মায়ের বাড়ী
যেতে হবে।
স্বজন সবে যতন ক'রে কাঁধে ক'রে
তুলে লবে।

তখন মার সোহাগে, সবাই মিলে,
বলরে হরি বলরে ভাই।
শিবচন্দ্র বলে ভাইরে! এ পরাধীন
কেন হও;
দিন থাকিতে দিন তারাকে, দীনবন্ধু
জেনে লও।
তখন হরির ইকার, হ্রস্ব দীর্ঘ শাক্ত
বৈষ্ণব যা বলো তাই।

এর পর বিদ্যার্ণব বললেন,

একথা সত্য, হিন্দু সাধক মাত্রই স্ব স্ব গুরু-দত্ত ইষ্ট নামকেই একমাত্র তারক ব'লে বিশ্বাস করে। কিন্তু সেজন্য তাঁরা এ কথা বলেন না যে, অপরের ধ্যেয় ইষ্ট নাম তারক নয়। কারণ সদগুরুগণের শিক্ষা ও উপদেশ হোলো, সর্ব বিষয়ে অভেদজ্ঞান। অর্থাৎ, বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে অভিন্নতা ও ঐক্যানুভূতি চিন্তা বা উপলব্ধি করা। সাধক বিভিন্ন ধারার সাধন পদ্ধতিতে সংশ্লিষ্ট এক একটি সাধন-তত্ত্বের নামকে আশ্রয় ক'রে উহাকেই ধ্যেয় ও কীর্তনীয় তারক ব'লে বিশ্বাস করেন ও গ্রহণ করেন।

সে যাক, শাক্ত বৈষ্ণবীয় তারক নাম সমুচ্চয়ের সমন্বয়ী কলিটি বেঁধে দিচ্ছি। আমার শবযাত্রার সময় এটি গাইও।

শিবরাম শিবদুর্গা রাধাকৃষ্ণ কৃষ্ণ রাম,
তারক ব্রহ্ম সীতারাম শ্রীহরি মধুসূদন;
তারক তারা শ্রীকালী চ শ্রীকৃষ্ণ মুকুন্দ মুরারে।

সব সময় মনে রেখো, কালী ও কৃষ্ণে কোনও পার্থক্য নেই। কালী ও কৃষ্ণ এক ও অভিন্ন। আমি তো বাড়ীর রাধাকৃষ্ণের রাস ও দোল উৎসবের সঙ্গে সর্বমঙ্গলা মায়েরও রাস ও দোল পালন ক'রে থাকি।

রোগ বেড়েই চললো।

এসে পড়লো কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী। সামনেই অমাবস্যা।

বিদ্যার্ণব গৃহিণীকে বললেন, যাও, মায়ের পূজো সেরে নাও।

ভক্তদের বললেন, ঘর থেকে আমায় বিল্বমূলে নিয়ে চলো। আমার বুকের 'পর রাখো বাণলিঙ্গ শিব।

তাই-ই করা হোলো।

বুকে বাণলিঙ্গ শিব। সম্মুখে জননী সর্বমঙ্গলা।

শিয়রে ব'সে রয়েছেন সহধর্মিণী। তাঁর দিকে চোখ পড়তেই বিদ্যার্ণব বললেন,

অমাবস্যা লেগে গেছে। শীঘ্রই যাও। মায়ের পূজা শেষ ক'রে নাও।

ভক্ত দানবারি পাশেই ছিলেন। তাঁকে বললেন,

দানু, মাকে উঠিয়ে আনো। আমার সামনে তাঁকে রাখো। আমি মাকে দেখবো।

সকলেই ধরাধরি ক'রে মা সর্বমঙ্গলাকে মন্দিরের বাইরে আনলেন। রাখলেন বিদ্যার্ণবের সামনেই।

মায়ের দুলাল তাকিয়ে রইলেন মা-র দিকে একদৃষ্টিতে।

মা মা মা!

দুদিন আগে এই কথা কয়টা শিবচন্দ্র লিখেছিলেন।—

যেমন সাজাইয়া গিয়াছিলে, তেমনি সাজিয়া এলাম। সাজিয়া গেলাম। যাবার সময় যেদিন শেষ সাজে সাজিয়া দাঁড়াইব—মা আমার! মা হইয়া দীনতারিণি! তুমিও একবার সেই দিনে তোমার শেষ সাজে সাজিয়া দাঁড়াইও। মা, তোমার ঐ ঘন-কুঞ্চিত ভ্রমর-নীল উন্মুক্ত বিপুল কেশমালায়, বিশদ শারদ-শ্যাম সুধাংশু বদনে, মধুর হাস্যচ্ছটায় দিগম্বর হৃদয়ানন্দ চিদানন্দ লীলার ঘটায় সাজিয়া—হাসিয়া হাসিয়া নাচিয়া নাচিয়া উন্মাদিনী সাজিও, মা! আমি তোমার নৃত্যরঙ্গে ভাসিয়া আসিয়া চরণে মিশিব, মুক্ত কেশের আশে পাশে লুঠিয়া লুঠিয়া উঠিয়া বসিব। সাজে আর কাজ নেই, মা! তোর সাজেই জীবন বিসর্জন দিব। মা মা!

মায়ের কোলের শিশু মায়ের কোলেই ঝাঁপিয়ে পড়লো।

মায়ে পোয়ে এক হোলো।

মা মা!

সকলেরই মুখে এক কথা—

মায়ের আদরের দুলাল মায়ের অঙ্কে ফিরে গেলেন।

বিদ্যার্ণবকে শ্মশানে নেওয়া হোলো। গাওয়া হোলো সেই গান—

চল ভাই হরি ব'লে বাহু তুলে
নেচে মায়ের কোলে যাই।......

গাওয়া হোলো—শিবরাম শিবদুর্গা রাধাকৃষ্ণ কৃষ্ণরাম......

বঙ্গগগন থেকে একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক খ'সে গেলো।

অগণিত ভক্ত অনুরক্ত শিষ্য শোকে মুহ্যমান হ'য়ে পড়লেন।

বিদ্যার্ণবের তিরোধানের পর কলকাতার নাগরিকগণ এক শোক-সভার আয়োজন করলেন। দেশের গণ্যমান্য বহুলোক সে সভায় উপস্থিত। সভায় সভাপতিত্ব করেন অমৃতলাল বসু। উড্রফ সাহেবও এই সভায় উপস্থিত। তিনি বাক-শক্তি রহিত।

সভায় শিবচন্দ্র সম্বন্ধে বলবার জন্যে দাঁড়ালেন উড্রফ। গুরুদেবের মহাপ্রয়াণে বিরহব্যথায় তিনি এত শোকবিহ্বল হ'য়ে পড়লেন যে, তাঁর মুখ দিয়ে একটা কথাও বেরুলো না। চোখের জল ঝরণার ধারার মত প্রবাহিত হ'তে লাগলো। শোক-নিমগ্ন মাতাপিতৃহীন অনাথ শিশুর মতো তিনি কাঁদতে লাগলেন। গুরুগতপ্রাণ বিচারপতির এমন বিচলিত অবস্থা দেখে সেদিন সভার কেউই অশ্রু সংবরণ করতে পারেন নি। অবশেষে সভায় উপস্থিত সম্মানিত বক্তা ও ভদ্রলোকেরা তাঁকে ধরাধরি ক'রে চেয়ারে বসিয়ে দিলেন।

কিছুক্ষণ পরে প্রকৃতিস্থ হ'লে সভাপতি মহাশয়ের সমাপ্তি ভাষণের আগে বিচারপতি উড্রফ নিম্নলিখিত এই কয়েকটা কথা লিখে দিলেন। তাই সভায় পড়া হোলো।

একদা জীবনে পথের সন্ধানে ব্যাকুলচিত্তে দিশেহারা হইয়া

ইতস্তত ঘুরিতেছিলাম এবং আকুলভাবে ভাবিতেছিলাম, কে আমায় প্রকৃত পথের সন্ধান দানে সমুন্নত সাধনার সোপান ধরাইয়া দিবে? যখন মর্মে মর্মে অনুভব করিতেছিলাম জীবন্ত গুরুর অভাব এবং কোথাও স্থির থাকিতে পারি নাই, ঠিক সেই সন্ধিক্ষণে প্রথমে যিনি আমায় পথ দেখাইয়াছিলেন, যাঁহার দেবগণেরও বহু-আকাঙ্ক্ষিত পূতঃ নির্মল সঙ্গস্পর্শে আমার চঞ্চল ও নিরতিশয় ব্যাকুলচিত্ত স্থির ও শান্ত হইয়া আত্মচৈতন্যের পথে গতিপ্রাপ্ত হইয়া জীবনকে রক্ষা ও ধন্য করিয়াছিল, পুরুষোত্তম রাজরাজেশ্বর মদীয় গুরুদেব দেবমানব শিবচন্দ্রের পবিত্র শ্রীচরণ সরোজে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি ও শ্রদ্ধার্ঘ অর্পণ করিতেছি। ওঁ শ্রীশ্রীগুরুবে নমঃ।

শিবচন্দ্রের শ্রাদ্ধ-দিনে বহু সাধক ও সৎব্রাহ্মণ আনিয়ে উড্রফ সাহেব তাঁদের নানারকম জিনিস দান করলেন, পরিতোষ সহকারে ভোজন করালেন। সকলকে শ্রদ্ধাবনতচিত্তে বেদ, পুরাণ, গীতা, চণ্ডী, দেবী ভাগবত প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থ, গৈরিক ও রক্তবস্ত্র, গরদের জোড় ও নামাবলী দান করলেন।

খাওয়া দাওয়া শেষ হ'লে কিছু শাস্ত্রালোচনা হোলো। উড্রফ সে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করলেন। সাধক ও পণ্ডিতগণ উড্রফের প্রশংসা করতে উঠলে উড্রফ বললেন,

উপস্থিত সুধী, সাধক ও ব্রাহ্মণগণ, আলোচিত বিষয় শুনে আপনাদের ন্যায় সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণ সাধক ও তাপসগণের বিচার-দৃষ্টিতে যদি আমার জ্ঞানোন্মেষ হয়েছে বলিয়া আপনাদের ধারণা জন্মিয়া থাকে, তাহা হইলে উহার কৃতিত্ব পুরাপুরি আমার শিবকল্প মহাযোগী গুরু শিবচন্দ্রেরই অহেতুক অশেষ করুণাধারা ও আশীর্বাদেই সম্ভব হইয়াছে। কারণ, জ্ঞাননেত্র কেবল সদগুরুই উন্মীলিত করিতে পারেন। সর্বোপরি আমি খৃষ্টধর্মাবলম্বী বিদেশী। আমার অন্তর-রাজ্যে যদি তত্ত্বজ্ঞানের বিন্দুমাত্র স্ফুরণ দৃষ্ট হয়, তবে উহার সমুদয় কৃতিত্ব মদীয় গুরুদেব সদা আশুতোষ শিবচন্দ্রেরই অজস্র ধারায় বর্ষিত করুণাধারা সঞ্জাত।

ব্রাহ্মণগণ আশীর্বাদ করলেন—

বহু জন্মের সাধনা ও সুকৃতির ফল সঞ্চিত থাকলে তবেই এইরূপ মহাশক্তিধর সিদ্ধ সদগুরু লাভের সৌভাগ্য হয়। আপনার গুরুদেব শিবচন্দ্রকে পাঞ্চভৌতিক দেহ-বিশিষ্ট সাধারণ মানুষ মনে ভাববেন না। তিনি তন্ত্র-ধর্মের সার্বভৌম আচার্য, কোটি সূর্যসম তপস্তেজ শক্তির আধার। এরূপ অপরিমেয় শক্তির অধিকারী সদগুরু লাভে আপনি ধন্য।

গুরুদেব সম্বন্ধে উড্রফ লিখছেন—

সেবার বাড়ীতে ব'সে গভীর রাতে একটা বড় জটিল মামলার রায় লিখছিলাম। হঠাৎ দেখলাম, জ্যোতির্ময় তান্ত্রিক ভৈরবের বেশে ত্রিশূল হস্তে গুরুদেব ঘরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। চোখ দুটি থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে দিব্য আনন্দের আভা। আমি গুরুদেবকে দেখে করযোড়ে প্রণাম করলাম। ডান হাতখানি উঠিয়ে বরাভয় দেখিয়ে তিনি আমায় বললেন, কল্যানমস্তু। তক্ষুনি ফুটে উঠলো এক আশ্চর্য অতীন্দ্রিয় দৃশ্য। গুরুদেবের মূর্তিটি পরিণত হোলো অসংখ্য জ্যোতির্ময় মূর্তিতে। সারা ঘরখানি তাতে একেবারে ভ'রে গেলো। অবাক হ'য়ে যে দিকেই দেখি, দেখি ঐ মূর্তি। দিব্য আনন্দে আমি বিভোর হ'য়ে পড়লাম। চোখ দিয়ে জল ঝরতে লাগলো। দুঃখে নয়, আনন্দে। অসীম আনন্দে চোখ মুছে ভাবাবেগ কমিয়ে যখন ঘরের চারদিকে তাকিয়ে দেখছিলাম, তখনো আমার চোখে পড়ছিল ঐ সব দিব্য মূর্তি। ইনিই আমার পরমারাধ্য গুরুদেব শিব-কল্প শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব।

শিবচন্দ্রের একটি বিখ্যাত গান :—

কবে গো আনন্দময়ী! এ দীনে সে দিন দিবে?
যে দিনে দিন রাত্রি হবে রাত্রি আমার দিন হবে ॥

নিশাচরে দিবাচরে, সমান হবে চরাচরে;
দিবাকর নিশাকর-করে, আলোক আঁধার হবে ॥

সম্পদ বিপদ হবে, বিপদ সম্পদ রবে ;
স্বজন বিজন হবে, বিজন স্বজন যবে ॥

পিতামাতা ভ্রাতা জায়া, অসার সংসার মায়া ;
ঘুচিবে সব ছায়াকায়া, আসা যাওয়া সমান হবে ॥

সংসার শ্মশান সাজিবে, শ্মশান সংসার হবে ;
নদীতট শয্যা হবে, ভার্য্যা হবে চিতা যবে ॥